অগ্নিস্বাক্ষর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন
অনুবাদক : শ্রীভগীরথ

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট · কলকাতা-বারো

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৯

প্রকাশক :
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১, শ্যামাচরণ দে
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীগণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
রয়াল হাফটোন কোং
৪, সরকার বাই লেন
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোকে প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

॥ সাত টাকা মাত্র ॥

প্রাক্কথন

"সিংহ সেনাপতি" ও "জয় যোধেয়"-এর মত "মধুর স্বপ্ন"ও আমার একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৫ সাল অবধি তেহরাণ (ইরান) থাকা কালীন এই উপন্যাস লিখতে মনস্থ করি। সেই সময় থেকে এর জন্যে অধ্যয়ন এবং সামগ্রী-সঞ্চয়ন করতে থাকি, কিন্তু লিখতে শুরু করি ১৯৪৯-এ। এই উপন্যাসের মাধ্যমে আমি ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় কয়েকটি পাতা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি মাত্র। এতে আমি কতখানি সাফল্যলাভ করেছি, তা একমাত্র মর্মজ্ঞ পাঠকই হৃদঙ্গম করতে পারবেন। আমার অন্যান্য উপন্যাসের মত এতেও ছোটখাটো দু-একটা ত্রুটি-বিচুতি আছে। সে জন্য হয়তো কোথাও কোথাও আমার লেখনী সঙ্কুচিত হয়েছে, তবুও কর্তব্যের খাতিরে ন্যায়প্রার্থী সেই সকল ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীরা যাদের এই পুস্তকের মাধ্যমে পাঠকদের সঙ্গে পরিচিত করতে চেয়েছি, তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে যেন বাধ্য হয়েছি।

এই উপন্যাসের রঙ্গভূমি দজলা (তিক্রা) থেকে বক্ষুনদী (মধ্য এশিয়া) পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি। কাল খ্রীষ্টীয় ৪৯২ থেকে ৫২৯ পর্যন্ত। এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক ভিত্তির সকল পরিচয় পুস্তকের শেষে পরিশিষ্ট'তে আমি প্রকাশ করেছি।

এই উপন্যাস লিখতে শ্রীমহেশ সিংহ ("মহেশ"), শ্রীকমলা পরিয়ার-এর লেখনী এবং প্রচ্ছদপট তৈরী করে বন্ধু প্রভাকর মাচরে আমার খুবই সহায়তা করেছেন, সে জন্যে তাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

প্রথম অধ্যায়

মৃত্যু ও জীবন

॥ খৃঃ ৪৯৬ ॥

তিগ্রা নদী আজও ঠিক তেমনি গর্ব্বভরা গতিতে বয়ে চলেছে, যেমন সে চলে এসেছে আবহমানকাল। আজ তার গতিতে মন্দ মন্দ ভাব থাকলেও সে গতির মধ্যে রয়েছে বিশাল গম্ভীরতা। তিগ্রা হয়ত ভাবছে, তার দুই তীরে কত না শাহ আর সম্রাট চার দিনের চমক দেখিয়ে বিলীন হয়ে গেছে, আরও যে কত যাবে তার ঠিক নেই। তাই বোধ হয় মাটীর প্রতি তার এই উপহাস ভরা দৃষ্টি।

যতদূর দৃষ্টি যায় তিগ্রার দুই তীরের শোভা অবর্ণনীয়। দক্ষিণতটে বহু মহল সম্বলিত গগন চুম্বিত অনুপম প্রাসাদ শ্রেণী, বহিরাক্রমণ রোধের উপযোগী শক্তিশালী দুর্গ। সে যাতে তার খেয়াল খুশীমত ভাঙ্গাগড়ার খেলা খেলতে না পারে তার জন্য বুদ্ধিমান মানুষ পাথর দিয়ে নদীর দুই তীর মজবুত করে বাঁধিয়ে দিয়েছে।

এপারে সামনে বিরাট প্রাসাদ দুর্গ। নিচু থেকে জমি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠে গেছে। প্রথম তোরন পার হলে সামনে উঁচু প্রাচীর, যার উচ্চতা কম করে এক্‌শ হাত হবে। দুই দিকে দুটি বড় বড় দরজা। দরজার চারদিকে পাথর খোদাই করে নানাপ্রকার লতা, ফুল প্রভৃতি উৎকীর্ণ করা। সবচেয়ে বড় দরজাটীর বিস্তার প্রায় পঞ্চাশ হাত। প্রত্যেকটি দরজার উপরকার মেহরাব (দরজার উপরকার অর্দ্ধমণ্ডলাকার রচনা) এর নির্ম্মাণ কৌশল দেখলে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। এমন কাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। বাইশ হাত মোটা প্রাচীর যেমন দুর্ভেদ্য তেমনি

তার উপরকার কারুকার্য লক্ষণীয়। মহাদ্বারের মহাকপাট' এর নির্মান কৌশল আরও বিচিত্র। সমস্ত দরজাটার কাঠের উপর অসংখ্য সুবর্ণ কীলক। তার প্রত্যেকটী নানাপ্রকার ফুলের আকারে তৈরী। তাছাড়া সুবর্ণ ঘণ্টী এবং বিবিধ প্রকারের রত্ন মণি-মাণিক্য খচিত কাজ অপূর্ব্ব সুন্দর করে তুলেছে।

দ্বার মুখে কবচধারী ভট পাহারায় রত। তার বিশাল পেশীবহুল বপু ও মুখের বিরাট গোঁফ জোড়ার দিকে তাকালে অতি বড় হিংস্র পশুরও বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

মহাদ্বারের ভিতরে এক নতুন পৃথিবী। মনে হয় সমস্ত পৃথিবীটা বুঝি সঙ্কুচিত হয়ে এইখানে নেমে এসেছে। কোথাও ক্রীড়াপর্বত, কোথাও সুন্দর সুন্দর উপবন। সেই বনে পোষা হরিণ যত্র তত্র অবাধে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও জলযন্ত্রের উপর ময়ুর পেখম মেলে মনের আনন্দে জলবিম্ব দেখছে, কোথাও বা নৃত্য করছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে নকল গুহার মধ্যে সুরক্ষিত ভাবে বিচরণ করছে হিংস্র বাঘ সিংহ, জেব্রা, বানর, বনমানুষ। পুষ্প ও লতাবিতান যেন কাননের প্রতিদ্বন্দী হয়ে নিজেদের শোভা বর্দ্ধন করে আছে। তারই পাশ দিয়ে আঁকা বাঁকা অথচ খুব চওড়া রাজপথ চলে গেছে শহরের এখানে ওখানে। মাঝে মাঝে রাস্তার দুইদিকে সারি সারি অট্টালিকা শ্রেণী। তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রাজকীয় দফতর। সেখানে হাজার হাজার রাজকীয় কর্মচারী দিনরাত কাজে ব্যস্ত। এদেরই হাতে পরিচালিত হচ্ছে সিন্ধু থেকে সিরিয়ার মরুভূমি ও ককেশাষ পর্বতমালা থেকে দক্ষিণ সমূদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের শাসনকার্য।

মহাদ্বার দিয়ে সামনে যেতে প্রথমে বিরাট খোলা জায়গা, তারপর প্রাসাদ। সোপান শ্রেণী পার হয়ে উপরে উঠেই প্রথমে বিরাট খোলা ঘর। এটি হল সাসানী সম্রাটের দরবার কক্ষ। এক হাজার থামের উপর অবস্থিত এই বিশাল দরবার কক্ষের ছাদ। এখানকার প্রতিটী জিনিষই রাজধানীর অপার বৈভবের পরিচয় দেয়।

দরবার কক্ষের সাজগোজ দেখলে সহজেই মনে জাগে যে ঐশ্বর্যের দেবী তার ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছেন এখানে।

মনে হয় সোনা-রূপা মণি-মুক্তা প্রভৃতি বুঝি মাটির চেয়েও সুলভ। চারিদিকে শুধু রংএর বাহার। সৌন্দর্যের পরম্পরা আর কলা ও সুরুচির বাহুল্যতা। মেঝেয় বিছানো এক একটি কালীন প্রায় ষাট হাত লম্বা আর তেমনি চওড়া। দেয়ালেও টাঙ্গানো রয়েছে বিচিত্র চিত্র আঁকা বহুমূল্য মখমলী কালীন। সেগুলির উপকার কাজ দেখলে চিত্রকরের অতুলনীয় শ্রম ও ধৈর্যের কথা কল্পনা করা যায়। এই রকম একটা চিত্র তৈরী করতে বোধ হয় একজন শিল্পী তার সারাজীবন পরিশ্রম করেছে। অন্যান্য বহু দেশীয় চিত্রাবলীর মধ্যে রোমক, ইরানী ও ভারতীয় চিত্রগুলিই বিশেষ আকর্ষণীয়। কোনও চিত্রে অর্দশীর বাবপুত্রকে ভগবান অহুর্মজদ্ রাজমুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন; কোথাও "শাপুর প্রথম" রোমের গর্ব্ব খর্ব্ব করে বেলারিয়নকে নিগড়িত করে নিয়ে আসছেন। কোনটী বা তার শিকারের দৃশ্য, কোনটী নববর্ষের আনন্দোৎসবে রাজা প্রজার মহামিলনের দৃশ্য। বিশাল বেদীর উপর মাঝে মাঝে বিখ্যাত ইরানী রাজপুরুষ, কোরেশ, দারযোশ, অর্দশীর প্রভৃতির সোনা বা অন্যান্য ধাতুর তৈরী মূর্ত্তি দাঁড় করানো রয়েছে নানা ভঙ্গিতে। ছাদ থেকে ঝুলছে নানা রং বেরংএর ফানুষ আর কিংখাবের ফিতে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় দুলে দুলে সেখানে এক স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করেছে।

আজ দরবার কক্ষ লোকে পরিপূর্ণ। সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সাসানী সম্রাটের দর্শনাভিলাষে অপেক্ষা করছে।

প্রথম দরজাপথে ভিতরে ঢুকতেই স্বতন্ত্র নাগরিকদের (অজাতান) বসবার জায়গা। তার সর্ব্বশেষ সারিতে বসে আছেন নিম্নবর্গ প্রজাদের গ্রাম প্রভু (কদহক-খতায়ান) ও গ্রাম্য সর্দার প্রভৃতি। এরা সকলে এদের দেবাদিদেব (বগান-বগ) কে দর্শন করে নিজেদের জীবন ধন্য করবার জন্য সকাল থেকে অপেক্ষা করছে। নিজ নিজ

গ্রামে এরাই স্বয়ং ভগবানের (বগ) চেয়ে নেহাত কম যায়না। কিন্তু এটা দেবাদিদেবের বাসস্থান, অতএব এই পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে কত লোকের কাছে দয়াভিক্ষা করতে হয়েছে তার ইয়ত্বা নেই। দরবার কক্ষে পৌঁছে আর কারো মুখে ভাষা নেই। নিশ্বাস নিতেও যেন ভয় লাগে। মনে মনে সকলে আপন আপন জিহ্বাকে সাবধান করে বলছে, হে জিহ্বা! আজকের দিনের মত সংযত হয়ে থাকো, আজ তুমি স্বয়ং শাহনশাহের সামনে এসেছো।

তার সামনে একটু উচু বিরাট বেদির উপর সারি সারি স্বুবর্ণ সিংহাসন। এখানে রাজবংশী কুমার, কুশান, শকান ও কির্ম্মানএর শাহ বসেছেন। তার পাশে বিস্পোহ্রের সাতকুল, কারোন পল্লব, সোরেন পল্লব অসপাহ, পত, গশ্নস্প পল্লব, স্পন্দিয়ার, মেহরান ও জিক বহুমূল্য পোষাক পরিহিত আসীন। এরা কেউ বা দুর্গপতি, কেউ বা অভিষেকের মুকুট বহনকারী, কেউ কেউ বংশ পরম্পরায় সেনাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা অন্যান্য বিভাগীয় নায়ক। তার ডানদিকে অন্য একটি বেদীতে রৌপ্য সিংহাসনে বসেছেন শ্বেত দাড়ী, শ্বেত বস্ত্র, শ্বেত শিরোবেষ্টন, শ্বেত কটিসূত্র শোভিত ধর্মাধ্যক্ষ! এর প্রভাব শাহনশাহের চেয়ে কম নয়। যার একটি মাত্র সংকেতে রাজ্যের যে কোনও মানুষ তার সব কিছু বলি দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে। তার পিছনে আরও কয়েকটি রৌপ্যনির্মিত সিংহাসন, সেখানে বসেছেন অন্যান্য ছোট খাট ধর্মনায়করা, যথা আতরোপত, মিত্রোবরাজ, মিত্রো-অক-বিদ। এই দুই সারির মাঝখানে বসেছেন মহামন্ত্রী। যার হাতে রয়েছে রাজ্যের সমস্ত শক্তি। তার পাশে ইরান মহাসেনাপতি, মহাকায়স্থ, কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী। তারপর প্রধান বিচারপতির আসন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র নাগরিকদের মধ্যে রয়েছে গায়ক, নর্ত্তক, নট, বাজীকর প্রভৃতি। সকলেই এরা নিজ নিজ দেশের ভিন্ন ভিন্ন রকমের রং বেরংএর পোষাকে সজ্জিত। তার মধ্যে ভারতীয় গায়ক ও নর্ত্তকের সংখ্যাই বেশী। মাত্র সত্তর বৎসর

আগে বহরাম গোর অনেক অনুনয় বিনয় করে এদের ভারতবর্ষ থেকে এখানে এনেছিলেন।

আজও রাজসভায় এদের মধুর সংগীত ও অপরূপ নৃত্যের তেমনি সম্মান অক্ষুণ্ণ রয়েছে। শুধু অক্ষুণ্ণ কেন, অনেকগুণে বর্দ্ধিত হয়েছে। তার প্রধান কারণ, এই সকল ভারতীয় শিল্পিরা ভারতীয় কলার সঙ্গে ইরানীয় কলার সংমিশ্রণ করে এই কলাকে শতগুণে মোহক করে তুলেছে। প্রথম প্রথম ভারতীয় সঙ্গীত যে কোনও সময় পরিবেশন করা হত। এই সময় থেকে তাকে দিন রাত্রি বা প্রহর অনুযায়ী ভাগ করে গাওয়া সুরু হয়। এতে ভারতীয় মিশ্র সঙ্গীত কলা সময়োপযোগী হয়ে মধুরতম হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ সভাগৃহের মধ্যে যেন নীরব রাজ্য। সভাগৃহ ভর্ত্তি মানুষ, কিন্তু এতটুকু শব্দ নেই। এমন সময় হঠাৎ যেন সকলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কতক লোক আভুমি নত হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে শাহনশাহের। কেউ কেউ সুর মিলিয়ে ধ্বনি করে "অমর হউন" "সফলকাম হউন"। অথচ যার জন্য এতকাণ্ড হল তিনি এখনও সশরীরে দর্শন দেন নি। সভাগৃহের এক দিকে বিরাট উঁচু বেদীর সামনে সুবর্ণ-মণি-মুক্তা খচিত রেশমী পর্দ্দা। ধীরে ধীরে পর্দ্দা দুদিকে ফাঁক হয়ে সরে যায়। প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশ হাত চওড়া আবলুস কাঠের উপর হস্তীদন্ত ও নানাপ্রকার রত্ন মাণিক্য খচিত বিশাল চবুতরা। উপরে সুবর্ণ-মরকত-মণি-মুক্তা খচিত চন্দ্রাতপ। বেদীর উপর মনোহর রেশমী কালীন বিছানো। কালীনের বভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর দৃশ্য অঙ্কিত। বসন্ত ঋতুর দৃশ্য দেখলে মনে হয় চাক্ষুষ দেখছি বসন্তের অপরূপ শোভা। পত্রহীন বৃক্ষ আর হিমাচ্ছাদিত ভূমির দৃশ্য দেখলে সত্যিই যেন শীত অনুভব হতে থাকে।

বেদীর উপর মুখ্য সিংহাসন। তার দুই পাশে মণিময় আসন্দী-গুলির সামনে মখমল জঠিত সুবর্ণ পাদপীঠ। মধ্যবর্ত্তী আসন্দীর পিছনে তিনখানি ভিন্ন আসন্দী।

মুখ্য সিংহাসনে উপবিষ্ট এক মহাতেজী পুরুষ। যার দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু বেশীক্ষণ সে রূপের দিকে কেউ তাকাতে পারে না। তার শরীরের মুক্তাখচিত নিলীমাযুক্ত সাদা ও কালো রংয়ের কঞ্চুকের উপর আলোর ছটা বিচ্ছুরিত হয়ে আলো আঁধারির সৃষ্টি করেছে। এই মহাপুরুষটীর পরিধানে লাল রংয়ের পায়জামা। ছোট করে ছাঁটা অরুণবর্ণ দাড়ী, কুঞ্চিত কেশ। কণ্ঠে তিন প্যাচ খাওয়া রত্নমালা। কব্জিতে কঙ্কন। পাদপীঠের উপর রাখা রয়েছে বহুমূল্য কামদার জুতো। সবচেয়ে দর্শনীয় জিনিষ হল এই মহাপুরুষটীর মাথার উপরের মুকুট। বাইরে থেকে দেখলে আন্দাজ করে নেওয়া কঠিন নয় যে মুকুটটী কমপক্ষে সোয়া দুই মন ওজন হবে। কিন্তু অত ভারী মুকুট একটা মানুষের মাথায় কেমন করে রাখে? মুকুটের চূড়ার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে খুব সরু অথচ মজবুত শিকল। কাছে না এলে এই শিকলে যে মুকুটটী ছাদের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে, তা বোঝা যায় না। পাশের সূক্ষ্ম গবাক্ষপথে আসা আলোয় রশ্মি এই বিশাল মুকুটটীর উপর পড়ে এমন চকমক করে জ্বলছে যে শিকলের দিকে দর্শকের নজরই যায় না।

পর্দ্দা সরে যাবার পর সভাগৃহের সকলে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে অভিবাদন করে। অতঃপর একজন পদাধিকারী উঠে আদেশ করেন সময়োপযোগী সঙ্গীত পরিবেশন করতে। ধর্মাধ্যক্ষ উঠে দাড়িয়ে রাজকুলে নবজন্মের সংবাদ শোনালেন এবং সিংহাসনাসীন মহাপুরুষের আজ্ঞা পেয়ে তাদের মণি মুক্তা প্রভৃতি উপহার প্রদান করলেন।

সহস্র নেত্র একদৃষ্টে ঐ একটী দিব্য-প্রভাবী মনুষ্যমূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রথম দর্শনেই সরল মনে বিশ্বাস জাগে যে, ঐ মানুষটীর মধ্যে দৈব-বিভূতি রয়েছে। দেবসভার মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র কেমন করে বসতেন তার প্রমান এখানে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সমাগত জনমণ্ডলী অতৃপ্ত চক্ষু দিয়ে প্রাণ ভরে পান করছে

সেই মহাপুরুষটীর রূপ। বায়ুমণ্ডল কস্তুরী; কেশর, গোলাপ ও চন্দনের গন্ধে ভরপুর।

এই সময় পিছনের দরজার কাছে কিছু জনতার মধ্যে চঞ্চলতা দেখা যায়। একজন সৈনিকবেশী ভট ত্রস্তভাবে এসে সেনানায়কের কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি কিছু বলে। চোখে মুখে তার ভয় ও চিন্তার ছাপ। সেনানায়ক উঠে মহাসেনাপতির কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন। মহাসেনাপতি মহামন্ত্রীকে জানালেন। এমনি করে সংবাদটী সিংহাসনাসীন পুরুষটীর কানে পৌঁছে দেওয়া হল। আজ্ঞা পেয়ে সৈনিকবেশী ভট প্রস্থান করে।

উপরের শ্রেণীতে আসীন সকল পুরুষের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। তাছাড়া অন্যান্য সমাগত জনমণ্ডলী বুঝতে পারে না, ব্যাপারটা কি।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই সৈনিকটীর পিছনে পিছনে কুড়ি পঁচিশ জন সাধারণ মানুষ প্রবেশ করে। এরা তম্পোন রাজ্যের প্রজা। এদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষের পরনে লালবস্ত্র। যদিও সেগুলি জীর্ণ, তবুও তাদের চোখে মুখে দৈন্যতার চিহ্ন নেই। বাকী সকলের পোষাক পরিচ্ছদে দৈন্যতার ছাপ সুস্পষ্ট। রক্ত-বস্ত্রধারীদের চেয়ে তারা কৃশ ও তাদের চেহারা মলিন। ত্রস্তপদে তারা সিংহাসনের দিকে এগিয়ে আসছিল। সিংহাসন থেকে প্রায় দশহাত দূরে সৈনিকটী দাড়িয়ে যেতে সকলে থেমে যায় এবং আভূমি প্রণতঃ হয়ে শাহনশাহের আনুগত্য প্রকাশ করে। ওরা উঠে দাড়াতে শাহনশাহ প্রশ্ন করেন;

—কি চাও তোমরা? আগন্তুকদের ভিতর থেকে একজন রক্ত বস্ত্রধারী এগিয়ে এসে শাহের প্রশ্নের উত্তরে বললো

—প্রভু! আমরা অর্থাৎ আপনার প্রজারা অন্নাভাবে মৃত্যুপথ যাত্রী। পর পর কয়েক বৎসর বৃষ্টি না হওয়ায় ফসল একেবারেই হয় নি। চ'ষী মজুরদের কাছে তাদের পেট চালাবার মত অন্ন নেই।

তার উপর রাজধানীর অন্নের জন্য তাদের উপর অত্যাচার চলছে অহরহ। তাছাড়া অন্যান্য বছরের মজুদ শস্য এবং নানা প্রদেশ থেকে আমদানী করা শস্য সকল বিস্পোহ্য উচ্চপদাধিকারীদের গুদমে আটক পড়েছে প্রচুর পরিমানে! তারা প্রজাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি বরছে সেই অন্ন সুযোগ মত চড়া দামে বিক্রী করে। আজ পর্যন্ত এক লক্ষেরও বেশী শিল্পি ও কর্মকার অনাহারে মারা গেছে। সেই সকল শিল্পি এক মুঠো অন্নের জন্য তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করেছে, যারা শাহনশাহের মুকুট তৈরী করেছিল, সিংহাসন এবং কালীন সাজিয়েছিল। প্রাসাদ ও দুর্গ তৈরী করেছে। সেই সকল চাষী আজ হাজারে হাজারে প্রতিদিন মরতে বাধ্য হচ্ছে, যারা সারা দেশের অন্ন জন্ম দেয়, বস্ত্র উৎপাদন করে। আজ দখ্‌মার মধ্যে মড়া স্তুপাকার হয়ে জমে আছে, সে গুলিকে খেয়ে শেষ করবার জন্য শকুনেরও অভাব দেখা দিয়েছে। এদিকে রাজপথে, গলিতে গলিতে মৃত্যুর তাণ্ডব চলেছে। অন্যদিকে রাজ্যের উচ্চ আমলাবর্গ এবং ধনী মানী বিস্পোহ্য মহাশয়রা আনন্দোৎসবে ব্যস্ত। আজ আমাদের সামনে মৃত্যু অথবা জীবন, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আর আমরা এইভাবে জীবন্মৃত হয়ে থাকতে চাই না।

সিংহাসনাধীন পুরুষটী মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন প্রজার দুঃখের কাহিনী। মাঝে মধ্যে দু-একটা প্রশ্ন করছিলেন। এদিকে সোনা রূপার সিংহাসনে আসীন পুরুষদের চক্ষু ক্রমশঃ রক্তবর্ণ ধারণ করছে। ক্রোধে তাদের ঠোঁট কাঁপতে থাকে, আর ভয়েঃ জিহ্বা শুকিয়ে যায়। বক্তা তাদের দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলতে থাকে,—

—তাহলে আমরা কি এই কথাই জানব যে, আপনি শুধু ওদের শাহনশাহ, আমাদের কেউ নন?

—নিশ্চয়, আমি তোমাদেরও শাহ। কিন্তু তোমরা কী চাও? বিচলিত ভাবে জিজ্ঞাসা করেন শাহ।

—প্রভু! আমরা বেঁচে থাকবার মত অন্ন-বস্ত্র চাই। আজ আপনার রাজত্বে একজনও গরীব প্রজার একদিনের অন্ন নেই। সব ঐ সকল মহাপুরুষদের গোলায় গুদমজাত হয়ে নষ্ট হচ্ছে। হয় আমাদের বাঁচতে দিন, নয় মৃত্যুর জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে এসেছি। আপনার সৈনিকদের আদেশ দিন, তারা দয়া করে আমাদের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করুক। এই জন্যই আজ আমরা পঞ্চাশ হাজার লোক আপনার চরণে এসেছি। হয় আমরা বেঁচে থাকার আশ্বাস নিয়ে ফিরে যাব, নয় এই খানেই প্রাণ দেব। শুধু পঞ্চাশ হাজার আমরা রাজপ্রাসাদের সামনে আছি। আরও আসবে, যতক্ষণ দেবাদিদেবের এই দুর্গ মড়ায় পরিপূর্ণ না হবে, ততক্ষণ লক্ষ লক্ষ আসতে থাকবে, তখন ঐ সকল মহাপুরুষরা আপনাকেই মড়ার বাদশাহ বলে ডাকবে।

বক্তার কথা শেষ না হতেই উপরের সারির আমলাবৃন্দ একসঙ্গে বলে ওঠে, বেদীন, মজ্‌দকী (বিধর্মী, ধৃষ্ঠতা) প্রভৃতি।

—মৃতের শাহনশাহ? না না। শাহনশাহ উত্তেজিত হয়ে বলেন, আমি মৃতের শাহ হতে চাই না। পিরোজ পুত্র জীবিতের বাদশাহ হয়েই থাকতে চায়। যাও তোমার সাথীদের বলে এসো যে কবাত তোমাদের জীবিত দেখতে চায়। ক্ষুধিতকে অন্ন এবং বিবস্ত্রকে বস্ত্র দেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

কথা শেষ করেই শাহনশাহ উঠে দাড়ান আসন্দী ছেড়ে। ক্ষোভে ও দুঃখে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সংকেত পাওয়া মাত্র সামনের পর্দা পড়ে যায় এবং আজকের দরবারের যবনিকা ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ স্বর্গ ও নরক ॥

অন্ধকার রাত্রি। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকারে গভীর নীরবতা। অন্ধকারের এই করাল মূর্ত্তি দেখে তিগ্রাও বোধ হয় ভীত হয়ে তার নিরন্তর গতিকে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রেখে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। দুর্গের মধ্যে হয়ত প্রাণের সাড়া কখনও সখনও পাওয়া যায়, কিন্তু বাইরের পৃথিবী একেবারে নিথর নিস্তব্ধ। দুর্গের মহাদ্বারের প্রহরীগুলিও কেমন যেন নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রহরা সজাগ রয়েছে। তাদের চোখ এড়িয়ে একটী প্রাণীরও ভিতরে প্রবেশ করবার সাধ্য নেই।

দুর্গের ভিতরে রাজপ্রাসাদের মধ্যে চল্লিশটী থামযুক্ত বিরাট একটা হলঘর। এটা শাহনশাহের নিজস্ব বৈঠকখানা। দেয়ালে দেয়ালে মশাল জ্বলছে। মশালগুলি সাজাবার এমন কৌশল, যেন ঘরটীকে দ্বিগুণ মনে হয়। এখানেও রয়েছে সুন্দর সুন্দর বহুমূল্য আসন শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজানো। তবে শাহ কবাতের মুখ্য আসন্দীর উপর তেমন বড় মুকুট ঝোলানো নেই, যেমন রয়েছে মুখ্য দরবার কক্ষে। তাছাড়া অভিনয়-মঞ্চও নেই এখানে। .এখানকার বেশভূষা অতিশয় নম্র ও বিনীত। শাহের চেহারায় নম্রতা ও উদাসীনতার ছাপ।

শাহ একা একা কারও জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল অন্যদিকের কোনের দরজা দিয়ে একজন রক্তবসন পরিহিত পুরুষ প্রবেশ করলেন। আগন্তুক পুরুষের চাল চলনে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ভাব পরিস্ফুট। মশালের তীব্র আলোয় আগন্তুকের লম্বা ও তাম্রবর্ণ দাড়ীগুলি চিকমিক করে। গৌরবর্ণ

মুখের উপর শ্যেনাকার দীঘল নাক, বড় বড় চোখ, প্রশস্ত ললাট, নিটোল স্বাস্থ্য। শাহের সামনে এসে পুরুষটী মাথা সামান্য নত করে দুই হাত বুকে লাগিয়ে অভিবাদন জানান।

শাহ উঠে দাড়িয়ে আগন্তুককে স্বাগত জানান এবং পাশের আসনে বসতে অনুরোধ করেন। আগন্তুক আসন গ্রহণ করতে কবাত বললেন,

—এতবড় বিশাল সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হয়েও আমি আমার প্রজাদের কোন সংবাদই রাখতে পারি না, এইটাই আজ আমার সবচেয়ে অনুতাপের বিষয়।

—এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই শাহ। এই রকম হওয়াই শাহনশাহের বংশ পরম্পরা নিয়ম। কোন জিনিষই নিজের চোখে না দেখে অপরের চোখকে বিশ্বাস করা এবং তার সম্বন্ধে কিছু করাই ত রাজবংশের নিয়ম। এ নিয়ম লঙ্ঘন করা সম্ভব নয় আপনার পক্ষে।

—তা আর হবে না। এমনি অন্যায় ভাবে অত্যাচারিত হয়ে আমার প্রজারা মৃত্যু-বরণ করবে আর আমি চুপ করে বসে দেখব, এ অসম্ভব। বিচলিত ভাবে বলেন শাহ কবাত।

—হুঁ! আজ আপনার শুধু বিশ্বাস জন্মেছে যে আপনার তস্পোন-এর প্রজারা ভীষণ সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে বা না খেয়ে মরছে। আর সে বিশ্বাসটাও অপরের মুখে শোনা কথার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাস্তবে সে সঙ্কটটা কতখানি তার পরিচয় চাক্ষুষ না দেখলে অনুমান করাও আপনার পক্ষে অসম্ভব, এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করাও কঠিন।

—আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি, তাছাড়া অন্যান্য সূত্রেও আমি অনেক প্রমাণ পেয়েছি।

—জানি, কিন্তু আমার কথা হ'ল আমার বা অন্য যে কোনও লোকের কথায় বিশ্বাস করবার চেয়ে নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আপনার দৃঢ় সঙ্কল্প বা কার্যশক্তি পেতে পারেন না।

—তা হবে, কিন্তু আপনি ত জানেন শাহনশাহের জীবন সম্পূর্ণ পরতন্ত্রের অধীন।

—হ্যাঁ, শুধু পরতন্ত্র নয় সঙ্কটপূর্ণও বটে!

তিনি নিজের পালঙ্কের উপর শুয়ে স্বস্তিতে ঘুমোতে পারেন না, নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষ রোজ ব্যবহার করতে পারেন না। আজ এখানে, কাল সেখানে শয়ন করতে বাধ্য হন।

—কারণ তার সবচেয়ে নিকট বন্ধু ও বিশ্বাসের পাত্রই তার জীবনের সংহারক হয়ে থাকে। নিশ্চিন্তমনে সে মন্দিরার পাত্রটাও মুখে তুলতে পারে না, এমনও হতে পারে তার মধ্যে বিষ মেশানো রয়েছে।

—হ্যাঁ, শাহ। তাই নিজের চোখে আপনার রাজধানীর দৃশ্য দেখবার জন্য রাস্তায় নামতেও ভয় লাগছে। কি জানি, রাস্তায় কেউ যদি আক্রমণ করে? কিন্তু আমার উপর বিশ্বাস থাকলে আপনি নিশ্চিন্তমনে আমার সঙ্গে রাস্তায় আসতে পারেন!

—বামদাত পুত্রের উপর আমার অকপট বিশ্বাস আছে। ঐশ্বর্য্য আর প্রভাবে শাহনশাহের পরেই প্রধান ধর্মাধ্যক্ষের যে পদ সে পদের জন্মগত অধিকার আপনার। কিন্তু আপনি নিজে সুখী থেকে অপরের দুঃখ দেখতে পারেন না বলে অম্লানবদনে সে পদ ত্যাগ করেছেন।

—না না, ও আর এমন কি ত্যাগ করেছি। শুধু লোভটাকে একটু সংযত করা মাত্র। যা কিছু করেছি, তা শুধু আমার হৃদয়ের আগুনকে চাপা দেবার জন্য একটা চেষ্টা। আজ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী মানুষকে এই একই দুঃখে-কষ্টে জর্জরিত দেখে যে কোন মানুষের হৃদয় বিগলিত হওয়া স্বাভাবিক।

—তুচ্ছ স্বার্থ। অজ্ঞানতা অথবা মানবের হৃদয়হীনতার জন্যেই সকলে আজ স্বার্থটাকেই বড় করে দেখছে। কিন্তু আমি সেই সত্যিকার মানবহৃদয় প্রাপ্ত হতে চাই, আর তা শুধু আপনিই

আমাকে দিতে পারেন। আপনার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে।

—তা বটে, আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু আমি নগরের সকল মানুষকে বিশ্বাস করতে পারি না। হেসে বললেন বামদাতপুত্র মজদ্‌ক। অতএব আপনি এই সাধারণ বেশেও রাজপথে বের হতে পারবেন না। এই পোষাক ছেড়ে আমরা সাধারণ কায়স্থের পোষাক পরে রাস্তায় যাব।

—বেশ চলুন তাহলে আমরা পোষাক বদল করি।

অতঃপর কবাত ও মজদ্‌ক প্রতিহারীর সঙ্গে অন্যদিকের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

* * *

অন্তঃপুরের ছাদের উপর সাধারণ কায়স্থের পোষাক পরে শাহনশাহ কবাত এবং বামদাতপুত্র মজদ্‌ক নগরীর দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মজদ্‌ক বললেন,—

—চন্দ্রোদয়ের এখনও কিছু সময় দেরী আছে, অর্থাৎ চন্দ্রোদয় হলেই অর্দ্ধরাত্রি হবে। তখন নগরীর উপর থেকে অন্ধকারের কালো আবরণ সরে যাচ্ছে। ঐ দেখুন আমাদের সামনে, তস্পোন রাজ্যের সাতটি উপনগর। এটা তস্পোন, ওটা বেঃঅর্দশীর নগরী। এই ঘন অন্ধকারের মধ্যেও-অর্দশীরকে সজীব বলে মনে হয়। সিকান্দার সেনাপতি সেলুকস যখন থেকে ঐ নগরীর প্রবর্ত্তন করেন সেই থেকে আজ অবধি ওর প্রতি ঘরে ঘরে যেন নিত্য উৎসব লেগে আছে। ওদিকে রোমকান (বেঃ অন্তিয়োক) নগরী সুখ সমৃদ্ধিতে যবন নগরী থেকে কম নয়। তিগ্রার দুই তীরে এই দুই নগরীর মধ্যে চিরকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছে। এপারের তটের বাঁদিকে অস্পানবর আর ডানদিকে মাহোজা। এই গহন অন্ধকারেও প্রত্যেককে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। অমানিশার বুক চিরে ওদের প্রদীপের রশ্মি আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আর ঐ যে অন্ধকার জায়গাটি দেখছেন

ওটাও একটা নগরী। চেয়ে দেখুন ওখানে একটিও প্রদীপ জ্বলছে না। মনে হচ্ছে যেন মৃতনগরী। আর তার কত কাছে এই তস্পোন'এর মুখ্যনগরী ভূ-স্বর্গ। এ শুধু সজ্জিতই নয়, অভিসারিকার বেশে সর্ব্বদা সজ্জিত। কিন্তু আপনি আগে স্বর্গ দেখতে চান না নরক?

—প্রথমে নরকে চলুন। ঐ জায়গাটা এখান থেকে বেশী দূরে নয়।

—সত্যিই ওটা নরক। চারিদিকে শুধু অন্ধকার আর অসহ্য নীরবতা। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা হয়েছে তাতে একটু বেসামাল হলেই গর্ত্তের মধ্যে পড়ে হাত পা ভাঙ্গতে পারে।

দুই জনে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন অন্ধকার নগরীর রাজপথে নরকের দিকে। ক্রমশঃ রাজপথ শেষ হয়ে এবড়ো থেবড়ো আঁকা বাঁকা পথ শুরু হয়। এবার মৃত নগরীর পথে পা দেন সাসানী সম্রাট কবাত এবং তাঁর পথদ্রষ্টা মজদ্‌ক।

দুদিকের বাড়ীগুলি আকারে খুব ছোট। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় না এখানে কোন জীব থাকে। অতি সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে অসমতল নোংরা রাস্তায়। মধ্যরাত্রির অসাড় পৃথিবীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে মাঝে মাঝে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাপটা মেরে যায়, শিউরে উঠে পিছন দিকে ফিরে তাকায় পথিকদ্বয়।

কিছুদূর গিয়ে মজদ্‌ক একটি বাড়ীর সামনে দাঁড়ান। বাড়ীটার দরজার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলোর রশ্মি দেখা যায়। মজদক কবাতের হাত ধরে নিয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দরজা ভেজান ছিল, ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না। একটু চাপ দিতেই দরজা খুলে যায়। খোলা দরজা পথে এক ঝলক হাওয়া ঢুকে ঘরের প্রদীপের নিশ্চল শিখাটাকে এলোমেলো করে দেয়। একদিকে একটা চাটাইয়ের উপর একব্যক্তি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল, পদশব্দ পেয়ে বোধ হয় একটু সচকিত হল। মেঝের মধ্যস্থলে আর

একটি চাটাইয়ের উপর আর একটি মানুষের কঙ্কাল পড়ে ছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সেই মূর্ত্তিটি মাথা তুলে দরজার দিকে তাকাতে মনে হল সে দেহে এখনও প্রাণ বর্ত্তমান। দেয়ালে হেলান দেওয়া মূর্ত্তিটি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলতে শায়িত মূর্ত্তিটি "আমার গুরু স্বাগতম" বলে অভিবাদন করবার জন্য উঠে দাড়াতে চেষ্টা করতে গিয়ে পারল না। কাত হয়ে পড়ে যেতে যেতে মজদক গিয়ে ধরে ফেল্লেন। অতঃপর তিনি তার সাথীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

এ রাজধানীরই একজন সিদ্ধহস্ত শিল্পি। এরই পুত্র শাপোর এবং বেলারিয়নকে বিজয়ী এবং বিজিতরূপে চিত্রিত করে বহুমূল্য এক চিত্র-কালীন তৈরী করেছিল। যা আজও অন্যব্যক্তির নামে সভাগৃহে শোভা পাচ্ছে। এর সেই উপযুক্ত পুত্র ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুবরণ করেছে। একটা কন্যা ছিল সেও বাধ্য হয়ে শরীর বিক্রয় করে ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এতবড় অনটনের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে সেও মৃত্যুর আশ্রয় নিয়েছে। আর এখন এই অভাগা মাতা পিতা মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

গৃহের মূর্তি দুটি আগন্তুকদ্বয়ের দিকে শুধুই তাকিয়ে থাকে। তাদের যেন বলবার কিছু নেই। যদিও কথা বলার মত শক্তি বা ইচ্ছাও তাদের ছিল না অথবা এই ভেবে চুপ করে আছে হয়ত, তারা যা বলতো, তা স্বয়ং অন্দর্জগর (গুরু) বলছেন।

অতঃপর ক্ষুণ্ণমনে আগন্তুকদ্বয় বাইরে আসেন। আকাশের বুকে চাঁদ উঠেছে বটে, কিন্তু সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে তার প্রকাশ তখনও মাটীর বুকে প্রতিফলিত হয়নি।

কিছুদূর এগিয়ে আর একটি ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন দুজনে। একজন তরুণ বাস্তুশিল্পির ঘর এটা। এই শিল্পির সারা ভবিষ্যতের স্বপ্নের নমুনা একটা শ্বেতপাথরের ছোট্ট প্রাসাদ। যাতে রোমান, ভারতীয় এবং অখানসী বাস্তুকলার অপূর্ব সংমিশ্রন দেখানো হয়েছে। তরুণ মনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল ঐ প্রসাদের সাকার রূপ দেবার,

তাই মৃত্যুকালেও সেই ক্ষুদ্র নমুনা শিয়রে রেখে বার বার তাকিয়ে দেখছে। প্রথম দৃষ্টিতেই নতুনসাথী মর্ম্মরপ্রাসাদের নমুনা দেখেই অনুমান করে নেন যে এই তরুণ শিল্পির মস্তিষ্ক কতখানি উর্ব্বর। স্ত্রী স্বামীর কানের কাছ মুখ নিয়ে কিছু বলতে অনেক কষ্টে তরুণ জবাব দেয়,

—না না, আর কষ্টের কি আছে। এখন ত কষ্ট শেষ হবার সময় হয়ে এসেছে। পিতামাতা সবাই চলে গেছেন এবার আমরা দুজনে সেজে গুজে বসে আছি যাত্রা করবার জন্য।

—কিন্তু আমি ত তোমাদের অন্ন পাঠিয়ে দিয়েছি। অন্দর্জগর কথার মাঝে বললেন।

—হ্যাঁ পেয়েছি। কিন্তু চোখের সামনে পড়শীর দুধের বাচ্চাকে অনাহারে মরতে দেখতে না পেরে সে অন্ন তাদের দিয়ে দিয়েছি। আপনিই ত শিখিয়েছেন নিজের জীবন দিয়েও অন্যের কাজে লাগবে। তাই আমি যা করেছি আমার মনে হয়, অন্যায় কিছু করিনি।

অন্দর্জগর'এর নতুন সাথী মুখে কিছু না বললেও এই করুণ দৃশ্যে তাঁর হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হানে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তিনি লক্ষ্য করছিলেন অন্দর্জগরের প্রতি লোকগুলির গভীর প্রেম।

তারপর এক চর্মকারের গৃহে উপস্থিত হলেন দুজনে। এখানেও ঠিক একই অবস্থায় কয়েকখানি কঙ্কাল পড়ে রয়েছে ঘরের মাঝে চাটাইয়ের উপর। অন্দর্জগর বললেন,

—এ সেই শিল্পি যার রত্নজটিত কলাপূর্ণ জুতা এই রাজ্যে সবচেয়ে অধিক দামী ও সম্মানী ছিল। কিন্তু পেটের জ্বালায় আজ ও নিঃস্ব। হয়ত আর দু একদিনের মধ্যেই ইহলীলা শেষ হয়ে যাবে।

এরপর তন্তুবায়, ছুতোর কুম্ভকার প্রভৃতি শিল্পিদের পাড়ায় ঘুরে নানা করুণদৃশ্য দেখতে লাগলেন দুজনে। ইতি মধ্যে চাঁদের আলো উজ্জ্বল হয়েছে আরও। আশপাশের ঘরবাড়ী রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার

দেখা যায়। এবার এক বেনের ঘরে গিয়ে পৌছলেন ওরা। কোনও এক সময়ে এটা একটা ছোট মুদীখানা দোকান ছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবার পর মুদী চারগুণ দরে মাল বিক্রী করতে লাগলো, ধনের লোভে অল্পদিনেই দোকানের সব মাল বিক্রী হয়ে গেল। পরিবর্তে সোনা রূপা পেয়েওছিল অনেক। কিন্তু পরে একে একে তার ফল ভুগতে হচ্ছে। একদিন যে সব ধনীর কাছ থেকে চারগুণ "দাম' (দ্রাখ্‌মা নামক রৌপ্য মুদ্রার $\frac{1}{6}$ অংশ) নিয়ে বিক্রি করেছিল, পরে এক'মুঠো গমের বদলে চার মুঠো দ্রাখমা (রৌপ্যসিক্কা ৩৬ গ্রেণ) এবং ক্রমশঃ দীনার (সোনার সিক্কা ১৩'৬৯ গ্রেণ) দিয়ে কিনতে গিয়ে কয়েকদিনে সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ অন্য সকলের মত এও মৃত্যুর পথযাত্রী। অনেক দুঃখে বণিকপ্রবর বললো,—আগে বুঝতে পারিনি যে অন্নের চেয়ে মূল্যবান ধন আর কিছুই নেই। তাহলে এমন ভূল করতাম না। অন্ততঃ নিজের পরিবারটিকে কোনও প্রকারে রক্ষা করতে পারতাম।

অন্দর্জগর তাঁর সাথীর মনোভাব বুঝতে পেরে স্বান্তনার সুরে বল্লেন,—

—দেখছেন তো, কত মর্মান্তিক এই দৃশ্য? রাজধানীর স্বর্গের পাশেই কেমন নরকের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। যাই হোক এতক্ষণ নরক দেখলাম আমরা, এবার যদি স্বর্গের দৃশ্য দেখতে চান তো বেঃঅর্দশীর চলুন। তারপর ফিরবার সময় ঐদিকের পুল পার হয়ে ফিরে যাব।

বেঃঅর্দশীর যাবার পথে দর্জনীতান মহল্লা হয়ে যেতে হয়। বস্তুতঃ নরকের দেখা এইখানেই পাওয়া যায়। নগরীর সবচেয়ে দরিদ্র বস্তি এটা। প্রায় ঘরগুলিই জন্য। মৃত বা অর্দ্ধমৃতের একই অবস্থা। না আছে, কেউ দেখা শোনার, না আছে কেউ সৎকাজ করবার। যে যেখানেই মরছে সেইখানেই পচে গলে রয়েছে, কুকুর শিয়াল সেইখানেই তাদের পরিষ্কার করবার দায়িত্ব নিয়েছে।

মাঝে মাঝে ভয়ও লাগে, কী জানি হয়ত ওদের উপরই আক্রমণ করে বসবে সারমেয়ের দল। কিন্তু না, দয়ালু মানবতার প্রতীক অন্দর্জগরের দিকে কটাক্ষ করবার ক্ষমতা নেই কারুরই। মনে হয় সব জায়গায়ই তাঁর লোক প্রস্তুত হয়ে আছে সর্বদা স্বাগত জানাবার জন্য। একা অন্দর্জগরের পক্ষে কটা লোককেই বা সাহায্য করা সম্ভব! তাই বেশীর ভাগ জায়গায়ই তাঁর সুধা মিশ্রিত স্বান্তনা বাণীই বর্ষিত হয়ে চলেছে। যা দেখে নতুন সাথী কবাতের চোখেও জলের ধারা নেমে আসে।

—এ সেই জায়গা, যেখান থেকে শাহনশাহ রোমের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য শক্তিশালী সেনা সংগ্রহ করতেন। আজ সেই সকল হাত নিরাশ্রয় অসহায় ভাবে রাস্তার মাঝে পড়ে আছে। জীবন্ত সেই সকল দেহ গুলিকে কুকুর শৃগালে কামড়ে খেয়ে যাচ্ছে। যারা এক সময় নগরীর ঐ সব বিশাল প্রাসাদগুলি তৈরী করেছে, সাগর খুঁড়েছে পাহাড় টেনে এনেছে। কিন্তু আঁজ সেখানে মহাশ্মশাণের হিমশীতল নিস্তব্ধতা বিরাজমান।

এরপর ওরা বেঃঅর্দশীর (সলুকিয়া) এলাকায় পৌঁছলেন। তিন মহল, চার মহল যুক্ত বিরাট রমণীয় প্রাসাদশ্রেণী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। চাঁদের আলোয় মর্মর প্রাসাদ গুলিকে দুগ্ধস্নাত মনে হয়। অর্দ্ধরাত্রির পরেও এই এলাকার প্রায় ঘরে প্রদীপ জ্বলতে দেখা যায় এবং আমোদ প্রমোদের কলরব কানে আসে। অন্দর্জগর যবনী গণিকা "দোরা"র ঘরের সামনে এসে দরজায় মৃদু আঘাত করেন। কিছুক্ষণ পরে একজন পরিচারিকা এসে দরজা একটু ফাঁক করে "অবকাশ নেই" বলে আবার বন্ধ করতে গিয়ে অন্দর্জগরের দিকে তাকিয়ে দরজা খুলে অভিবাদন করে একপাশে সরে যায়। অন্দর্জগর বললেন,

—আমরা এখানে আসন দখল করতে আসিনি। কোনও গুপ্ত-স্থান থেকে ভিতরের দৃশ্য দেখতে চাই। বিশাল প্রাসাদের মধ্যে

তেমন জায়গার অভাব নেই। দাসী সসম্ভ্রমে ওদের দুজনকে নিয়ে এক কোনে দুটি আসন এগিয়ে দেয়। অন্দর্জগর ও কবাত দুজনে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখেন, একই আসনে গণিকা দোরাকে পাশে বসিয়ে আলাপ করেছেন প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ। একই সুবর্ণ চষকে একবার নিজে পান করছেন, আবার দোরার মুখের কাছে তুলে ধরছেন। কখনও বা দোরাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে বলছেন, "জাহান্নমে যাক মজদকীরা। দোরা! জীবনের এক এক মুহূর্ত্ত তোমার কাছে থাকা, তোমার স্পর্শ পাওয়া স্বর্গ সুখের চেয়েও অধিক মধুর।

ইনিই ইরানের সবচেয়ে বড় ধর্মগুরু এবং ধার্মিক। যার একটি কথা ভগবানের বাক্য মনে করে সমস্ত ইরানবাসী।

তার পাশের ঘরে ইরানের মহাসেনাপতিকে স্বর্গের আনন্দ দান করছে সৌন্দর্যময়ী গণিকা বর্দকা (লাল গোলাপ)। বর্দকা রাজধানীর প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী ও রাজনর্ত্তকী। তার নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে সেনাপতি নিজের গলার মুক্তাহার উপহার দিলেন বর্দকার গলায় পরিয়ে দিয়ে।

অন্দর্জগর কবাতকে নিয়ে এবার বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করেন,—দেখলেন ত? এই দৃশ্য এবং এখানকার আবহাওয়া দেখলে মনে হয় কি এখানে নরকের আগুনের আঁচ লেগেছে? আরও দেখতে চান?

—না না। আর আমি সহ্য করতে পারবো না।

—কিন্তু এদের সব সহ্য হয়। এই সময় ইরানের পাঁচ প্রধান, সাতজন সামন্ত এবং বহু রাজকুমার এই বিলাস নগরীতে স্বর্গসুখ অনুভব করেছেন। এখানে না আছে ক্ষুধার তাড়না, না আছে মৃত্যু-দুতের চোখ রাঙ্গানী।

ফিরবার পথে তিক্রার সেতু পার হবার সময় নতমস্তক কবাতকে উদ্দেশ্য করে বললেন অন্দর্জগর,—ভগবান পৃথিবীতে অন্নের সৃষ্টি করেছেন এই জন্য, প্রত্যেক মানুষ সমান ভাবে খেয়ে সুখে জীবন যাপন করুক। একজন অন্যজনকে বঞ্চিত করে বেশী গ্রহণ না করুক।

কিন্তু আজকের পৃথিবীর মানুষ কোথায় নেমে এসেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে তার ভাইয়ের চেয়ে বড় ভাবছে। এর সমাধানের একমাত্র উপায় হল ধনীদের সঞ্চিত ধন নিয়ে গরীবদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া। যাতে মানুষে মানুষে অন্তর না থাকে, সকলে সমান সম্পত্তির অধিকারী হয়।

কবাত আজকের এই সকল দৃশ্য দেখে এবং অন্দর্জগরের মধুর বাণীতে ভীষণ প্রভাবিত হন। অবশেষে অন্দর্জগর প্রশ্ন করেন,—কারও কাছে নির্বিষ ওষুধ থাকতে, তার চোখের সামনে যদি কোন সর্পদংশিত ব্যক্তি বিনা ওষুধে প্রাণত্যাগ করে, তাহলে সেই নির্বিষ ওষুধের অধিকারীর কি দণ্ড হওয়া উচিত ?

—মৃত্যু। দৃঢ়স্বরে বলেন কবাত।

—যদি কোনও নিরপরাধীকে ঘরে বন্দী করে তাকে খেতে না দিয়ে মেরে ফেলা হয়, তার দণ্ড কি হবে ?

—মৃত্যু। কঠিন হয়ে ওঠেন কবাত।

অতঃপর অন্দর্জগর তাঁর সাথীকে অন্তঃপুরের পথে পৌঁছে দিয়ে নিজের রাস্তায় পা বাড়ালেন।

নিজ শয্যায় পৌঁছে কবাতের মাথা ঘুরতে থাকে। তার মনে হয় সে যেন অন্য পৃথিবীতে বাস করছে। এ এক নতুন পৃথিবী। একদিকে হাস্য-লাস্যময়ী সুন্দরী গণিকা দোরা'র কণ্ঠসংলগ্ন হয়ে আছেন শ্বেতশ্মশ্রু, শ্বেতকেশী, শ্বেত বসনা, রক্তচক্ষু ইরানের সর্বপ্রধান ধার্মিক অর্থাৎ ধর্মাধ্যক্ষ, আর তারই কিছু দূরে.........

অন্যদিকে অত্যাচারিত ক্ষুধায় কাতর শক্তিহীন একটা জীবন্ত মানুষকে কুকুরে টেনে টেনে ছিড়ে খাচ্ছে। কুকুরটিকে বাধা দেবার শক্তিটুকুও তার নেই। ধর্ম আজ কোথায় ? ধর্মাত্মাদের অস্তিত্ব আজ কতটুকু ? যেদিকেই তাকানো যায়। শুধু অন্যায়, অত্যাচার, পাপ আর মৃত্যু।

তৃতীয় অধ্যায়

। সঙ্কল্প ।

অন্তঃপুরের একটি সুসজ্জিত কক্ষে কবাত বিষণ্নমনে বসেছিলেন। এই ঘরটি আস্থানশালা বা অন্তঃপুর শালার চেয়ে আকারে অনেক ছোট, কিন্তু সুসজ্জিত ঘর। সমস্ত ঘরটি চন্দন, কস্তুরী, গোলাপ কমল ও যুঁইএর সুগন্ধে ভরপুর। একদিকে একটি হস্তীদন্তের পায়াসম্বলিত সূবর্ণ পর্য্যক। তার উপর দুগ্ধ ফেন সদৃশ হংস-তুল গর্ভিত কোমল শয্যা। শয্যার চারিদিকে মুক্তার ঝালর। অন্যান্য সাজ সজ্জার কথা পুনরুক্তি মাত্র। ভোগ-বিলাশ, কলা-সৌন্দর্য্যে গুপ্ত রাজবংশের সঙ্গেই সাসানী বংশের তুলনা করা যায় বিনা দ্বিধায়। এত বিলাশ ব্যশনের মাঝে কবাত মুখে হাত দিয়ে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছেন। তার পাশে মহারানী (বম্বিশ্নান বম্বিশ্ন) সম্বিক বসে স্বামীর মনোভাব লক্ষ্য করছেন। মহারানী সম্বিকের রূপের তুলনা মেলেনা সমস্ত রাজ্যে। ক্ষীণ কটি, উন্নত বক্ষ, শঙ্খ-সদৃশ গ্রীবা, লতায়িত তনু, চাঁপার কলি অঙ্গুলি, হিমশ্বেত শরীর বর্ণ, আরক্ত কপোল, বাদাম সদৃশ লোচন, সুবর্ণরেখা সমান ভ্রূলতা, দীর্ঘপক্ষ নেত্র, দুগ্ধশ্বেত পংক্তিময় দন্তরাজি, কৃষ্ণাভরক্ত কেশগুচ্ছের দীর্ঘ বেণীর মধ্যে বহুমূল্য রত্নজটিত। বেণী দুটি যেন সাপের মত বক্ষের দুই দিকে দ্বিধা বিভক্ত। এই রূপ দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই রূপ সৃষ্টি করবার পর প্রকৃতির ভাণ্ডারে বোধ হয় আর কোনও কৌশল অবশিষ্ট নেই। কিন্তু এই অতুলনীয় রূপরাশিও কবাতের উদাসীনতা ভঙ্গ করতে আজ অসমর্থ হয়েছে। তাই সম্বিকের মুখেও আজ চিন্তার ছায়া। স্বামীর চিন্তায় পত্নীও প্রভাবিত। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে এবার মৌনতা ভঙ্গ করে

সম্বিক বললেন'—খ্বতা (খুদা) ! স্বামীকে নিরুত্তর থাকতে দেখে সম্বিক আবার ডাকলেন।—খ্বতা পাতেখশাহ, ক-অপায়েত ? (খোদা বাদশাহ ! কি হয়েছে ?) কিন্তু এবারেও কবাত নিরুত্তর। এবার সম্বিক আরও একটু কাছে গিয়ে কম্পিত স্বরে ডাকলেন—ব্রাত ! (ভাই) আমি তোমার সহোদরা ভগ্নী এবং সুখ দুঃখের সহধর্মিণী। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন ? আমি জানি হয়ত গত রাত্রের দৃশ্য তোমার মনকে বিচলিত করেছে, তাই তোমার মনোকষ্টের কিছুটা ভাগ নিতে এসেছি। এই কথায় কবাত চমকে ওঠেন।

—এ কথা তুমি কি করে জানলে ? রানীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেন কবাত।

—আমি জানি। শুধু জানি বললে মিথ্যা বলা হবে প্রথম থেকেই সব জানি এই রাজ্যের প্রজাদের কি দুর্দিন চলছে।

—তাহলে এতদিন আমাকে বলোনি কেন ?

'—বললে কোনও লাভ হতনা। কারণ, বলবার মত উপযুক্ত সময় তখন হয়নি। রাজকুল সর্বদাই অন্ধ হয়ে থাকে। এখানে শোনবার জন্য কান আর বলবার জন্য মুখ থাকে মাত্র।

—তুমিও ত সেই রাজকুলেই জন্মগ্রহণ করেছো। আমরা দুজন একই সঙ্গে লালিত-পালিত হয়েছি ! তবুও আমার কাছে এতবড় একটা ঘটনা প্রকাশ করতে তোমার সঙ্কোচ হল ? আগে যদি জানাতে, তাহলে হয়ত সময় থাকতে কতকগুলি প্রাণকে বাঁচাতে সহায়তা করতে পারতাম। এখন দেখছ, কাল রাত থেকে আমার মন কতখানি চিন্তিত হয়ে পড়েছে ?

—দেখেছি স্বামী, আর তার প্রতিকারের উপায়ও চিন্তা করছি।

—উপায় ? ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন কবাত ! আমার মনের চিন্তাকে, হৃদয়ের আঘাতকে ভোলাবার উপায় ? না সম্বিক ! উপায় ততখানি সহজ নয়, যতখানি তুমি ভাবছ। তুমি হয়ত

অনুমান করতে পারবে, আজ এই নবনীত সমান শয্যা, এই পরিমল যেন ধিক্কার দিচ্ছে। ফুটন্ত পাত্রের দু-একটি চাল পরীক্ষা করে সমস্ত পাত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার মত গত রাত্রে কয়েক ঘর প্রজার দুরবস্থা দেখে এলাম স্বচক্ষে। তাদের দেখে অনুমান করে এলাম লক্ষ লক্ষ মাতার কোল শুন্য হয়েছে, লক্ষ লক্ষ পত্নী পতিহীনা হয়েছে, কত যে শিশু তাদের পিতা মাতা হারিয়ে অনাথ হয়েছে আর কত যে মরেছে কাঁদতে কাঁদতে অসহায় ভাবে, তার হিসাব নেই। কিন্তু কেন? কেননা শুধু প্রাণটাকে রক্ষা করবার মত একমুঠো অন্ন তারা পায়নি। একবার চিন্তা করে দেখ সম্বিক! কতখানি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে এক একটা মানুষ মরতে বাধ্য হয়েছে।

—তাই দেখছি আজ অন্ন কত মূল্যবান আর প্রাণ কত সুলভ।

—সম্বিক আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান? মনে হচ্ছে এই সকল হত্যার জন্য আমিই দায়ী।

—সকল হত্যার জন্য একা দায়ী নও স্বামী! এই হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রায় এক সহস্র হত্যাকারী দায়ী। তার মধ্যে নিঃসন্দেহে তুমি একজন। এখন একবার চিন্তা করে দেখ, যাদের ঘরে একবার শাহনশাহের পদধূলি পড়লে তাদের সারাজীবনের কর মাফ হয়ে যায়। তাদের বংশাবলি উঁচু হয়ে যায়। রাজ্যের লেখক তাদের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে চিরস্মরণীয় করে রাখেন। রাজ্যের তরফ থেকে তাদের বাড়ীতে তিনশত ঘোড়সওয়ার সৈনিক আর তিনশত পেয়াদা বহাল করে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তাদের সম্মান রক্ষার জন্য রাজ্য উৎসুক হয়ে থাকে। যার ঘরে একবার শাহনশাহ প্রবেশ করেন, চিরতরে তাদের সকল প্রকার অপরাধ মার্জ্জনা করা হয়। এমন কি তাদের গ্রেপ্তার করবারও নিয়ম নেই রাজ্যে। বৎসরের দুটি মহাপর্বে, নববর্ষ ও মেহেরগান উৎসবের সময় ঐ সকল পরিবারের দেওয়া উপঢৌকন সবচেয়ে আগে রাজপ্রাসাদে পৌঁছুবার সুযোগ পায়। সিংহাসনের ডানদিকেই তাদের বসবার আসন

—সে ত আমি কাল রাত্রে স্বচক্ষে দেখে এলাম। মৃত্যুর পূর্ব্ব-মূহুর্ত্তেও মানুষগুলি তার বাক্য পালন করতে পেরে নিজেদের কৃত কৃত্য মনে করে। যদিও রাজবংশে জন্মাননি, তবুও প্রধান ধর্ম্মগুরুর মত ঐশ্বর্যশালী বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি স্বয়ং সেই পদের অধিকারী। কিন্তু দেখে এলাম অতবড় হলেও দেশের গরীব শিল্পকার, মজুর, নিরীহ দাস-দাসীরা তার কত আপনার জন।

আমি যখন প্রথমে ছদ্মবেশ ধারণ করতে যাচ্ছিলাম, তখন ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। যদিও আমি শাহীদের শাহ। সম্রাট! তবুও সেই তুচ্ছ প্রাণটা রক্ষা করতে কাল যে কী ভয় পেয়েছিলাম তা বর্ণনা করা কঠিন। তম্পোনের গলিপথ দিয়ে, পন্থবীথির মধ্য দিয়ে কাল যখন আসছিলাম, তখন সর্ব্বদাই আমার ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কোন গুপ্তস্থান থেকে আমাকে লক্ষ্য করে তীর বা বর্শা এসে পড়ল!

কিন্তু কী আশ্চর্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে আজ যারা আমার কাছে কাছে রয়েছে আমার এ প্রাণটা আমি তাদের অম্লানবদনে দান করতে পারব। তখন মনে মনে একপ্রকার আনন্দ অনুভব করছিলাম, কিন্তু তারও কিছুক্ষণ পরের দৃশ্যাবলি দেখে আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হতে লাগল আমি ভয়ানক অপরাধী। আমারই এ কৃতকর্ম। এ পাপ থেকে বুঝি রেহাই নেই। আমি নিজেই আমার সামন্ত এবং সরদারগনকে অদণ্ডনীয় করেছি, তাই তারা নির্ভয়ে মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা করছে। গুরুদেবের কথা এখনও আমার কানে বাজছে। কেমন করে সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করি।

আজ পর্যন্ত আমার আজ্ঞা শিরোধার্য বলে মান্য করা হত, কেউ আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করবার কথা কল্পনাও করতে পারে না বলেই জানতাম। কিন্তু আজ আমার সে বিশ্বাস ভেঙ্গেছে। আজ আমি দেখছি আমার অধিকারীরা আমার আজ্ঞাকারী নয়। সব ভ্রম, সব

ভুল। এখন দেখছি আমার যে আজ্ঞা তারা পালন করেছে, তা তাদের স্বার্থের বিরোধী নয় বলেই সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া তাদের স্বার্থের অনুকূলে সেই আজ্ঞাদান করতেও তারা আমাকে প্রকারান্তরে বাধ্য করেছে। কখনও সরাসরি ছোট লোকদের আদেশ করে দেখিনি। আমি নিজেই যাদের মাথায় তুলেছি আজ এই বিরাট হত্যালীলার অভিনেতা তারাই। অথচ আজ যদি তাদের বলি ঐ মরণোন্মুখ প্রজাদের প্রাণরক্ষার জন্য তোমাদের অকারণ সঞ্চিত খাদ্যের গোলা খুলে দাও, তাহলে তারা আমার আজ্ঞা পালন করবে না।

—ওগুলো ত ওদের নিজের গোলা, তুমি যদি এখন সরকারী গোলা থেকে অন্নদান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করো, তাহলেও তোমার সে ইচ্ছার বিরোধিতা করবে ওরা।

—আমারও তাই মনে হয়। ওদের ধনাগারে যে দীনারগুলি ওরা সঞ্চয় করেছে, তার এক একটি দীনার এক একজন মানুষের জীবনের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছে। কিন্তু সব মানুষই যদি মরে যায়, তাহলে ধনরত্ন দিয়ে ওরা করবে কি ? কৃষক, কর্মকার, শিল্পি মজুর প্রভৃতি যারা দেশের প্রাণ, আজ তাদের অর্দ্ধেক মারা গেছে বাকী অর্দ্ধেক মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে।

—তাহলেই বুঝে দেখ, যে পরিমানে চাষী মজুর মরেছে তাতে এ বৎসর অনেক জমি চাষ হবে না এবং পর বৎসর সেই ফসলগুলির ঘাটতি হওয়ার অন্য অর্থ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ, এবং সে বিপদ থেকে ঐ সকল ধনী মানীরাও রেহাই পাবে না। তাছাড়া শুধু অন্ন নয়, ঐ সকল শিল্পিদের হাত দিয়ে অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রী, আভূষণ, পরিধান, আমোদ প্রমোদের সামগ্রী এবং সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত হত সেগুলিও আর হওয়ার আশা রইল না।

—অথচ এর আগেও ঐ সকল মানুষগুলিকে এই ধরণের ভুল না করবার জন্য মহাপুরুষরা কতই না চেষ্টা করেছেন। তাঁরা

চেয়েছিলেন, প্রত্যেক মানুষ সুবিবেচক হোক, সহৃদয় ও সহানুভূতি-শীল হোক অপরের প্রতি। নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে না দেখে, দেশের ও দশের বৃহত্তর স্বার্থকে বাঁচিয়ে তুলুক এবং জনকল্যাণ ধর্ম গ্রহণ করে পরিবর্ত্তিত মানব সমাজ গঠন করে চিরকাল সুখে শান্তিতে বাস করুক। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়েছে। আমার মনে হয় এখনও মানুষের মনের পরিবর্ত্তন করানো সম্ভব।

—হ্যাঁ সম্ভব হতে পারে কিন্তু তার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন। হয়ত পরিপূর্ণ সফলতা নাও হতে পারে। বহু পরিশ্রম করে সংযোগবশতঃ হয়ত একজন কবাত'এর দর্শন পাওয়া যেতে পারে যার হৃদয় পরিবর্ত্তন করানো সম্ভব, কিন্তু তার সন্তানদের মধ্যেও সেই পরিবর্ত্তন পাওয়া যাবে এমন ত কোনও ভরষা নেই। তাছাড়া একজন পিতা বা তার সন্তানদের মতের পরিবর্ত্তন হলেই ত সমগ্র দেশটার পরিবর্ত্তন করানো অসম্ভব।

—তবুও চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নিরাশ হয়ে বসে থাকার কোন অর্থ হয়না।

—সত্যিই সম্বিক, আজ তোমার সঙ্গে এই আলোচনা করতে পেরে আমি ক্রমাগত আশ্চর্য হচ্ছি। তোমার এত কাছে থেকেও কখনও এমনি ধরনের কথা তোমার কাছে আশা করিনি। পীরোজএর সন্তানের মুখ দিয়ে এ ধরনের কথা শোনা বিচিত্রও বটে।

—তা ত হবেই। কারণ পীরোজের সন্তানদের শুধু শেখানো হয়েছে যে এ পৃথিবীতে যত প্রাণী জন্ম নিয়েছে তারা সকলেই তাদের সুখ ও বিলাসের নিমিত্ত। তারা মানুষই হোক আর অন্য কিছু হোক। প্রথম প্রথম একজন দাসীর মুখে যখন গুরুদেবের কথা আমি শুনেছিলাম, তখন আমিও আশ্চর্য হয়েছিলাম। এই পৃথিবী সম্বন্ধে তুমিই বা কতটুকু জানবার অবসর পেয়েছ। কিদারী রাজধানীতে থাকা কালীন হুন-সম্রাট'এর আদরিণী রাণী আমার বোনের স্নেহের ছায়ায় বাইরের জগতের কোনও সংবাদই পাবার

সুযোগ পাওনি। আর এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে খুল্লতাত বলাশ তোমাকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ সম্বিক, আজ আমি একটু একটু করে অনুভব করতে পারছি, যে এই সিংহাসনই আমার চোখে পর্দা চাপা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সঙ্কট থেকে এখন উদ্ধার লাভ করা যায় কোন উপায়ে?

—সময় হয়েছে। মানবের মুক্তির পথ এখন খুলেছে। দেখলে না সেদিন সভাগৃহে অতগুলি সশস্ত্র সৈনিক এবং আত্মরক্ষার বেড়াজাল ভেদ করে কেমন অবলীলাক্রমে নগরের গরীব প্রজারা তোমার সামনে এসে উপস্থিত হল? মৃত্যুর চেয়ে বড় শাস্তি ত আর কিছু নেই। তাইতো লোকগুলি নির্ভয়ে সৈনিক-ব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ হল। এখনও ওদের শক্তির সাহায্যেই এই সঙ্কট দূর করা সম্ভব হবে! জনতা অগণিত, অমর। কয়েক শ বা কয়েক হাজার মরে গেলে তার বীজ নষ্ট হয় না। দীনার পুজনকারী সম্প্রদায় অবশ্য পরোক্ষভাবে তাদের সমূলে বিনাশ করবার চেষ্টাই করে থাকে, কিন্তু তারা জানে না যে তাদের সেই আত্মঘাতী চেষ্টা ক্রমশঃ তাদের নিজেদের মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কিন্তু তুমি তোমার সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ?

কবাতের চেহারায় গম্ভীরতা আগের মতই বিদ্যমান। কিন্তু নিরাশার ভাবটা অনেকাংশে কেটে গেছে। তাঁর চোখ মুখের ভাব দেখলে মনে হয় তিনি গত রাত্রের স্বচক্ষে দেখা দৃশ্যগুলির সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করছেন। বোধ হয় কোনও উপায় চিন্তা করছেন। তিনি ভাবছেন দেশের যত মজুত অন্নের ভাণ্ডারগুলি খুলে দিলে দেশের প্রাণ চাষী-মজুর, শিল্পী, কর্মকরদের রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এই কাজ একার পক্ষে করা অসম্ভব। এই কাজ করতে হয় প্রধান ধর্মগুরু নয়ত প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা চাই। তিনি এখন বেশ বুঝতে পারছেন যে এই বিষয়ে

কোনপ্রকার আজ্ঞা পাঠালে তার পরিণাম ভাল নাও হতে পারে।

এমনি আরও কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়। সম্বিক একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে উত্তরের প্রত্যাশায়। হঠাৎ চোখ খুলেই সম্বিকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে কবাত বললেন,—সম্বিক! আমি কাপুরুষ নই। সাসানী বংশ যদিও বিলাসী জীবন যাপন করে আসছে এবং তার রক্তে বিলাসটাই সবচেয়ে মুখ্য বস্তু, কিন্তু সেই সঙ্গে মৃত্যুকে ভয় করাও তারা ভীষণ অপমান মনে করে। আমি নিজের জন্য কোনও চিন্তা করি না। মরতে একদিন হবেই, আজ নয়ত বিশ বৎসর বাদে। আমি ভাবছিলাম নিজের মন্ত্রী ও সামন্তবর্গের বিরাগ ভাজন হওয়ার পরিণামটা কতদূর গিয়ে গড়াতে পারে। কিন্তু এখন আমি মনকে তৈরী করে নিয়েছি। আমার নিজের জীবন দিয়েও আমি আমার প্রজাদের দুঃখের ভার লাঘব করতে পারব কি না, ভাবছি।

—কেন নাথ! তুমি কি নিজেকে একলা মনে করছ, না এত বড় একটা কাজ একাই করবে মনে করছ? আমাদের গুরুদেবের কিন্তু বিচার ধারা অন্যরকম।

—কী তাঁর বিচার? তিনিই ত আমাকে এই চিন্তায় ফেলেছেন। সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়ে তিনিই আমার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়েছেন।

—গুরুদেব তোমার উপযোগিতা অস্বীকার করেননি তো। প্রতিটী মানুষের কাজ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে যথেষ্ট মহত্ত্ব রাখে। সকলে মিলেই কোনও কাজকে পূর্ণ করতে পারে। তুমি জেনে রাখো, এই কাজও বহুলোকের দ্বারা সফল হতে চলেছে, এবং তুমি একলা নও। গুরুদেবের সহস্র সহস্র শিষ্য তাঁর ইশারায় আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। তিনি তাদের এমন মন্ত্র শিখিয়েছেন এমন আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন যে তারা মৃত্যুর কথা চিন্তাও করে না।

—হ্যাঁ সম্বিক, আমি তার সম্যক পরিচয় পেয়েছি। কালই রাত্রে আমি সেই মহান স্থাপত্য শিল্পী তরুণকে দেখেছি, যে গুরুদেবের পাঠানো অন্ন অন্য লোককে দিয়ে নিজে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

—সেই জন্যেই ত বলছি তুমি এখন একলা নও। এই আগুনে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দেবার জন্য তোমার পাশে সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রস্তুত হয়ে আছে। তারাই সত্যিকারের রাস্তা তৈরী করবে। কিন্তু তোমাকে অন্য সম্প্রদায় সেই পথে বাধা দিতে বাধ্য করাবে।

—আমি কারও কথায় কান দেব না।

—বড় ভয়ঙ্কর পথ প্রিয়তম। পারবে তুমি সে পথকে আঁকড়ে ধরে থাকতে ?—

—আমি কি আর একলা অচল থাকব ? তার সঙ্গে আমার সম্বিক যে রয়েছে। আনন্দে কবাত সম্বিককে কাছে টেনে এনে চুম্বন করেন। সম্বিক আত্মগৌরবের আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠে—আমি শুধু তোমার আদর্শে একমত নই। তুমি যেখানেই থাকবে আমাকে সদা সর্ব্বদা তোমার পাশেই পাবে।

—তবে আর মৃত্যুরও ভয় করি না। এই দেখনা, ঐ তুই মন ওজনের মুকুটের নিচেয় বসে থাকাটাও ত মৃত্যুর নিচেয় বসে থাকার সামিল। মুকুটটার ওজন হিসেবে যে শিকলটাতে টাঙ্গানো রয়েছে সেটা কত হালকা। যে কোনও মূহুর্ত্তে মুকুটটা ছিঁড়ে আমার মাথায় পড়তে পারে। তা ছাড়া কারাগারকেও আর ভয় নেই। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবধি জনসাধারণের হিতের জন্য আমার সর্ব্বশক্তি দান করব এবং আমার এ প্রতিজ্ঞা অচল অটল।

—আর তোমার সম্বিক তার প্রাণ দিয়েও তোমার সঙ্কল্পকে সার্থক করতে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করবে। তুজনের মুখে হাসি ঝিলিক দিয়ে যায়। আবার ওরা আনন্দে পরস্পরকে আলিঙ্গনপাশে বাঁধে।

চতুর্থ অধ্যায়

। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ ।

তারপর কয়েকটা দিন কেটে গেছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু ঘটেনি। মানুষের সঙ্গে মৃত্যুর লড়াইয়ের সেই একই বিভিষীকা।

কিন্তু আজ তম্পোন নগরী যেন নতুন প্রাণের স্পন্দনে মুখরিত। শুধু নগরীতে নয়, সকল গরীব প্রজাদের বস্তী, মাহোজা ও দর্জনীতান থেকেও মৃত্যুর ছায়া যেন কোনও এক যাদুমন্ত্রে সরে গেছে। তার বদলে এক নবীন চেতনা লাভ করেছে অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলি মাসের পর মাস অনাহারে অনিদ্রায় থেকে যদিও তাদের ক্ষীণ দেহ ও শুষ্ক মুখ এখনও স্পষ্ট হয়েই আছে, কিন্তু চোখ তাদের নতুন দীপ্তিতে দীপ্ত। সকলের মুখেই তাদের গুরুদেব মজদ্‌ক ও বামদাত পুত্রের নাম আজ বিশেষ আলোচ্য বিষয়। তিগ্রা নদীর পুলের উপর ওপার দিয়ে সারিবদ্ধ মানুষ আসছে এপারে। ওদিকের মানুষগুলির হাতে শুন্য ঝোলা, ঝুড়ি প্রভৃতি দেখা যায়, আর এদিক থেকে যারা চলেছে তারা বোঝাই করে নিয়ে চলেছে ওপারে।

রাজকীয় অন্নাগারের সামনে আজ ভীষণ ভিড়। অন্নাগারের সামনের বিরাট মাঠের মধ্যে তিল ধারণের জায়গা নেই, কিন্তু শান্ত অনুত্তেজিত জনতা। শান্তি স্থাপনের জন্য আজ অস্ত্রধারী ভট নেই আশে পাশে কোথাও। অবশ্য জনতাকে সুপরিচালিত করবার জন্য রক্তবস্ত্রধারী একদল মানুষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

একজন রক্তবস্ত্রধারী উঁচু জায়গাটার উপর দাড়িয়ে হাত তুলে জনতার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলছে,—ভাইসব! তোমরা

বিচলিত হয়ো না, তোমরা সকলেই খাদ্যদ্রব্য পাবে। সরকারী খাদ্য ভাণ্ডারে এখনও সমস্ত তম্পোনকে কয়েক মাস খাওয়াবার মত অন্ন মজুত আছে, অবশ্য এ সকলই আমাদের গুরু মজ্‌দর্ক এর কৃপা। তিনিই শাহকে সুবুদ্ধি দিতে সমর্থ হয়েছেন। ।

জনতার মধ্য থেকে একজন চীৎকার করে বললো, "বিস্পোহ্নদের প্রাসাদে এখনও বহু অন্নভর্ত্তি গুদাম রয়েছে, সেইগুলি কেন জোর করে খোলা হচ্ছে না। ওরা মানুষের প্রাণের বিনিময়ে ঐ অন্ন মজুদ করেছে।"

—হ্যাঁ ভাই, তোমার কথা ঠিক। এখন আর কেউই তার নিজের খুশীমত চলতে পারবে না। সেগুলি অবশ্যই খোলা হবে। একে একে তম্পোনের সকল অন্নাগার খোলা হবে। নাগরিক এবং অন্নের মধ্যে আজ আর কেউই বাধক হতে পারবে না। কিন্তু জনসাধারণের মনে রাখতে হবে, তারা যেন এমন ব্যবহার না করেন যাতে আবার আমরা মৃত্যুর সম্মুখীন হই। এটা লুঠ নয়। এ আমাদের নিজেদের ঘরের অন্ন। এর ব্যয় মাত্রাও অতি সাবধানে করতে হবে আমাদের। নতুন ফসল ঘরে আসতে এখনও ছয়মাস বাকী, অতএব এখনও আপনাদের এই অন্নের উপর ছ-মাস নির্ভর করে থাকতে হবে। আমাদের প্রিয় গুরুদেবের উপদেশ হল, কেউই যেন এক সপ্তাহের বেশী অন্ন ঘরে নিয়ে না যায়, এবং কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষার মত অন্নের সদ্ব্যবহার যেন করা হয়। এখন থেকে যদি লোভ সংবরণ করে উচিত মত এই খাদ্যের ব্যবহার না করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে অন্নাভাবে আবার মৃত্যুর জন্য আমাদের দায়ি হতে হবে।

গত কয়েক মাস যাবত লোক অন্নাভাবে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এমন একজন কেউ ছিলনা যে তাদের কোন আশা ভরষা দেবে। শুধু এই রক্তবসনধারী মানুষগুলি তাদের ক্ষমতাতিরিক্ত

সেবা করে এসেছে। শত শত মানুষ নিজের খাদ্য অপরকে দান করে নিজে সেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছে।

অবশ্য বহুদিন থেকে এই রক্তবসনধারী মানুষগুলির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা হয়ে আসছে "এরা ধর্ম্মের শত্রু। এরা নিজেরা যেমন পশু, অন্যকেও এরা পশু তৈরী করতে চায়। এরা স্ত্রীদের বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাতে চায় এবং অপরের ধন লুঠ করাকেই ধর্ম্ম বলে প্রচার করে। রাজ্যের যত চোর, ডাকাত, বদমায়েশ গুণ্ডা গুলি একসঙ্গে মিলে এই সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছে এবং জনসাধারণ যদি এদের ছায়া থেকে দূরে না থাকে তাহলে একদিন সম্পুর্ণ দেশটাকে এরা ছারখার করে ছাড়বে"। কয়েক পুরুষ থেকে এরা রক্তবসনধারী দের সম্বন্ধে এমনি নানাপ্রকার কুৎসা শুনে আসছে।

যদিও শুধু অপরের মুখে এরা রক্তবসনধারীদের সম্বন্ধে এই সকল কথা শুনে আসছে। এদের মধ্যে এমন বহু লোক আছে যারা স্বচক্ষে কখনও এদের দেখেনি। বয়োজ্যেষ্ঠ বা ধর্ম্মযাজকদের কাছে যা শুনেছে তাই অকপটে বিশ্বাস করে এসেছে। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের সময়ে জনসাধারণ রক্তবসনধারীদের যখন স্বচক্ষে দেখল, তখন তাদের অন্য রূপ দেখে আশ্চর্য হল। এরা দেবতার রূপ নিয়ে বিপদের সময়ে প্রকট হয়েছে। এরা কখনও কল্পনাও করেনি যে একজন মানুষ নিজের খাবার অপরকে দান করতে পারে। শীতের সময় এরা দেখেছে নিজেদের শরীরের শীতবস্ত্র খুলে গরীবদের গায়ে দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। কিন্তু নিজে প্রচণ্ড শীতে মৃত্যুবরণ করেছে। এরা দেখেছে সে রক্তবসনধারীদের মধ্যে অপরের জন্য প্রাণদান করতে নিজেদের মধ্যে কাড়কাড়ি পড়ে গেছে। গরীব ও দুঃখীদের সহায়তা করতে তারা জাতি ধর্ম মানে না। কেনই বা এরকম হবে না। তাদের প্রথম গুরু মানী উপদেশ দিয়ে গেছেন যে অহুর্মজ্‌দ (ভগবান) এবং অহ্নিমান (শয়তান) এর মধ্যে বহু শতাব্দী ধরে চলে আসা যুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। শয়তানের

পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ভগবানের রাজত্ব আবার পৃথিবীতে শুরু হবে অচিরাত। আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হল একে অপরকে সাহায্য করা। সকলে সকলকে একই পরিবারের মত ভাবা।

বিগত তুই শতাব্দী যাবত জনসাধারণ মানীর ধর্ম্ম কি তা যতটা উপলব্ধি করতে না পেরেছে, গত কয়েক মাসের মধ্যে তারা তা বুঝতে পেরেছে। রক্তবসনধারী মানুষগুলি শুধু তাদের বচনে নয়, তাদের আচরনে, ভবিষ্যতের প্রলোভনে নয়, তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে মানবতা কী। তারা সত্যি সত্যি মানবতার স্তরকে সবচেয়ে উঁচুতে স্থান দিয়েছে। আজ সাধারণ জনতার মনের মধ্যে তারা নিজেদের বেশ মজবুত করে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। তার সবচেয়ে বড় কারণ হল, তারা নিজেদের প্রাণ মান বিসর্জন দিয়ে ঐ খুনে ডাকাতগুলির কাছ থেকে অন্ন কেড়ে এনে তাদের সকলের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছে।

প্রথমে তারা যখন শাহী (সরকারী) অন্নাগার খুলে অন্ন বার করতে চেষ্টা করছিল তখন অবশ্য কিছু সংখ্যক রাজকীয় কর্মচারী বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু সৈন্যদল তাদের সহায়তা না করাতে তারা বিফল হয়ে ফিরে গেছে। যে শক্তিশালী সৈন্যদল রোমক সেনাদের সঙ্গে নির্ভয়ে যুদ্ধ করতে প্রাণের বাজী লাগায়, যারা শ্বেত হুনদের বহুবার অনায়াসে পরাজিত করেছে, আজ তারা নিজের দেশের ক্ষুধিত, নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর তাদের অস্ত্র প্রয়োগ করতে অস্বীকার করল। বিগত ছয়মাস যাবত তারা নিজের চোখে দেখেছে কেমন করে তাদের সর্দাররা সরদারী করেছে। সতীত্বের কোনও মূল্যই নেই। নামমাত্র মূল্যে পিতা তার আদরিনী কন্যাকে অন্যের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। একটা জীবনের বিনিময়ে একদিনের ক্ষুধা শান্ত করবার মত অন্নও মেলে না। মাত্র একদিনের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সারাজীবন অন্যের কাছে দাসত্ব

স্বীকার করেছে, এমন সংখ্যা অগুনতি। আজ সাসানী রাজধানীতে সরদার এবং দাস বর্গের পার্থক্য প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বিস্পোহ্র ও ধনী সম্প্রদায় কখনও কল্পনাও করেনি, শতাব্দী ধরে যে দাস তাদের সেবা করে এসেছে আজ তাদের কাছে মাথা নিচু করতে হবে। যে ধনুক, অস্ত্রাদি এতদিন তাদের রক্ষা করে এসেছে, আজ তারাও তাদের হুকুম মানতে অস্বীকার করে।

একদিক থেকে অবশ্য ভালই হল। খোলাখুলি ভাবে তাদের বিরোধ করবার রাস্তা রইলনা।

তাই বলে তারা একেবারে নিরাশ হয়নি। শাহানশাহের প্রাসাদের একটি ঘরে বসে সকলে আবেদন জানায় শাহ কবাতের কাছে। উচ্চ অধিকারীরা বিনীত ভাবে নিবেদন করছেন তাদের কথা। চোখে মুখে তাদের ভয়ের চিহ্ন, চঞ্চল মন। মনে মনে সকলেই ক্রোধিত, অথচ শান্ত সংযতভাবে কথা বলছে। তাছাড়াও এই সময় প্রায় সকলেই দরবারের অনেক নিয়ম লঙ্ঘন করছে দেখেও কবাত অথবা তাঁর পার্শ্বচর কিছু বলছেন না। মহাধর্ম্মযাজক গভীর স্বরে বললেন,—ঐ পাপী মজ্‌দক ধর্মের শত্রু, শয়তানের অনুচর। মানুষের অন্ন লুঠ করেছে। নগরের সকল ভালমানুষেরা ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছে, এর বিহীত হওয়া প্রয়োজন। যা কখনও হয়নি। কবাত বললেন,—কিন্তু এমনও ত কখনও হয়নি যে গোলায় প্রচুর খাদ্য মজুত থাকতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে।

—কিন্তু ক্ষুধা থেকে বাঁচাতে, চোর বদমায়েশদের পুষতে, নীচ দাসদের উসকে দিতে, ধনীর ধন লুণ্ঠন করতেও কখনও শুনিনি। লোক বলছে আমাদের বগান বগ (দেবাদিদেব) কোথায়? তিনি এখনও কেন ন্যায় করছেন না। কথা শেষ না হতে অন্য একজন বললেন,—ন্যায়ের কথা না হয় পরেই হবে, ঐ লাল কাপড় পরা শয়তানগুলো বলে কি জানো? বলছে তারা শাহনশাহের অনুমতি

নিয়ে অন্ন লুঠ করছে . প্রধান ধর্মযাজক বললেন,—হ্যাঁ, শুধু সেই জন্যেই আমরা আমাদের দয়ালু ভগবানের কাছে এসেছি, তিনি যেন ঐ বিধর্মীদের হাত থেকে দেশকে, রাজধানীকে রক্ষা করেন। নতুবা আমাদের ন্যায়ধর্ম, পবিত্র ধর্ম লোপ পাবে।

কবাত এবার কিছুটা অসহিষ্ণুতার ভাব প্রকাশ করে বললেন,—পবিত্র ধর্মের জন্য আপনার চিন্তার প্রয়োজন নেই। পবিত্র ধর্ম ত দোরা গণিকার প্রাসাদে বন্দী রয়েছে। তার স্নুবর্ণ চষকে, আর রক্তবর্ণ অধরে আপনার দীন ধর্ম (পবিত্র ধর্ম) থাকার অনেক স্থান আছে। যত ধর্ম সেইখানে, আর সব জায়গা অধর্ম এবং মৃত্যুর জন্য, তাই নয় ? কবাতের কথায় প্রধান পুরোহিতের সামনে যেন বজ্রপাত হয়। ভয়ে তাঁর গলা শুকিয়ে যায় বুক কাঁপতে থাকে। তাঁকে সহায়তা করতে প্রধান মন্ত্রী বললেন,—ন্যায় অবশ্য হওয়া দরকার। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, আগে তার ব্যবস্থা করুন, নইলে রাজ্য রসাতলে যাবে।

—হুঁ ! আজ ন্যায় এবং রাজ্য রক্ষার জন্য আপনাদের চিন্তার অবধি নেই, কিন্তু এই যে কয়েকমাস যাবত রাস্তাঘাট শ্মশানে পরিণত হয়ে রয়েছে। এক মুঠো অন্নের জন্য রাজ্যের এক চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুবরণ করেছে, এতদিন ত সেদিকে আপনাদের কোনও খেয়ালই ছিল না।

মহাসেনাপতি এবার অধৈর্য হয়ে বললেন,—তাহলে কি আমরা জানব যে রক্তবসনধারী মানুষগুলি যা বলছে, তা সত্য ? স্বয়ং আপনিই আদের লুঠ করবার আদেশ দিয়েছেন ?

—আদেশ দেওয়া না দেওয়া, ন্যায় অন্যায় বিচার পরের কথা। তবে পীরোজপুত্র কবাত চায়না যে, যথেষ্ট অন্ন মজুদ থাকা সত্বেও আমার প্রজারা অনাহারে মৃত্যুবরণ করুক। আজ আর তাদের চোখে ধুলো দেওয়া যাবেনা। সবচেয়ে প্রথম কথা হল তাদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো। পরে ন্যায় অন্যায় বিচার করবার অনেক

সময় পাবেন। মহাপুরোহিত যদিও প্রকৃতিস্থ হতে পারেননি তবুও বললেন,—পৃথিবীতে অকাল সুকাল চিরকালই হয়ে আসছে। তাই বলে এমন কথা কখনও শুনিনি যে, ধনীদের অন্ন লুঠ করে কতকগুলি চোর ডাকাত পোষণ করা হয়েছে।

—না তারা লুঠ করেনি। তারা লুণ্ঠনকারী নয়। যারা নিজেদের জীবন দিয়েও এই বিরাট বিরাট মহাপ্রাসাদ তৈরী করেছে, এই রেশম ও কামখারের মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত করেছে? আপনারা অধৈর্য্য হবেন না! এটা অসাধারণ কাল, এখানে সাধারণ ন্যায় চলতে পারেনা। আমার অনুরোধ, রাজ্যের প্রজাগুলিকে আপনারা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান, তারপর ন্যায় বিচার করে তাদের দণ্ড দিন, যা খুশী করুন।

কথার শেষে একজন সামন্ত বললেন,—প্রভু, যদি মৃত্যুর কথা তুললেন তাহলে বলি, এমনি করে আমরা ও আমাদের পরিবার বর্গ যে মৃত্যুর:দিকে এগিয়ে চলেছি, তার কি হবে? আমাদের গোলা তরতর করে শুন্য হয়ে যাচ্ছে। রাজধানীর সকল অন্নভাণ্ডার গুলি ভেঙ্গে ঐ শয়তানগুলো নিজেদের ঘরে নিয়ে মজুদ করছে। এবার মৃত্যুদূত ওদের ঘর ছেড়ে আমাদের ঘরের দিকে আসছে। তাদের গলি ছেড়ে এবার আমাদের প্রাসাদগুলি শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। যদি সত্যিই ন্যায় চান, তাহলে আমাদের সন্তান, পরিবার বর্গকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। সামন্তের কথায় দীনতার গন্ধ। কবাত তাকে বুঝিয়ে বললেন,—আমি চাইনা কেউ অনাহারে মরুক। আমার কথা হল, এই ভীষণ দুর্দিনে সকলে মিলে একটু একটু করে কষ্ট সহ্য করুক। ভাগাভাগি করে অন্নগ্রহণ করুন। যাতে সকলেই বেঁচে থাকতে পারে। আপনারা শুধু একদিকেই দেখছেন কেন। ঐ স্বতন্ত্র নাগরিক অথবা দাসবর্গ; এদের কি বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। বলতে পারেন, এদের ছাড়া আমাদের রাজধানী এবং এই প্রাসাদ সমূহ আবাদ থাকা সম্ভব?

মজদক পন্থীদের আপনারা মিথ্যাই শয়তান বলে অভিহিত করছেন।

এমন সময় কয়েকজন উচ্চাধিকারী একসঙ্গে বলে উঠলেন,—বগান বগ! (ভগবান) মজদকদের জিহ্বা সাপের জিহ্বা। ওরা ভারী জাদু জানে। ওরা লোকের মনকে বশীভূত করতে পারে। আজ আপনার উপরেও ওরা প্রভাব বিস্তার করেছে। ওরা সম্মার্গ ভ্রষ্ট করতে চায়, ওরা দাস কামিনদের মাথার উপর তুলতে চায়।

—বুঝলাম, কিন্তু আপনারাই বা কেমন করে ভাবতে পারছেন সে বামদাত পুত্র আপনাদের শত্রু? তিনি মহাধর্মযাজকের বংশধর। তাঁর শিরায় শিরায় সেই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, যে রক্ত আপনাদের শিরায় বইছে। আমি বিশ্বাস করি, তিনি যা কিছু করছেন তা প্রজা ও রাজার মঙ্গলের জন্যই করছেন।

এক কোন থেকে একজন ভদ্রবেশী তরুণ বললো,—রক্তবসন-ধারীরা অন্ন লুঠ করেছে, একথা সত্যি নয় ভগবান্। আমি নিজের চোখে সারা সহর ঘুরে দেখে আসছি। অতিশয় সুবন্দোবস্তের সহিত অন্ন বণ্টন করা হচ্ছে। তারা প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে ডেকে এক সপ্তাহের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ভাগ করে দিয়ে আসছে, তাও ওজন করে মাত্র আধ-পেট হিসেব করে।

—বেশী নেবার জন্য কেউ উপদ্রব করছে না? জিজ্ঞাসা করেন কবাত।

—না। এমন শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলার সঙ্গে এত বড় একটা কাজ হতে আমার জীবনে আমি কখনও দেখিনি। প্রথম কিছুক্ষণ লোক-গুলি একটু উতলা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু তার পর এখন সম্পূর্ণ শান্ত তারা। এখন তাদের বিশ্বাস হয়েছে, রাজধানীতে যে অন্ন মজুদ আছে, তা তাদের পক্ষে দুর্লভ নয়। যদিও সে খাদ্যের পরিমাণ খুবই সামান্য।

—হুঁ! আর সতীত্ব ও ধন-ঐশ্বর্য্য লুঠ, কুলাঙ্গানাদের বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করা প্রভৃতি অভিযোগ গুলি?

—মিথ্যা। তবে ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে।

—অভিযোগ ত দূরের কথা, জনতার মধ্যে একমাত্র অন্নের চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তাই নেই। তার প্রমাণ আজ রাজ্যসৈনিক শান্তি রক্ষার প্রয়োজন বোধ না করায় তারা দাড়িয়ে দেখছে এবং আনন্দ অনুভব করছে। কেউ কেউ তাদের সাহায্য করছে। তাছাড়া সবচেয়ে আশ্চর্য হল, কেমন করে ঐ অসংস্কৃত লোকদের মধ্যে এতদিনকার পারস্পরিক দ্বন্দ্বভাব দূর হয়ে গেল। আজ তারা কোন প্রকার রাজদণ্ডের ভয়ে ভীত না হয়ে অকপটে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব দেখাচ্ছে আলাপ আলোচনা করেছে মহানন্দে।

এতক্ষণ প্রধান ধর্মগুরু তরুণ যুবকের কথা শুনছিলেন। তিনি আর চুপ করে থাকতে পারেন না। অতএব যুবকের কথার মধ্যে তিনি বললেন,—এ সব শয়তানের জাল। এই জালে আটকে তারা সকলকে নরকের পথে টানছে।

—হুঁ! তাহলে শান্তিপূর্ণভাবে কায়-মনো-বাক্যে সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব পোষণ করা হল অকামেন্নুর (শয়তান) কাজ, তাহলে অহুর্মজ্‌দ (ভগবান) এর কাজটা কেমন শুনি।

—শাহনশাহ! শয়তানও কখনও কখনও সুকর্ম করে থাকে। তার কারণ অজ্ঞান যারা, তারা সেই মায়ায় আবদ্ধ হয়ে তাদের উপর বিশ্বাস করে, আর সেই সুযোগে শয়তান ঐ অজ্ঞান মানুষ-গুলিকে ইচ্ছামত পরিচালনা করে নরকের দিকে নিয়ে যায়। বামদাত পুত্র এখন শাহনশাহী শক্তিকে কুণ্ঠিত করেছে শুধু, এখন যদি আমরা সাবধান না হই, তাহলে এই অর্দশীর বাবকান এর সিংহাসন ঐ পাপীরা অধিকার করে বসবে। আমরা আপনাকে শুধু এইটুকু জানাতে চাই যে, মজদকের মুখ এখন যতটা মধুর মনে হচ্ছে। আসলে তার চেয়ে অনেকগুণে কঠিন তাদের হৃদয়।

মহামন্ত্রী রাজপুরোহিতের কথা সমর্থন করে বললেন,—বামদাত পুত্র ভয়ঙ্কর জাল বিস্তার করেছে। আজ সাসানী বংশের উপর এবং (মজদ্‌যসণী) পারসী ধর্মের উপর ভীষণ বিপদের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

—না, মহামন্ত্রী ! কোথাও কোনও সঙ্কট আসেনি এবং আসার সম্ভাবনাও নেই। সঙ্কট যদি বলতে হয় তাহলে জনসাধারণের প্রাণের উপর সঙ্কট এসেছে। তাকে রক্ষা করতে হলে সকলের মিলিতভাবে সহায়তা করতে হবে, ভাগাভাগি করে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সকলকে নিজ নিজ খাদ্যের কিছু অংশ বাঁচিয়ে যাদের পেটে অন্ন নেই তাদের ভাগ করে দিয়ে তাদের বাঁচাতে হবে। যদিও চিরকাল এমন করতে হবে না। কারণ চিরকাল দুর্ভিক্ষ থাকে না। আবার ফসল ঘরে এলে সকলের পেটভর্ত্তি অন্নের অভাব থাকবে না। আজ যদি সকল দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও কিছুদিন আধপেটা অন্ন গ্রহণ করি তাতে আমাদের অসন্তোষের কি আছে ? আপনারা মিথ্যাই ভয় পাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত কোথাও থেকে কোন গণ্ডগোল, প্রাণহানির সংবাদ পেয়েছেন কি ? যাতে মজদক পন্থীদের কুটিলতার প্রমাণ পাওয়া যায় ? তারপর বলছেন সাসানী সিংহাসনের কথা। তার জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না। যদি এই তুচ্ছ সিংহাসনটির বিনিময়ে আমার ঐ বিশাল সাম্রাজ্যের সকল প্রজাদের অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়, তাহলে আমার কাছে তা অতি সুখের কথা।

কবাতের কথায় শ্রোতাগণ বিশেষ নিরাশ হয়ে পড়েন। যদিও তারা নিজেদের বিষয়-বৈভবের হানি দেখে মনে মনে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন, তবুও তারা অনুভব করছিলেন যে, গত ছয়মাস যাবত জনসাধারণের মধ্যে যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল তা মাত্র একদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। সেনা-সৈনিকদলের দাপট না থাকতেও আজ নগর মধ্যে অদ্ভুত শান্তি বিরাজমান। আজ নিজেদের চোখের

সামনে তারা যা দেখেছেন তা তাদের বুদ্ধি বিবেচনার বাইরে। তারা আজকের পরিস্থিতি দেখে বেশ বুঝতে পারছেন যে ধনী সম্প্রদায়ের দিন শেষ হয়ে এসেছে এতদিন গরীবদের বুকের উপর দিয়ে যে যথেচ্ছ রথ চালিয়ে এসেছেন আর তা চলবে না। তাদের সামনে মাথা নত করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় আর আজ নেই।

পঞ্চম অধ্যায়

বৃহত্তর মানব সমাজ

(সময় :—জানুয়ারী খৃঃ ৪৯৮)

হেমন্ত ঋতুর ভরা যৌবন এ সময়। তিগ্রা'র ধারা আগের চেয়ে খানিকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, কিন্তু তার গতি আগের মত তেমনি খর প্রবাহী আছে।

সারা দিন হিম বর্ষা হয়ে চলেছে, যদিও সেগুলি গলে যেতে বিশেষ দেরী লাগছে না। যতক্ষণ হিমবর্ষা হচ্ছিল ততক্ষণ তেমন ঠাণ্ডা অনুভব হয়নি, কিন্তু দিনের শেষে হিমবর্ষা থেমে যাওয়ার পর বাতাস বইতে থাকায় খুব শীত হতে লাগল।

রাজ অন্তঃপুরে সকল জায়গায় সুন্দর সুন্দর পাথর বসানো। উঠানে প্রবেশ দ্বার থেকে অন্য সব জায়গায় পাথরের কাজ শুধু। সেখানে বরফ বা অন্য কোনও অসুবিধা নেই। সকল ঘরের মধ্যেই কয়লার চুলা জ্বলছে, তাছাড়া যে যতখানি পারে গরম পোষাক ত পরেছেই। অতএব অন্তঃপুরে শীতের প্রভাব তেমন দেখা যায় না।

যদিও আজকাল ফুলের অকাল। তবুও সাসানী সম্রাট-কবাতের ঘরে নিয়ম মত ফুলের বাহার অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ঘোড়ার সাহায্যে যেখানে প্রতিদিন ৩০০ ক্রোশ ডাক চলাচল হয়, প্রতিদিন সংবাদ আদান প্রদান করা সম্ভব হয়, সেখানে সামান্য কিছু ফুল আর এমন কি বড় কথা।

অন্তঃপুরের ভোজন শালা থেকে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যের সুগন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। সেখানে উঁকি দিলে দেখা যাবে বিবিধ প্রকার মাংস ব্যঞ্জন প্রভৃতির সমাবেশ। গরম বা শীতল মাংস;

পক্ষী, ছাগ, মেষ, মাত্র দুই মাসের গোবৎস, কবুতর, হংস, চকোর, ঘোড়া প্রভৃতি নানা প্রকার প্রস্তুত মাংস থালায় থালায় সাজান রয়েছে। গন্ধশালী চালের ভাত থেকে আসছে অপূর্ব্ব সুগন্ধ। আগুনে ঝলসানো মসলা মাখানো মাংসের গন্ধে জিভে জল আসে! এমনি নানাদেশীয় খাদ্য দ্রব্য নানাপ্রকার থালায় ভিন্ন ভিন্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে খোরাসানী কাবাব ও হিন্দ দেশীয় শৌল্য মাংস প্রধান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাছাড়া রোমক, চীন দেশীয় নানা প্রকার প্রধান খাদ্য দ্রব্যগুলিও স্থান পেয়েছে। ক্ষীর দিয়ে প্রস্তুত ক্ষীরোদক প্রভৃতি গ্রামীন খাবার গুলিও যথাযোগ্য স্থান পেয়েছে। ভোজন ছাড়া নানাপ্রকার পানদ্রব্য পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সুন্দর বিল্লৌরী কুঁজোর মধ্যে এবং অন্যান্য মণি মুক্তা খচিত পাত্রের মধ্যে রাখা রয়েছে, কঙ্গ, অরন্দ, মর্ব, অলবন্দ, আমুদ ও কপিশার প্রসিদ্ধ লাল, সোনালী ও শ্বেতবর্ণ সুরা। তার পাশে পাশে রয়েছে স্ফটিক স্বচ্ছ পাথরের উপর রত্নখচিত নানা আকারের চষক। এই চষকগুলির উপর শাহন শাহের চিত্র খচিত রয়েছে। তাছাড়া এখানকার সকল থালা বাসন গুলিই রাজ লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত। স্বর্গের অপ্সরার মত সুন্দরী এক একজন রাজ পরিচারিকা কলাপূর্ণ চলনে সেই সব পাত্রগুলি ভোজন বেদিকার উপরে সাজিয়ে রাখছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে সবচেয়ে লক্ষণীয় হল, এই সকল সুশিক্ষিতা পরিচারিকা থাকা সত্ত্বেও মহারাণী সম্বিক নিজের হাতে এটা ওখানে সেটা এখানে সাজিয়ে রেখে দিচ্ছেন, নইলে শুধু ওদের উপর ভরষা করে তাঁর যেন মন উঠছে না। সারা ভোজন শালায় সুন্দর সুন্দর খাদ্য দ্রব্যের বিরাট সমাবেশের সঙ্গে সুন্দরী পরিচারিকা গুলির উচ্ছল রূপ-যৌবন মিলে এক স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি করেছে যেন।

সব কিছু সাজানো শেষ হতে মহারানী ও তাঁর সেবিকা সকলে প্রধান দ্বারপথে এসে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকেন, কিছুক্ষণের

মধ্যে শাহনশাহকে ভিতরে আসতে দেখা গেল। তাঁর বেশ ভুষা যদিও সাধারণ ছিল, তবুও শাহনশাহী বৈভবের পুরাপুরি ছাপ সুস্পষ্ট। শাহের দৃষ্টি ঘরময় কাউকে যেন খুঁজে ফিরছে। সেবিকারা একে একে নত মস্তকে অভিবাদন জানায়, কিন্তু শাহের ধ্যান যেন অন্য কোথাও। সম্বিক সামনে এসে অভিবাদন করে শাহের হাত ধরতে শাহ যেন ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে ওঠার মত চমকে উঠে চোখ মেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, বেদিকার উপর সাজানো বিরাট ভোজন আয়োজন দেখে আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করেন কবাত—প্রিয়ে! এসব কি? এত বিরাট আয়োজন কিসের? আমার যবের রুটি কই? লবন, সিরকা আর পনীর কোথায়? সম্বিক কবাতের হাত দুটি ধরে নম্র স্বরে উত্তর দেন।—যবের রুটি? আজ আর তার প্রয়োজন নেই মহাত্মা। তম্পোনে আজ একটি প্রাণীও ক্ষুধিত নেই। শুধু তম্পোন কেন, দেহিস্তানেও (গ্রাম) আজ কেউ ক্ষুধিত নেই। অতএব আজ শাহনশাহের এই রাজভোগ গ্রহণ করবার অধিকার হয়েছে, নইলে আপনার সম্বিক নিজে হাতে রাজভোগ সাজিয়ে দিত না আপনার সামনে।

—তা আমি জানি যে আমার সম্বিক আমাকে কখনও বঞ্চিত করতে পারে না, তবে বলছিলাম, এত বিরাট আয়োজনের কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

—পাচিকা এবং সূপকার আজ কয়েকমাস পর একটু সুযোগ পেয়েছে। কম করতে অনেক চেষ্টা করেও এতগুলি হয়ে গেছে। তাছাড়া আজ যে অন্দর্জগর আসছেন।

—তাই নাকি? কবাতের চোখদুটি যেন চমকে ওঠে। আমাদের অন্দর্জগর আজ একসঙ্গে অন্নগ্রহণ করবেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু তিনি মাংস এবং সুরা গ্রহণ করবেন না, কারণ মাংসের জন্য পশুহিংসা আবশ্যক হয়। একটি প্রাণীর জীবন সংহার করে আর একটি প্রাণীর আনন্দ করাকে তিনি ঘৃণা করেন

হিংসা অবশ্য তারও প্রাণে আছে। কিন্তু সে হিংসা শুধু রাগ ও মোহের প্রতি।

—তাহলে তুমি মাংস ও মদ বাদ দিলে না কেন? আমাদের অন্দর্জগর বামদাত পুত্র যা খেতেন আমারাও তাই খেতাম।

—কিন্তু অন্তপুরবাসী আজ প্রমাণ করতে চায় যে সমগ্র রাজ্যের লোক আজ সুখী জীবন ফিরে পেয়েছে। তাছাড়া সিয়াবখ্শ ও মিত্রবর্মা ও আজ এখানে ভোজন করবেন।

—ও, বীর তরুণ সিয়াবখ্শ? কিন্তু মিত্রবর্মা কে?

—মিত্রবর্মার কথা বলতে ভুলে গেছি। তিনি আমাদের অন্তর্জগরের প্রিয় বন্ধু এবং হিন্দুস্তানের একজন রাজকুমার। এখন যদিও তাকে রাজকুমার বলা ভুল, কারণ রাজপাট সব ত্যাগ করে তিনি দেশ পর্য্যটন করতে করতে অন্দর্জগরের সঙ্গে পরিচিত হবার পর, তাঁর পথ গ্রহণ করেছেন। মিত্রবর্মা হিন্দ দেশীয়, কিন্তু তার মা নহাবন্ত এর কারেন পল্লব এর ভগ্নী। ঐ দেখুন ওরা আসছেন।

এমন সময় দূরে দ্বারপথে তিনজন অতিথিকে আসতে দেখা গেল। সকলের আগে আসছিলেন রক্তবসন অন্দর্জগর। চোখে মুখে তার চিন্তার রেখা, চললে গম্ভীরতা। তাঁর পিছনে পিছনে পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক দুজন তরুণ। মাঝখানে যে তরুণটী আসছিল পিছনের তরুণের চেয়ে তাঁর শরীরের বর্ণ কিছু কম গৌরবর্ণ তার মুখে পিছনের তরুণের মত দাড়ি নেই।

আগন্তুক তিনজন শাহের সামনে এসে ভূমি পর্যন্ত মাথা নত করে অভিবাদন করতে যাবে এমন সময় শাহ ইংগিত করতে তারা শুধু মাথা সামান্য নুইয়ে শিষ্টাচার পালন করেন। সম্বিক চার জনকে চারটি পৃথক আসনে নিয়ে বসিয়ে দেয়। তারপর এক এক করে খাবারের থালা এনে সামনে রেখে দেয়।

খেতে খেতে সকলে আলাপ আলোচনায় এমন মগ্ন হয়েছিলেন যে সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যগুলি চিনে স্বাদ গ্রহণ করবার অবকাশ পায় না

কেউই। কবাত গদগদ স্বরে বললেন,—গুরুদেব! এতদিন আমি অন্ধ হয়ে ছিলাম, আপনি আমাকে জ্ঞানের পথ দেখিয়েছেন, কে বলে আপনি বেদীন, আপনি যথার্থই দেরেস্তদীন (স্বধর্মী)

—দেরেস্তদীন! এই হল আমাদের অবতার মহাত্মা মানীর প্রদর্শিত পথের নাম।

—মানী! কবাত আশ্চর্য্য হয়ে তাকান অন্দর্জগরের মুখের দিকে, বেদীন মানী প্রসিদ্ধ চিত্রকার বটে।

—না না শাহ। কথার মধ্যে বাধা দিলেন অন্দর্জগর। মানীর ধর্ম দেরেস্তদীন। লোকের চোখে ধূলো দেবার জন্য সুবিধাবাদী সম্প্রদায় এবং খৃষ্ট পন্থীরা তাঁর নামে বদনাম রটনা করেছে।

—আমি বিস্তারিত কিছুই জানিনা। তবে আমি বিশ্বাস করি আমাদের অন্দর্জগরের গুরু অবশ্যই মহাত্মা।

—নিশ্চয় তিনি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য নিজের জীবনের সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছিলেন। দুই শত পনের বৎসর পূর্ব্বে তিগ্রার তটে মসন মগরীতে ফাতক হমদানী এবং অশকানী (পার্থিয়ন) রাজ কুমারীর ঘরে মানী জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

—তাঁর মাতা পিতা কোন ধর্মের অনুগামী ছিলেন ?

—জরথুস্তী ধর্মের। মানীও জরথুস্ত ধর্ম কখনও পরিত্যাগ করেন নি। সেই ধর্মের অবতার বলে তাকে সকলে জানত। কিন্তু ধর্মের অন্যান্য লোকদের মত তাঁর হৃদয় সঙ্কীর্ণ ছিল না। কোনও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকে তিনি ঘোর পাপ বলে মনে করতেন।

—অর্থাৎ সকল ধর্মের প্রতি তিনি প্রেম ভাব পোষণ করতেন।

—হ্যাঁ, তিনি বলতেন, লোকের সামনে ন্যায় ও সত্যের আলো পৌছে দেবার জন্য যুগে যুগে ভগবানের কাছ থেকে একজন করে অবতার আবির্ভূত হয়ে থাকেন। কখনও তিনি হিন্দ.দেশের মাটীতে বুদ্ধের নামে আবির্ভূত হন, কখনও ইরানে স্পিতাম জরথুস্ত, আবার কখনও সু-দূর পশ্চিমে খৃষ্ট নামে প্রকাশ হন। তেমনি আমি মানী

ভগবানের দূত হয়ে এসেছি এবং বাবির (বাবুল) এর ভূমিতে সত্য প্রচার করছি।

—আপনার কথায় আমি নতুন জ্ঞান লাভ করলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ আমি এতদিন শুনে আসছিলাম সে, বামদাত পুত্র মজ্‌দক এক নতুন ধর্মের প্রচার করছেন। যদি তাও হয়। তাহলেও আমি বলব সেই ধর্ম মানুষের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেওয়া ধর্ম।

—না শাহ। বামদাত পুত্রের বহু আগে আরও কয়েকজন মহাপুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন এবং তাঁরা সকলেই মহাত্মা মানীর প্রদর্শিত পথ অনুসরন করে এই ধর্মকে আরও অনেক বড় করে প্রচার করেছেন।

ঋষি ববন্দক শুধু ইরানে নয়, সুদূর রোম পর্যন্ত এই ধর্ম প্রচার করেছেন। দ্বিতীয় জর্থুস্ত নামে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পীসার অন্তর্গত স্বরগান কুলে জন্ম দিয়েও তিনি সারাজীবন দেশে দেশে ধর্ম প্রচার করে ফিরেছেন। মানীর প্রদর্শিত ধর্মকে তিনি অনেকখানি সংস্কার করে তার মহিমা বৃদ্ধি করেছেন শতগুণে। তিনি বলেছেন যে ধর্ম শুধু পরলোকের জন্য নয়, ইহকালের জন্যও তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এই মানব জীবনেও ধর্মের সুফল পাওয়া সম্ভব।

—আরও বিস্তারিত বলুন।

—হ্যাঁ দেরেস্তদীনের কথা হল, ঈশ্বর পৃথিবীর সকল কিছুই সকল জীবের জন্য অর্থাৎ সমভাগে ভোগ করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অকামেনু (শয়তান) মানুষের মনে আপন-পর ভেদ সৃষ্টি করে মানুষকে পথভ্রষ্ঠ করছে। ঈশ্বর প্রাণীমাত্র সকলের সঙ্গে প্রেমভাব প্রদর্শিত করতে শিখিয়েছেন, কিন্তু শয়তান আমাদের সেই পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। খৃষ্ট অথবা মজ্‌দয়স্নী (পারসী) সকলেই ঈশ্বরের পুত্র এবং তাঁরাও শুধু জগতকে এই কথা বোঝাবার জন্যই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। হিন্দ দেশের ঋষি বুদ্ধও জীবমাত্রে প্রেম করবার উপদেশ প্রচার করেছেন।

—বুদ্ধদেবের নাম আমি শিশুকালে শুনেছি, যখন আমি কেদারীয় রাজধানী বরখ্‌শাতে আমার ভগ্নীপতির কাছে ছিলাম।

—হ্যাঁ, কেদারী (শ্বেত হুন) বংশের রাজত্ব হিন্দ দেশের ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাদের রাজ্যে বুদ্ধের অনুগামীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও আমাদের মত রক্তবর্ণ বসন ব্যবহার করে এবং সকলের প্রতি দয়া ও প্রেম প্রদর্শনই মানুষের সর্ব্ব প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে।

—কিন্তু আমি ত শুনেছিলান যে বুদ্ধদেব এবং তাঁর অনুগামীরা বগ'কে (ভগবান) বিশ্বাস করে না।

অন্দর্জগর এবার মিত্রবর্মার দিকে সংকেত করে বললেন,

—সে বিষয়ে আমাদের সাথী মিত্রবর্মার কাছে আমরা বিস্তারিত জানতে পারব। তবুও আমি যতদূর জানি, বুদ্ধদেব এবং তাঁর অনুচরবর্গ মানবতাকেই উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। সকল প্রাণীদের সঙ্গে মৈত্রীভাব রাখা, পীড়িতের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা, সুখীজনকে দেখে প্রসন্ন হওয়া এবং দুষ্টকে দেখে উপেক্ষাভাব রেখে মনের মধ্যে ভেদ ভাব না জাগানো প্রভৃতি বুদ্ধ উপদেশ বলেই জানি। মানুষের জন্যে বুদ্ধদেব প্রদর্শিত পথই কল্যাণের পথ। কি বল মিত্র? মিত্রবর্মা বিনা সঙ্কোচেই জবাব দেয়,—

—হ্যাঁ, বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ, চিত্র শিক্ষার্থী শিশুদের প্রারম্ভিক রেখা-চিত্রের মতই ভগবান বা দেব-দেবীদের আবশ্যকতা মনে করেন।

—অর্থাৎ যেমন ছোট শিশুদের আঁকাবাঁকা রেখার মাধ্যমে চিত্র অঙ্কন শেখানো হয়, পরে সিদ্ধহস্ত চিত্রকার হবার পর আর তার প্রয়োজন হয় না, তেমনি ভগবানের সম্বন্ধে কি বৌদ্ধদের বিচারধারা? প্রশ্ন করেন কবাত।

—ঠিক তাই। পরে সে যখন প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পায় তখন তার আর ভগবানের প্রয়োজন হয় না। মানুষ হয়ে সৎপুরুষ নিজের

চরিত্রে মৈত্রী, করুণা, প্রসন্নতা ও উপেক্ষাভাব পোষণ করা কর্তব্য মনে করে।

ভোজন পর্ব শেষ হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে দুই-এক চষক মদিরাও সকলে গ্রহণ করেছে, কিন্তু মিত্রবর্মা মদিরার পাত্র হাতে নিয়ে অধিক পানে অস্বীকার করে অন্যহাত দিয়ে চাপা দিয়ে বসে আছে। কথার মোড় ঘুরে যাচ্ছে দেখে মজদ্‌ক তাড়াতাড়ি আলোচনার সূত্র ধরে বললেন,

—বুদ্ধদেব সমতার উপদেশ দিয়েছেন। মানুষ মানুষের ভাই, সকলেই সমান, এই বিচারধারা শুধু হিন্দে নয়, সুদূর তুখার, শক এবং তারও দূরে চীন দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। কবাত আশ্চর্যভাব প্রকাশ করে বলেন,

—চীন দেশীয় অথবা হুন, শক অথবা ইরানী, বুদ্ধদেব সকলকেই সমভাব ভাবতে উপদেশ দিয়েছেন ?

—হ্যাঁ, তিনি শুধু উপর থেকে সমভাব প্রদর্শন করবার বাণী প্রচার করেননি। তিনি এই "আপন-পর" ভেদভাব দূর করবার জন্য ধন সম্পত্তি সব কিছু "সমুদায়ের" (সঙ্ঘ) বলেছেন। আমাদের মহাপুরুষ মানী হিন্দদেশে গিয়েছিলেন। বুদ্ধের এই উপদেশ তাঁর খুব ভাল লাগতে নিজধর্মেও সেই নীতি পালন করবার জন্য খুব জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন দেরেস্ত-দীনের উপরি শ্রেণীর অনুগামীদের মধ্যে সকলকে এমন হতে হবে যেন তাদের কাছে একদিনের অধিক ভোজন এবং এক বৎসরের উপযুক্ত ব্যবহার করবার চেয়ে বেশী বস্ত্র না থাকে।

—হুঁ! শুনছি আমাদের অন্দর্জগরও তাঁর অনুগামীদের মধ্য থেকে আপন-পর ভেদভাব দূর করতে চান ?

—হ্যাঁ আমাদের প্রথম মহাপুরুষ শুধু মাত্র উচ্চ শ্রেণীর ধর্মাবলম্বীদের এই পন্থা অবলম্বন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু ঋষি ববন্দক মানী ও বুদ্ধের প্রদর্শিত পথকে আরও বিকশিত

করে বলেছেন, এখন যেন আমাদের মধ্যে আর ভেদভাব না থাকে, কারণ ধর্মযুদ্ধে অধর্মের পরাজয় হয়েছে। এখন নতুন সমাজ নতুন সংস্কৃতি গঠন করবার সময়। তাই মানী ও ববন্দকএর প্রদর্শিত পথকে গ্রহণ করে গত বিশ বৎসর যাবত নিজেও চলে আসছি এবং সকল মানব সমাজকে সেই পথ গ্রহণ করতে অনুরোধ করে আসছি।

—আমার মনে হয় মানুষের মন থেকে এই আত্ম-পর ভেদভাব দূর করা অসম্ভব।

—হ্যাঁ, অনেকে তাই মনে করে বটে। কিন্তু বোঝালে তারাও বোঝে যে এই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাবার একটাই মাত্র পথ, সেটা ঐ ভেদ-ভাব দূর করবার পরই পাওয়া সম্ভব।

—কঠিন সমস্যা বটে, অথচ এই ছাড়া গত্যন্তরও নেই।

—সেই জন্যেই ত ধর্মাধ্যক্ষের চেয়েও ধর্মাত্মা যারা তাঁরাও আমাকে বিধর্মী বলে।

—শুধু বিধর্মী নয়, তারা বলছে যে বামদাত পুত্র শুধু অন্ন এবং ধনকেই সারা মানবসঙ্ঘের সম্পত্তি করতে চান না, তিনি কুলঙ্গনাদের বেশ্যাবৃত্তি করাতে বাধ্য করাতে চান, অতএব তাদেরও সকলের সম্পত্তি বলে চালাতে চান। এবার মজদক হাসি সম্বরন করতে পারেন না ;

—এটা নেহাত ছেলেমানুষের কথা। এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে ? কেন, আমরা স্ত্রীকে সম্পত্তি বলে ভাবি না ?

—তা নয়, আপনি ত বিবাহ বন্ধনকে ভেঙ্গে ফেলতে চান। বন্ধু মিত্রবর্মা ! তুমি এ বিষয়ে কি মনে কর ?

—স্ত্রীকে পুরুষের সম্পত্তি বলে বামদাতপুত্র মানেন না। তাছাড়া বিবাহ সম্বন্ধটাকেও প্রত্যেকের জন্য বর্জন করতেও বলেননি তিনি।

—যাই হোক, বিশেষ কারও জন্যে ত বলেছেন ? তাহলে

লোক সেই সূত্র ধরেই প্রচার করছে যে, মজদকী পন্থী বিবাহ প্রথা তুলে দিতে চায়। স্ত্রীকে সকল পুরুষের ভোগের সম্পত্তি বলে মুক্ত করতে চায়।

—না, বললো মিত্রবর্মা। তাদের বুঝবার ভুল। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে আজ যে ধারণা চলে আসছে, মজদক পন্থীরা অবশ্যই সেই ধারণার পরিবর্ত্তন করাতে চায়। সকল দেশে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের ধারণা একপ্রকার নয়। এই যেমন এখানে মহারানী সম্বিক এবং শাহনশাহ্ অর্থাৎ আপনারা দুজনে সহোদরা ভাই ভগ্নী, আবার তিনি আপনার পত্নীও বটেন। কিন্তু আমাদের দেশে অর্থাৎ হিন্দদেশে এ রকম আমরা ভাবতেও পারি না। ইরানে ভগ্নী ও পুত্রের মধ্যে বিবাহ হওয়া যেমন আশ্চর্য নয়, তেমনি হিমবন্তে দেখুন একটা পরিবারে সকল ভাইদের জন্য একজন মাত্র পত্নী।

কথার শেষে হঠাৎ সিয়াবখ্শ বলে ওঠে,—অর্থাৎ, আমাদের দেশে এক পুরুষের বহু পত্নী থাকা আশ্চর্য নয়, হিমবন্তে ঠিক তার উল্টো, একই স্ত্রীর বহু স্বামী থাকাই নিয়ম।

—এ তে আশ্চর্যের কি আছে। বললেন মজদক। একস্থানে যা নিষিদ্ধ, অন্যস্থানে তাই বিহিত।

—তাহলে স্ত্রী-পুরুষের এই সম্বন্ধের শিক্ষাই কি হিন্দী ঋষি বুদ্ধদেব দিয়েছিলেন? প্রশ্ন করলেন কবাত। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মিত্রবর্মা বললো,—না। তিনি শুধু উচ্চশ্রেণীর উপাষকদের জন্য স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ নিষেধ করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁর উচ্চশ্রেণীর অনুগামীরা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অবিবাহিত থাকেন। মজদক আবার বললেন।

—মানীও তাঁর উচ্চশ্রেণীর অনুগামীদের বলেছেন পরিবার ও পত্নীহীন হতে। যবন দার্শনিক প্লাতো বলেছেন, মহান উদ্দেশ্যের জন্য যাঁরা জীবনকে উৎসর্গ করেন তাদের পক্ষে শুধু সম্পত্তির জন্য নয় নারী সম্বন্ধেও আপন-পর ভাব দূর করতে হবে। কারণ স্ত্রী'র সম্বন্ধে

কেন্দ্রীভূত আপন-পর ভাব তার সন্তানের মধ্যেও দেখা দেবে এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে বিস্তারলাভ করবে। আপন-পর স্বার্থের জন্য পৃথিবীর লোক কী না করতে পারে? জগত কল্যাণের জন্য মানুষ তখনই তার সম্পূর্ণ শক্তি ও চিন্তা প্রয়োগ করতে পারে যখন তার নিজের কোনও সন্তান থাকে না।

—তাহলে প্লাঁতো কি সাধু-সাধুনী হবার উপদেশ দিয়ে গেছেন?

—না, তিনি ব্যবহারিক ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল মানুষকে কোনও কাজে সফলতা প্রাপ্ত করতে হলে তাকে ইন্দ্রিয় সংযমী হতে হবে। তবে সরাসরি তিনি স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে অস্বীকার করেননি। তাঁর উপদেশ হল, উচ্চ জীবন ও উচ্চ আদর্শের অনুগামীদের সফলতালাভের জন্য বিশেষ প্রয়োজন পুরুষ-স্ত্রী বা আপন-পর ভাব পরিত্যাগ করা।

—যদিও এই নীতি ভয়ানক লোকবিদ্রোহী, তবুও জনতার মঙ্গলকামী পরম ত্যাগীর পক্ষে এই একমাত্র ব্যবহার্য পথ। বলে মিত্রবর্মা। আমি বুঝতে পারছি যে প্রচলিত লোকরুচির বিরুদ্ধে এই নীতির উপর জোর দেবার দরকারই হতনা, যদি এখানে প্রথম থেকে ভগ্নী বিবাহ, পুত্রী বিবাহ, মাতৃ বিবাহ প্রভৃতি প্রথার প্রচলন চলে না আসতো। অতএব এই প্রথার উপর অন্দর্জগরের কোনও জোর নেই। তিনি শুধু একে অপ্রতিষিদ্ধ বলে নীতির সংস্কার করতে চান, জীবনের লক্ষ্য হিসেবে মেনে নিতে জোর করেননি।

—বন্ধু মিত্রবর্মা যথার্থই বলেছে। মানব প্রবৃত্তিকে অধোগতি থেকে রক্ষা করা এবং তার সমস্ত শক্তিকে নবীন সংসার রচনায় নিয়োগ করাই আমার উদ্দেশ্য। অকামেন্নুর (শয়তান) পরাজয়ের পর আজ সেই শুভ সময় এসেছে। এখন আমরা নবীন সমাজ, নবীন সংসার, নবীন সংস্কৃতির ভিতপত্তন করি। ভীষণ

দুর্ভিক্ষের পর আজ সমস্ত ইরানের জনতা ক্ষুধার কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েই সত্বর তাদের দোষগুলি পরিত্যাগ করতে চলেছে। আজ তাদের ভাবনার মধ্যে যে দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে, এ কি তারই প্রমান নয় যে নবযুগের সূচনা হয়েছে? আজ মানুষকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে বিজয়ী অহুর্মজদ্'-এর পথে কে আসতে চায় স্ব-ইচ্ছায়।

শাহ মজদকের কথায় ভাবোদ্রেক ভরা কণ্ঠে বললেন,—আমি এই পথে চলতে প্রস্তুত। আমার সম্বিকাও আমার সঙ্গে একসাথে পথ চলতে প্রস্তুত। কি বল সম্বিক? কবাত তাকালেন মহারাণীর দিকে। সম্বিক নিজ পতির কথায় সায় দিয়ে বলেন,—হ্যাঁ, আমি সর্বদাই তোমার জীবনসঙ্গিনী। দেরেস্তদীনই অকামেন্নুর পরাজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমান। আমি নিজ পুত্র কাবুসকে অন্দর্জগরের শ্রীচরণে অর্পণ করতে চাই। এখন থেকে ও এমন শিক্ষা পাক যাতে অহু্র্মজদ'-এর রাজ্য বিস্তারে সে সহায়ক হতে পারে।

—আমিও সম্বিকের সঙ্গে সহমত! যদিও অকামেন্নুর পরাজয় হয়েছে, তবুও তার অনেক অনুগামী তাদের স্বামীর পথকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় এবং তাকে অক্ষয় করে রাখতে চায়। তারা চায়না যে নতুন করে সত্যের আলো প্রকাশলাভ করুক। অতএব যত বাধা বিপত্তি বা ভয় আমাদের সামনে আসুক না কেন আমরা পিছন পানে তাকাবো না, আমরা ভীত হব না।

—হ্যাঁ, বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় আমরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করবো। বললো মিত্রবর্মা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিস্মৃতি কারার বন্দী

তিক্রা, তিগ্রা ও হুফরাতের উপত্যকায় প্রকৃতি যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে পৃথিবীকে নতুন করে দেখছে। বসন্ত এসে মৃত্যুর ছায়াকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তার চিরহরিৎ যাদুমন্ত্রে। সকল জায়গায় গেয়ে চলেছে নবজীবনের জয়গান। গাছে গাছে সবুজ পাতার সমারোহ। ফুলের বনে ভ্রমর আসে গুণগুণিয়ে সুর তুলে।

কিন্তু তম্পোনএর গলি, রাজপথ, ঘরে অথবা আঙিনায় কোথাও বসন্তের নবাগমনের কোনই চিহ্ন নেই। যে পণ্যবীথি আগে দেশী বিদেশী পণ্যদ্রব্যে সর্বদাই সুসজ্জিত থাকতো, মানুষের সমাগমে থাকতো মুখরিত। আজ সেখানে জনশুন্য। মাঝে মধ্যে রাজ্য সৈনিকরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের দেখলেই মনে হয় রাজধানীতে এখনও মানুষ রয়েছে। বহুক্ষণ পর হয়ত দু-একজন পথচারীকে পথ দিয়ে আসতে বা যেতে দেখা যায়, তবে তারা যেন বিদেশী। যেন গোপনে বা ভয়ে একে অপরের দিকে ভাবপুর্ণ দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে ত্রস্তপদে এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া এক-প্রকার জনশুন্য বললেও অত্যুক্তি হয়না আজ তম্পোনকে। রাজপথে গলিতে সব জায়গায় যেন নীরবতার অখণ্ড রাজত্ব। কিন্তু রাজধানীর সকল ঘরগুলি জনশুন্য নয়। সেখানে আগের মত যারা ছিল তারাই আছে। তারা যে যার ঘরের মধ্যে যেন কী এক গোপন আলোচনায় ব্যস্ত। বাইরে পদশব্দ শুনতে পেলেই সকলের কণ্ঠ নীরব হয়ে যায়।

বলাশাবাতের এক সাধারণ গৃহস্থের ঘরে চার ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলছিল। চোখে মুখে তাদের গম্ভীর ভাব।

কথার ফাঁকে ফাঁকে কারও যেন প্রতীক্ষা করছিল, এমনি ভাবে বাইরে তাকিয়ে দেখছে। কিছুক্ষণ পর জরাজীর্ণ পোষাক পরিহিত একজন প্রৌঢ় দরজা ঠেলে ভিতরে আসে। প্রৌঢ় ভিতরে এসে আর একবার ভাল করে বাইরের দিকে দেখে সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করতে একজন অধীরভাবে প্রশ্ন করে।

—মেহ্দাত। কী ব্যাপার? সুরক্ষিত অবস্থায় এসেছেন ত?

—হ্যাঁ, আমি সকুশল এসেছি। ও এতক্ষণে তস্পোন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে, সেখানে ধর্মাধ্যক্ষ অথবা মহামন্ত্রী বা সেনাপতি কারও হাত গিয়ে পৌঁছতে পারবে না। চার ব্যক্তির মধ্যে যিনি বৃদ্ধ, তিনি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

—সিয়াবখ্শও চলে গেছে? নগরের সংবাদ কি? এখনও কি তস্পোনের রাজপথ রক্তরঞ্জিত হয়ে চলেছে? ঘরের মধ্যে শিশু আর নারীর কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে?

—তস্পোনে মৃত্যুর গহন নীরবতা বিরাজমান। রাজপথ গলিপথ সব নির্জ্জন। ভীষণ ঝড় ঝঞ্ঝার পর যেমন সমুদ্র এবং উদ্যান নিশ্চল হয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় শুধু সৈন্যদলের টহল আর কড়া পাহারা।

—তাহলে সৈনিকরা তেমনি হিংস্রভাব নিয়ে এখনও ঘুরছে?

—না ঠিক ততটা নয়, যেমন প্রথমে শুরু হয়েছিল। কারণ আমাদের ইরানরাজ হাত তুলতে চাননি। আমার মনে হয় তিনি নিজেকে ভিন্ন করে রাখতে চেয়েছিলেন।

—তাহলে তস্পোনের পথে এই রক্তের নদী বয়ে যাওয়ার পিছনে কার হাত থাকতে পারে? খুব ত ইরানরাজের নামে ভালমানুষী করা হচ্ছে।

আগন্তুক বিবাদ শান্ত করে সকলকে ইশারায় চুপ করে বসতে বলেন। —ভাইসব! একথা ঠিক যে আমাদের ইরানী ভাইরা তাদের ভাইয়ের রক্তে হাত লাল করতে চায়নি। কিন্তু

গজ্‌নস্পদাত খুরাসান প্রভৃতি দূর দূর থেকে সৈনিক এনে রাজধানীতে আমদানী করেছে। তারাই ত আমাদের উপর অত্যাচার করছে। কিন্তু এখন সব শাস্তি হয়ে গেছে। বড়ই মূল্যবান শাস্তি। আমাদের অন্দর্জগরের (গুরু) সঙ্গে সম্বন্ধিত যাকে হাতের কাছে পেয়েছে, তারই মুণ্ডচ্ছেদ করেছে। দুর্ভিক্ষের সময়ের সেই রাগের প্রতিশোধ ওরা বেশ তৃপ্তি করে নিয়েছে। ভাণ্ডার থেকে অন্ন বার করে, প্রজাদের বাড়ী বাড়ী ভাগ করে পৌঁছতে যারা সহায়তা করেছে, তাদের ঘর বাড়ী খুঁজে খুঁজে বার করে লুঠ করে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তাদের স্ববংশে নিধন করে তবে ছাড়ছে। আজকের এই সময়টা যদি বসন্তকাল না হত অর্থাৎ তিগ্রার বুকের উপর জমাট বরফ গলে গিয়ে তার স্রোতকে তীব্র না করতো তাহলে এতক্ষণ তস্পোনের সকল গলিপথ মড়ার গাদায় মানুষ সমান উচু হয়ে যেত এবং দুর্গন্ধে কোনও মানুষ আর রাজধানীর দু-পাঁচ মাইলের মধ্যে থাকতে পারতো না।

—তিগ্রার জলে মড়া মানুষ নিক্ষেপ করা কি অধর্মের কাজ নয়? রোষপূর্ণ স্বরে বললো একজন শ্রোতা।

—এদের কাছে ধার্মিক-নাস্তিকে, অধর্মের সঙ্গে ধর্মের কোনও পার্থক্য নেই। যে কাজে নিজেদের স্বার্থরক্ষা হয় তাই এদের ধর্ম। মগোপতান-মগোপত (ধর্মাধ্যক্ষ) স্বয়ং আদেশ দিয়েছেন যে তিগ্রার জলে মড়া ভাসিয়ে দাও, যাতে কেউ মৃতের সংখ্যা আন্দাজ করতে না পারে। এমনি পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি যাবত একটানা হত্যাকাণ্ড মাত্র ২৪ ঘণ্টা হল বন্ধ হয়েছে।

—তাতো হবেই। কারণ পথের মাঝে এত লাশ দেখলে ক্ষোভ বাড়তে পারে এবং ঐ সকল মহাপুরুদের বাস করতে কষ্ট হবে। কিন্তু, ভাই হোরমুজ! আমার মতে মুখ বুজে এই অবিচার আমাদের সহ্য করা উচিত হচ্ছে না।

—আমারও তাই মত ছিল ভাই। বললো হোরমুজ। কিন্তু

আমাদের গুরু হিংসা প্রবৃত্তি দমন রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। সিয়াবখ্‌শ অনেকবার বলেছে, কিন্তু অন্দর্জগর রাজী হননি। তাঁর আদেশ, এখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল কাজ করতে হবে, তোমরা আদেশের অপেক্ষা করো।

—আমাদের করবারই বা ছিল কি। এমন হঠাৎ আক্রমণ করবে ওরা তা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি। কেদারীয় রাজা, রোমক, কৈসর এবং হুনদের সকল সামন্ত ও রাজারা তাদের পুরনো শত্রুতা ভুলে গিয়ে নিজ নিজ রাজদূত দ্বারা নতুন শাহকে ভেট ও শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। জামাস্পকে সিংহাসনে বসিয়েছে ওরা "সোখার আগুন নিভে গিয়ে শাপোর্‌এর ঝড় শুরু হয়েছে" দেখতে পাচ্ছোনা? মেহ্‌দাতের কথা শেষ হতে তার উত্তরে বয়োবৃদ্ধ পুরুষ মেহ্‌দাতের দিকে তাকিয়ে বললো।

—সব কিছু স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে, তবে আমাদের অন্দর্জগর ওদের হাতে ধরা পড়েন নি এই যা স্বান্তনা। আচ্ছা তুমি বলতে পারো, তিনি এখন কি করবেন বলে ভাবছেন?

—এখনও বিস্তারিত সংবাদ পাইনি। তবে এই লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষগুলির রক্তে স্নান করে ঐ খুনীদের তৃপ্তি হয়নি। আজ দরবারে বিরাট আনন্দৎসবের আয়োজন হয়েছে। কিন্তু নগরের জনসাধারণ এমন ভয় পেয়েছে যে উৎসবে যোগ দিতে পারেনি বেশীর ভাগ। দরবারে আগের মত ভীড় নেই। দরবারে সকলের প্রবেশ করবার অধিকার নেই। উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল সেই সকল খুনীদের মধ্যে বড় বড় উপাধি বিতরণ করা।

—আমি শুধু ভাবছি যে সাসানীদের ঐ ভারী মুকুটটা জামাস্প-এর মাথায় এখনও কেন ছিঁড়ে পড়ছে না।

—জামাস্প এর সব দোষ দিও না। বললেন মেহ্‌দাত। আমার মনে হয় তিনি সম্পূর্ণ ভাবে মানবতা বোধ হারাননি। মেহ্‌দাতের কথা শেষ না হতে হোরমুজ লাফিয়ে উঠে বললো।

—কি বললেন ? জামাস্প' এর মধ্যে এখনও মানবতা বোধ অবশিষ্ট আছে বলছেন ? চমৎকার ! তস্পোনের রাজপথে যে ভাইয়ের রক্তে নদী বইয়ে দিল, তিগ্রার জল রক্তে লাল করে দিল তার এখনও মানবতা বোধ আছে ?

—হোরমুজ ! তুমি হয়ত জানোনা যে, জামাস্প গজ্‌নস্পদাত এবং প্রধান পুরোহিতের হাতের খেলার পুতুল। তারা প্রজাদের হত্যা করে সিংহাসন দখল করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সাসানী সিংহাসনে একমাত্র সাসানী বংশধররাই বসতে অধিকারী তাই তারা জামাস্পকে সিংহাসনে বসিয়েছে। শাহনশাহ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। শাপোর মেহরানই তৃতীয় উল্লেখযোগ্য অত্যাচারী। এরাই আজ লক্ষ লক্ষ পরিবারকে শোক সাগরে ডুবিয়েছে। জরমেল্ল সোখাও (কারেন পল্লব) এই হত্যাকারীদের দলে মিশে হত্যার তাণ্ডবলীলা চালাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি।

নিজের কাকার রক্তের সম্বন্ধের কথাটাও ভাবল না এমনি অকৃতজ্ঞ সে।

—কাকা, ভাই, বাবা, এদের হত্যা করতে ওরা কখনও ইতস্ততঃ করেছে যে আজ করবে ? রাজপুত্রেরা জনকভক্ষী হয়ে থাকে। যাই হোক, এইবার বলতো, এই কদিনের সংবাদটা শুনি।

—শোন তাহলে। যেমন করে ওরা জামাস্পকে গদীতে বসিয়েছে, তেমনি করে জরমেহ্রকে মহামন্ত্রীর পদ দিয়েছে। উপাধির বর্ষা হয়ে গেছে দরবার কক্ষে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খুনী গজ্‌নস্পদাতকে "নখবীর" উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

—আচ্ছা ! তা খুরাসানের "কনারঙ্গ" এর পদটাই বা তার পক্ষে কম ছিল কিসে ?

—হ্যাঁ তবে এটা ঠিক যে গজনস্পদাত যদি কেদারীয় সীমান্তের প্রান্তপতি না হত, তাহলে এতখানি অত্যাচার করতে পারতো না। শাহ কবাতকে গেপ্তার করে সে-ই কারাগারে বন্দী করে রেখেছে।

প্রথমেই কবাতকে দণ্ড দেবার কথা উঠেছিল, কিন্তু গজ্‌নস্পদাত বললো, না, আগে সিংহাসন লাভের মহোৎসব করা হবে, পরে দণ্ড দেওয়া হবে। গত কয়েক বৎসর যাবত যে সকল সামন্তদের মুখ শুকনো থেকে এসেছে, আজ তাদের মুখে হাসি যেন ধরেনা। জামাস্প-এর সামনে মূল্যবান ভেট দেওয়া হয়েছে। সৈনিকরা তরবারী ও ঘোড়া উৎসর্গ করেছে তার পায়ে। ধনিকরা দরবার কক্ষের আঙ্গিনা সোনা-রূপা দিয়ে ভরে দিয়েছে। কবিরা কবিতা রচনা করে পাঠ করে শুনিয়েছে আজ দরবারে।

—ছিঃ

—ছিঃ কেন ভাই ? এই ত তাদের পেশা। যে পেয়ালা ভর্ত্তি করে দেবে তারই জয়গান গাও প্রাণ মাতিয়ে। জামাস্প´ এর অন্তঃপুরে একদিনে একহাজার সুন্দরী প্রবেশ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ বা এই সংহার লীলায় নিহত কোনও হতভাগ্যের বিধবা স্ত্রী, কেউ বা অনাথা কন্যা। তাছাড়া জীবিত অসহায়দের পত্নীদের সংখ্যাও কম নয় তাদের মধ্যে। সীমান্ত বা আমলাদের মধ্যে শাহ কাউকে "মহিস্ত," কাউকে, "বহরেজ" কাউকে "হজারপত" আবার কাউকে হজার "বন্দক উপাধি" দিয়েছেন। এছাড়াও "তহ্ম-জামাস্প", "জামাস্প শ্নুম" "জায়েতান জামাস্প" "জামাস্প গোমন্দ" "জামাস্প-নখ্‌ব" এবং "বরাজ জামাস্প" প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হয়েছে অনেকে। রাজপুরোহিত অর্থাৎ ধর্মাধ্যক্ষ গুলনাজ পেয়েছেন "হমগদীন" (সর্বজ্ঞ) উপাধি। চারজন "মর্জবান" (প্রান্তপতি) চারজন অস্পাহপত (সেনাপতি) রাজভক্তির শপথ গ্রহণ করেছে। জ্যোতিষীরা নানাপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে।

—হ্যাঁ ততো করবেই। জ্যোতিষীদের রোজগার ত এতদিন একরকম ছিল না বললেই হয়। অন্দর্জগরের যুগে ওদের ভবিষ্যদ্বাণী সব মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে চলেছিল।

—তা ত নিশ্চয়। আজ তাদের পোয়া বারো। রাজকোষের

অর্থ প্রায় ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছে। তবে নতুন ভেট যা আসছে তা রাখবার জায়গা পাচ্ছেনা।

—পুরানো দরবার প্রথম কিছু রদবদল হয়েছে ?

—হয়েছে অনেক কিছুই, তবে চোখে পড়বার মত হল পুস্তেকান (শরীর রক্ষক) দের নতুন নিয়োগ।

—অর্থাৎ পুরানো শরীর রক্ষকরা এখন আর বিশ্বাসযোগ্য নয় ? তাহলে এবার নিশ্চয় গজনম্পদাত এর নিজের লোকেরা ভর্ত্তি হয়েছে,
—গজনম্পদাতের কথা আর কেন বলছ। যেদিকে দেখ, তাকেই চোখে পড়বে। আজ সব কিছুই ত তার হাতের মুঠোয়। হোরমুজ ব্যাথিত হৃদয়ে মেহুদাতের দিকে তাকিয়ে বললো।

—একদিকে নতুন শাহের সিংহাসন লাভের উৎসব পালন করা হচ্ছে, আর একদিকে সারা তস্পোন রাজ্য শোক সাগরে ডুবে রয়েছে। বাপ হারা সন্তান তাদের হারানো পিতাকে খুঁজে ফিরছে, পতিহারা পত্নী প্রাণ খুলে কাঁদতেও পারছে না।

—হ্যাঁ, দরবারে কোথাও শোকের স্পর্শমাত্র লাগেনি। উপাধির বর্ষা, ভেটের পর ভেট পাত্রের পর পাত্র সূরা, সবশেষে নর্ত্তক নর্ত্তকীদের, গায়িকাদের, বাদকদের ও বিদুষকদের নিজ নিজ কলায় পরিচয় দেবার অঢেল সুযোগ। গজনম্পদাত আজ নাচ-গান-বাজনার বিশেষ বন্দোবস্ত করেছেন। অথচ এদের মনে এতটুকু চিন্তার লেশমাত্র নেই যে আজ এই মূহূর্তেও সারা তস্পোন কাঁদছে, তিগ্রার জলধারা গুমরে মরছে বেদনায় !

—না না তিগ্রা কাঁদবে কেন ? তিগ্রা আর তস্পোন এমন বহু ভাঙ্গাগড়া দেখেছে। বহুবার কেঁদেছে, এখন আর কাঁদে না ওরা বাকী রইল ঐ খুনী শয়তানগুলো, ওরা কাঁদবে কেন ? ওদের ত আনন্দের দিন। দীর্ঘ বারো বৎসর যাবৎ বুকে বিঁধে থাকা কাঁটা তুলতে পেরেছে। ওরা গদী আর শাষণ হাতে পেয়েছে, আজ ওরা প্রাণখুলে আনন্দোৎসব করবেই।

—কিন্তু সত্যিই ত আর কাঁটা সমূলে তুলতে পারেনি। ওরা যদি মনে করে থাকে যে ওদের শত্রু আর বাকী নেই, তাহলে ভীষণ ভুল করে থাকবে।

—সে ওদের মনে থাকবে। বললেন মেহ্দাত। ওদের সবচেয়ে বড় শত্রুই ত ওদের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। শুধু অন্দর্জগর নয়। তার প্রিয় ও উপযুক্ত শিষ্যদের কাউকে ওরা ধরতে পারেনি। এইটাই ত তাদের বিশেষ দুঃখের কারণ।

—ভেড়ার দলের আর বেশীদিন আনন্দ করতে হবে না, সময় ঘনিয়ে এসেছে। ক্রোধে দাঁত কড়মড় করে বললো হোরমুজ।

*　　　*　　　*　　　*

রক্তের হোলি খেলা শেষ হয়েছে। পান গোষ্ঠী আর উৎসব শেষ হয়েছে। তরবারীর আঘাতে যাদের মারতে পারেনি এবার 'তাদের পালা। বিচার হচ্ছে তাদের। বিচারের নাম করে এক একজনকে বলি দেওয়া হচ্ছে নির্বিচারে।

ন্যায়াধীশ গর্বভরে ন্যায়াসনে বসে একের পর একজনের নির্ণয় শুনিয়ে যাচ্ছেন। সাক্ষীর অভাব নেই আসামীর বিপক্ষে। সাক্ষী দেবার আগে সাক্ষী নিয়ম মত শপথ গ্রহণ করে। "আমি অমুক যশস্বী প্রকাশমান ভগবানের সামনে, বহুমনের সামনে, আগুনের মত জ্বলন্ত অর্দে-বহিস্ত'এর সামনে, উপস্থিত জনমণ্ডলী, মাননীয় মহাত্মা গনের সামনে এবং স্পন্দারমন্দের সামনে অর্থাৎ যার ভূমির উপর আমি দাড়িয়ে আছি, এদের সকলের সামনে আমি সত্য কথা বলছি। আমি ভবিষ্যতে যে অন্ন খেয়ে জীবন ধারণ করবো সেই অন্নের নামে, নিজের আত্মার নামে শপথ করে বলছি একথা সত্য যে, ঐ ব্যক্তি কবাত অর্থাৎ পীরোজ-পুত্র বিধর্মী ও পাপীর সহায়ক রূপে ধর্মের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি যে শপথ দ্বারা এই সত্য প্রকাশ করছি, তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে ঈশ্বর যেন আমাকে উচিত শাস্তি দেন। চন্দ্র, সূর্য, জল, বায়ু অগ্নি

সকলের নামে আমি শপথ করছি, যা বলেছি তা সত্য, ঐ পাপী বিশ্বাসঘাতক।"

এমন জলজ্যান্ত মিথ্যা শুনে লোকেরা বলাবলি করতে থাকে, চন্দ্র, সূর্য, জল, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা নিশ্চয় শুয়ে আছেন, নইলে এখনও ওর জিহ্বা খসে পড়ছে না কেন, ওর মুখ দিয়ে রক্ত উঠে ও মারা যায়নি কেন।

এ'ত গেল ছোট খাটো বিচারালয়ের বিচার প্রহসন। এবার আমরা প্রধান বিচারালয়ের প্রহসন দেখি।

প্রধান বিচারপতির সামনে অভিযুক্ত আসামী কবাত দণ্ডায়মান। প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ কবাতের বিরুদ্ধে ভীষণ অপরাধের অভিযোগ করেছেন। সাসানী বংশ পুরোহিতের বংশ, অথচ পীরোজ পুত্র কবাত সেই বংশের সন্তান হয়ে পাপী বামদাত পুত্রের অনুগামী হয়েছেন। ধর্মের শত্রুর দণ্ড একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু প্রধান ন্যায়াধীশ শুধু দোষ নির্ণয় পর্যন্ত করবার অধিকার রাখেন। প্রাণ নেওয়া দেওয়ার অধিকার "বখশানা শাহনশাহ বগান বগের" হাতে। গজ্‌নস্পদাত জোর করে বললেন, "এমন অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত।" কিন্তু শাহ জামাস্প সত্যিই কি কবাতকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন? তিনি যদিও ঐ লোকগুলির হাতের পুতুল মাত্র। তবুও আপন অগ্রজকে এমন ভয়ানক দণ্ড দিতে তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল। গজন্‌স্পদাত ও পুরোহিত মশাই অনেক চেষ্টা করলেন যাতে কবাতের চোখদুটোকে অন্ধ করে দেওয়া যায়, কিন্তু জামাস্প এতেও রাজী হলেন না। তিনি শুধু বললেন,—আজ আমার বড় ভাইয়ের পালা, কাল হয়ত আমার পালা আসতে পারে। অতএব তাকে এত নিষ্ঠুর শাস্তি দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনারা শুধু একটা দিকই দেখছেন, কিন্তু একবার রাজ্যের বাইরে তাকিয়ে দেখুন। উত্তরে খজারী হুন-সেনা আমাদের রাজ্য সীমার মধ্যে এসে লুটপাট করছে। আমার পিতা পীরোজ'এর হত্যাকারী কেদারী হুনদল পূর্ব্ব সীমায় প্রস্তুত হয়ে

আছে। রোমক সম্রাট অনস্তাত শকুনের মত ইরানের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। বলা যায় না অকস্মাৎ কখন আমাদের মাথায় উপর কোন বিপদে এসে পড়ে। অতএব এখন আমি আপনাদের এই কথা মত কাজ করতে রাজী নই। তবুও আপনাদের সম্মান রাখতে বড় জোর অনুশ্বর্ত্তে পাঠিয়ে দিতে পারি কবাতকে।

এই কথায় যদিও আমলাবর্গ ষোল আনা খুশী হতে পারলো না। তবুও অনুশ্বর্ত্ত কারাগারে কবাতকে পাঠানোয় অনেকখানি সন্তুষ্ট হল তারা। অনুশ্বর্ত্ত হল "বিস্মৃতির কারাগৃহ"। মৃত্যুদণ্ড বা চোখ উপড়ে ফেলবার চেয়ে কম কষ্টকর নয় এই দণ্ড। আজ পর্যন্ত যে কোন বন্দী সেখানে গেছে, তার কেউই জীবিত ফিরে আসেনি।

কবাত ধৈর্য্যসহকারে দণ্ডাজ্ঞা শুনলেন। যদি মৃত্যুদণ্ডও তার মিলত, তাহলেও তিনি এমনি চুপ করেই শুনতেন। গত বারো বৎসর যাবত তাঁর শাষণকালে গত দুই বৎসর তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখময় সময় কেটেছে। প্রজাদের সুখ দুঃখ সমানভাগে ভাগ করে গ্রহণ করেছেন এবং এতে তার আনন্দের সীমা ছিল না। অন্দর্জগরের সংস্পর্শে আসার পর থেকে তাঁর জীবনের ধারার আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে। তিনি বুঝতে শিখেছিলেন যে মানুষের সুখ ও দুঃখ কোনটাই নিজের মধ্যে সীমিত রাখবার জন্য নয়। তবুও একটা দুঃখই থেকে গেল তিনি জ্ঞানচক্ষু লাভ করবার পর খুব কমই সময় শাসন করতে অবসর পেলেন। তবুও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ইরানে যে আগুণ জ্বলেছে, এ আগুন নেভাবার ক্ষমতা না আছে গজ্‌নস্পদাতের আর না আছে প্রধান ধর্মাধ্যক্ষের। ধর্মের জয় সুনিশ্চিত। অতএব ঐ মুষ্টিমেয় পাপীর পক্ষে সত্যকে বা ধর্মকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। আজ অথবা কাল সে সময় একদিন আসবেই। যেদিন ইরানে আবার ধর্মের জয়পতাকা উড়বে পত পত করে।

সপ্তম অধ্যায়

॥ তীর্থযাত্রা ॥

সূর্য তখন অস্তে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার এখনও নামেনি পৃথিবীর বুকে। এমনি সময় দুইজন স্ত্রী পুরুষ ইস্তখ্র নগরীর দ্বারপথে ভিতরে প্রবেশ করে। এমনি কত শত-সহস্র মানুষ সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করছে কে কার হিসেব রাখে। স্ত্রীর পরনে কোঁচান সুথ্যন (পায়জামা), হলুদ রংয়ের কোমরবন্ধ, বাঁধা চোগা। শরীরের পোষাক আধময়লা এবং নেহাৎ জীর্ণ। ইরানী নারীদের মত হাতে কঙ্কণ গলায় কণ্ঠী আছে কিন্তু চুলের খোঁপা এবং অন্যান্য আভূষণ ও পোষাক দেখে মনে হয় এরা পারসবাসী নয়। রাস্তায় এই পোষাক পরিচ্ছদ দেখে অবশ্য দু-একজন প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু ওদের গন্তব্যস্থলের নাম শুনে আর কেউ বেশী তর্ক করেনি। ইস্তখ্র নগরী ভগবতী অনাহিতার পবিত্র ধাম। ইরান রাজ্যের মজ্‌দয়স্নী ধর্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। শুধু ইরান নয় সুদূর সোগ্দ এবং সিন্ধ থেকে ভক্তজন অনাহিতার দর্শন-পূজা করতে আসে। ইস্তখ্রতে তীর্থ-পুরোহিতদের বিরাট এক সম্প্রদায় বাস করে; যাদের জীবিকা নির্ভর করে একমাত্র তীর্থযাত্রীদের সেবা-সহায়তা করে।

অনাহিতার জন্য ইস্তখ্র শুধু বড় তীর্থই নয়। ঐশ্বর্যে ও প্রভাবে ইস্তখ্র ইরানের দ্বিতীয় রাজধানী বলে পরিচিত ছিল। আজ থেকে পৌনে তিন্‌শ বৎসর পূর্ব্বে (খৃঃ ২৮শে এপ্রিল ২২৮) অর্তক্ষত্র (অর্দশীর) প্রথম, এইখানেই সাসানী বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই খানেই প্রথম রাজমুকুট ধারন করেছিলেন। সেই থেকে আজ অবধি কুড়িজন শাহনশাহের মুকুট-বন্ধন এইখানেই হয়ে আসছে। যতক্ষণ অনাহিতার সামনে শাহের মুকুট-বন্ধন না হবে ততক্ষণ

বাবকানের পুরানো সিংহাসনে কোনও সাসানী শাষককে শাহনশাহ বলে প্রজারা স্বীকার করবে না।

সাথীদ্বয় কিছুদূর পাথর বাঁধানো পথে চলবার পর চন্দন এবং অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধ অনুভব করতে থাকে। প্রধান অগ্নিশালা এবং অনাহিতার মন্দির নিশ্চয় বেশীদূর নয়। যাত্রীদ্বয়ের পথচলা দেখে মনে হয় এখানকার পথ বোধ হয় তাদের পরিচিত। তাই যেন চেনা পথে নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে গিয়ে গলির মধ্যে একটা বাড়ীর বন্ধ দরজার সামনে দাড়িয়ে কড়া নাড়তে থাকে। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে সামনে এসে দাড়ায় এক বৃদ্ধা। হাতে তার প্রদীপ। আগন্তুকদ্বয় অপরিচিত হলেও বৃদ্ধা নেহাত পরিচিতের মতই স্বাগত জানায়। যদিও এমন হওয়া ইস্তখ্রের মত তীর্থক্ষেত্রে স্বাভাবিক। যাত্রীদের সঙ্গে বিশেষ কিছু জিনিসপত্র ছিল না। তবে তাদের চেহারা দেখলে মনে হয় তারা পথক্লান্ত। বৃদ্ধা তাদের দিকে একবার তাকিয়ে আর বাক্যব্যয় না করে উপরতলায় একটি সাজানো গোছানো ঘরের দরজা খুলে ভিতরে যেতে বলে। অতঃপর কথায় কথায় বৃদ্ধা জেনে নেয় আগন্তুকদ্বয় সোগ্দ দেশের অধিবাসী।

ছোট কুঠরীতে প্রদীপ সাজানো ছিল, বৃদ্ধা নিজে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে দেয় এবং দরজার কাছে এসে "দীনক" নাম ধরে তিন চার বার ডাকতে একটি তরুণী ছুটে এসে সামনে দাড়ায়। চেহারা মধ্যম এবং পরিচ্ছদ মলিন। দেখলে বোঝা যায় যাত্রীদের সেবা করাই তার কাজ। তরুণী যাত্রীদের সামনে এসেই তার ডানহাত বাঁ কাঁধে এবং বাম হাত ডান কাঁধে লাগিয়ে মাথা নিচু করে অভিবাদন করে। বৃদ্ধার কিছু বলবার আগেই অভ্যস্ত তরুণী বিছানা প্রস্তুত করে দিয়ে ছুটে বাইরে গিয়ে হাত ধোবার জন্য গরমজল এবং পাত্র এনে সামনে রাখে। আবার গিয়ে একটা বড় থালায় আঙ্গুর, আপেল, খর্বুজ এবং লাল মদিরার পাত্র সামনে এনে দেয়। বৃদ্ধা কিন্তু যাত্রীদ্বয়কে ছেড়ে নড়বার নামটীও করছেনা। কথায় কথায় বলতে থাকে,—

বড় দেরী করে এলে বাবা! আরও একমাস আগে আসতে পারতে ত মজা হত। সেই সময় তো ইস্তখ্রের আসল শোভা দেখবার সময়। আমাদের মহান ধার্মিক শাহনশাহ জামাস্প তাজপোশীর জন্য এসেছিলেন এখানে। সকল ধনী মানী ব্যক্তি ও আমলাবৃন্দ এসেছিলেন সঙ্গে। সকলেই এসেছিলেন সপরিবারে মুকুট-বন্ধন উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে। সমস্ত নগরীর সে এক অপূর্ব্ব সজ্জা। চন্দন জলে সিক্ত নগরীর সমস্ত পথঘাট। এমন সুযোগ বার বার আসেনা। তখন তোমরা এলেনা কেন? বৃদ্ধা প্রশ্ন করে কিন্তু উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়েই আবার শুরু করে অন্য প্রসঙ্গ।

—নিশ্চয় আসতাম আমরা সেই সময়, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এত দূর থেকে এই পর্বতসঙ্কুল পথ ঠিক হিসেব করতে পারিনি।

—তা ঠিক। কোহকাফের রাস্তা বড় দুর্গম। আমি জানি কোহকাফ পরীদের দেশ। কিন্তু একবার যদি ভগবতীকে দর্শন করেছ তাহলে দ্রুজান, দেবান প্রভৃতি কারও ভয় থাকেনা। রাস্তায় নিশ্চয় আমার দুখ্‌ত (মেয়ে) এর খুব কষ্ট হয়েছে?

—কষ্ট ত নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু ইস্তখ্র পৌঁছে ভগবতীর আশ্রয়ে এসেই আমাদের সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে। যদিও পথে আমরা ঘোড়ার সওয়ারী পেয়েছিলাম তবুও আমার অনাহিতা দুখ্‌ত হখমতন (হমদান) এ এসেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই জন্যেই ঠিক সময়ে আমরা পৌঁছতে পারিনি।

বৃদ্ধা এবার পুরুষের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে যায় স্ত্রীর উপর।

—অনাহিতা দুখ্‌ত বুঝি তোমার নাম? চমৎকার নাম। যেমন চেহারা তেমনি নাম। ভগবতীর ভক্ত সকল জায়গায় রয়েছে। হবেই বা না কেন। অতিথি স্ত্রী এতক্ষণে মুখ খুলে প্রথম কথা বলে,

—আমার ভাই মাহপতের পর আমার পিতামাতার আর কোনও

সন্তান হয়নি বলে তাঁরা ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তারপর আমি জন্মাই! সেই জন্যেই তাঁরা আমার নাম রেখেছিলেন অনাহিতা তুখ্ত। বহুদিন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল ভগবতীর দর্শন করা, এতদিনে পূর্ণ হল।

—কেন হবেনা মা। ভগবতী কারও ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখেনা। যেমন তোমার মাতাপিতার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, তেমনি তোমারও ইচ্ছা পূর্ণ হল। ভগবতীর কাছ থেকে কেউ শুন্যহাতে ফিরে যায়না। কারও কোল শুন্য থাকে না.........

—না না, তাঁর কৃপায় আমার তুই ছেলে ও এক মেয়ে। পথে নিয়ে আসতে খুব কষ্ট হবে বলে বাড়ীতে রেখে এসেছি তাদের।

বৃদ্ধার যদিও আরও অনেক কিছু বলবার ছিল, কিন্তু অতিথিরা সে সুযোগ না দিয়ে হাত পা ধুয়ে খাবারে মনযোগ দেয়। দাসী দীনক ওদের সকল বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। মাহপত এবং অনাহিতা তুখ্ত যদিও বৃদ্ধার কথায় বিরক্ত বোধ করেনি, বরং মনোযোগ দিয়েই শুনছিল, কিন্তু দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া একান্ত দরকার। তাই বেশী সময় নষ্ট না করে বিশ্রামের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। তাছাড়া আগামী কাল ভগবতীর দর্শন করতে হবে।

বৃদ্ধার পুত্র আতুরফর্ণবগের সঙ্গে মাহপতের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। কিছুদিন আগে নিজ পত্নী সহ তস্পোনে পরিচয় হরেছিল মাহপতের। অনাহিতার পুরোহিতদের মধ্যে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এই বৃদ্ধার পুত্র। বৃদ্ধা এবার পুত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে,—

—ফ্রজন্দ এখন বাড়ী নেই, অবশ্য সে জন্য তোমাদের কোন কষ্ট হবেনা। তুই তিন দিনের মধ্যেই সে এসে পড়বে। আমি তোমাদের সকল দিকে নজর রাখবো পুস্‌স (পুত্র)। দীনক রইল তোমাদের সর্বদা সেবার জন্য। নিজের ঘরের মতই থাকো এখানে।

অতিথি স্ত্রীর ইশারার উত্তরে বৃদ্ধা বলে,—আর বলো কেন বাছা। এখানেও অকামেন্যুর চর এসে হামলা শুরু করেছিল। বিধর্মী

মজদকের লীলা আরম্ভ হয়েছিল। আর হবেই বা না কেন, স্বয়ং শাহনশাহের মতি গতি খারাপ হয়ে গেছিল, তা প্রজাদেরই বা না হবে কেন। কিন্তু এখন আবার ধর্মস্থাপন হয়েছে। ভগবতীর সেবা পূজায় আবার আগের মত ভীড় হচ্ছে।

—তাই নাকি? তাহলে ভগবতীর সেবা পূজায় কি ভীড় কমে গিয়েছিল? প্রশ্ন করে অনাহিতা দুখ্‌ত।

—হ্যাঁ মা। তোমার কাছে আর কি লুকাবো, আর পাঁচটা বৎসর যদি বিধর্মী কবাত সিংহাসনে থাকতো, তাহলে ইস্তখ্‌রের মানুষ গুলো অনাহারে মরতে বাধ্য হত। তীর্থযাত্রী এত কমে গেছিল যে মনে হত সারা দেশটাতেই বুঝি পাপী মজ্‌দক জাল বিছিয়ে ফেলেছে।

—যাক, আনন্দের কথা সেই পাপী ইরান থেকে বিদায় হয়েছে। স্ত্রী নিজের কথার উপর তেমন জোর না দিয়ে বললো। কিন্তু বৃদ্ধা সেই কথায় যেন আরও উৎসাহ পেয়ে যায়।

—সবই ভগবতীর কৃপা, মা। এখন আবার আগের মতই দেশে আনন্দ মঙ্গল হবে। কিন্তু আশ্চর্য, দেশের সকল জায়গায়ই যেন হাওয়া বদলে গেছিল। দাস দাসীরা পর্যন্ত হুকুম মানতো না। এমন কি ছোট জাতি গ্রামবাসীরাও বড় বড় বিস্পোহ্র (সামন্ত) ও বচুর্ক (ধনী-মানী) দের অবমাননা করতে সুরু করেছিল। আমার ত ভয় হয়েছিল। মনে হত দেশে আর চাকর বা দাস দাসী থাকবে না কখনও। কিন্তু ভগবতীকে কোটী কোটী ধন্যবাদ, আবার ধর্মরাজ্য স্থাপন হয়েছে। আর কারও কষ্ট হবে না, ইস্তখ্‌রে আর কোনও মজদকী পন্থী নেই।

—কোথায় গেছে তারা? প্রশ্ন করে অনাহিতা দুখ্‌ত।

—কোথায় আর যাবে। ভগবান পাপী ও বিধর্মীদের যেমন দণ্ড দিয়ে থাকেন তেমনি হয়েছে। এক মাস যাবত ভগবতীর মন্দিরের সামনে হাজার হাজার নরমুণ্ড টাঙ্গানো ছিল। এখনও এক সপ্তাহ হয় নি সেই সব পরিষ্কার হয়েছে। এখন আর মজদকের নাম

উচ্চারণ করবার মত একজনও নেই ইস্তখ্রতে। শুনছি মজদক নাকি কোনও কিরমানের হাতে মারা পড়েছে। তার কাটা মুণ্ডটা নাকি তস্পোনে শাহকে উপহার পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু ঐ পাপীর মুখ দেখা পাপ বলে শাহ না দেখেই তিগ্রার জলে ভাসিয়ে দিতে হুকুম দিয়েছেন।

—তাহলে ইস্তখ্রতে এখন সম্পূর্ণ শান্তিরাজ বিরাজ করছে?

হ্যাঁ, পুরোপুরি শান্তি। বারো বৎসর পর আবার নিশ্চিন্ত দিন এসেছে। আচ্ছা এখন তোমরা বিশ্রাম করো। কাল ভগবতী দর্শন করতে যেতে হবে।

* * * * *

ইস্তখ্রে অনাহিতার মন্দির কবে তৈরী হয়েছে, এ প্রশ্ন করলে দেশশুদ্ধ লোক শপথ খেয়ে বলবে পৃথিবী যখন আকাশ আর জলময় ছিল আর কিছুই ছিল না তখন থেকে এখানে ভগবতী বিরাজ করছেন। এর বৈভব সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, কারণ পৌনে তিন্‌শ বৎসর সাসানী রাজ্যের সকল ধনসম্পত্তি অনাহিতার সম্পত্তি বলে মান্য করা হয়। অর্তক্ষত্রের পিতা পাপক অনাহিতার প্রথম পুরোহিত ছিলেন। তবে তা বলতে এ বোঝায় না যে তাঁর পুত্র শাহনশাহ হবার পর থেকে অনাহিতার মহিমা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারও বহুকাল আগে থেকে অনাহিতা প্রসিদ্ধ ছিল। পাপক (বাবক) এর বংশ অনাহিতার পুরোহিত ছিল, সেই জন্যে পার্থিয় বংশকে পরাজিত করে সাসানী বংশের ভিত্তিস্থাপন করতে পূর্ব্বপুরুষদের এই পথ অর্দশীর'এর পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সেইজন্যে সাসানী বংশ নিজেদের সাম্রাজ্যকে অনাহিতার সাম্রাজ্য বলে মান্য করতো। অনাহিতার বিশাল মন্দির সৌন্দর্য ও বৈভবে অদ্বিতীয় ছিল। দেবগণের দ্বারা আনীত শত শত বিশাল পাষাণ স্তম্ভের উপর মন্দিরের ছাদ স্থাপিত। মন্দিরের ভিতরে বাইরে শত শত মূর্ত্তি মন্দিরের শোভাকে শতগুণে বর্দ্ধিত করেছে।

অনাহিতার মন্দিরকে ঠিক মন্দির বলা যায় না। তার বিশালত্ব দেখে তাকে একটা ভিন্ন নগর বললেই বোধহয় উচিত সম্মান দেওয়া হয়। সাসানী সিংহাসনে যতজন শাহ বসেছেন তারা প্রত্যেকেই মন্দিরকে নানাপ্রকারে বড় করে, অলঙ্কৃত করে নিজ নিজ কীর্ত্তিস্থাপন করেছেন। ফলে বর্ত্তমানে মন্দিরকে মন্দির বলা ভুল বরং একটা পৃথক নগর বলা যায়। অর্দশীর্ এর পর ১ম শাপুর এই মন্দিরের বিশালরূপ দিয়েছিলেন। তারপর তিন শাপু, পাঁচ বহরাম, তিন হোরমুজ্দ সেই বিশাল মন্দিরের সঙ্গে নতুন নতুন ইমারত যোগ করেছেন। লোকে বলে যজদ্গর্দ্ ২য়, অনাহিতার পুজোয় কার্পণ্য করেছিলেন বলে কেদারীয় হুনদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। মুখ্য মন্দিরের বিশাল দরজা শুধু সোনা ও রূপার তৈরী। তারপর মন্দিরের ভিতরের অন্যান্য গঠনকলা ও দ্রব্যসামগ্রীর কথা সহজেই অনুমেয়।

ভগবতী মন্দিরের ভিতরে যাবার আগে মুখে কাপড় বেঁধে নিতে হয়, যেন কারো অপবিত্র নিঃশ্বাস ভগবতীর গায়ে না লাগে। ভিতরের সকল রক্ষিকা ও পরিচারিকা নগ্ন হয়ে থাকে, কারণ ভগবতী স্বয়ং দিগম্বরা। মুখ্যমন্দিরের মাঝখানে ভগবতীর সুন্দর দ্বিভুজ মূর্ত্তি স্থাপিত। হাতে পায়ে সুবর্ণ-জটিত মণিমাণিক্য খচিত কঙ্কন, গলায় মহার্ঘ রত্নাবলী, অপূর্ব্ব ঢংএর কেশবিন্যাশ। মূর্ত্তিটি এমন মোহক যে একবার তাকালে চোখ নামানো যায় না। ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি দেখে মাহপত বললো,—মূর্ত্তি নগ্ন হলেও কোনও মহান শিল্পীর হাতে তৈরী। বামহাতে ফল ও ভোজনপূর্ণ থালা আর ডানহাতে পুষ্পগুচ্ছ কি চমৎকার মানিয়েছে। তাছাড়া বামদিকের স্থির ও ডান দিকের উঁচু চরণদ্বয় যেন সজীব। এমন সুন্দর ত্রিভঙ্গী ভাবময় মূর্ত্তি ইরানের আর কোথাও নেই। কিন্তু ঐ পরিচারিকাগুলি নগ্ন কেন ?

—ভগবতী স্বয়ং নগ্ন বলে তার পরিচারিকারাও নগ্ন।

—হুঁ! পরিচারিকাগুলিও যেন সজীব অনাহিতা। কুণ্ডলিত লম্বা কেশ, সন্তুলিত শরীরাবয়ব, কোমল মুখবিলাশ দেখে অনাহিতার প্রভাবে প্রভাবিত না হবার উপায় নেই। ধনুর্ধারিণী নগ্ন রক্ষিকা দের সারাদেশ থেকে বেছে বেছে আনা হয়েছে। কিন্তু ওদের ঐ সুন্দর যুগল ভ্রূ-ধনুক থাকতে আবার হাতে ধনুকের কি প্রয়োজন? তাছাড়া সংখ্যায় দু'দশটা নয়, শত শত। মন্দিরে যেন রূপের আপনবীথি সাজানো।

—আমার ভীষণ লজ্জা করছে। স্ত্রী পাশের দিকে তাকিয়ে দেখে দাসী দীনক খানিকটা দূরে এগিয়ে গেছে। নীচুস্বরে বললো —এসব পাপাচার, নির্লজ্জতা, পাপের প্রোৎসাহন দেওয়া। আমার ত বিশ্বাসই হয় না যে ধর্ম এতখানি পতিত হতে পারে।

—ধর্মের পতিত হওয়ার কথা আর বলোনা। আমি এর চেয়েও পতিত ধর্মস্থান দেখেছি। এখানে ত কমসে কম সুন্দর কলার দর্শন পাওয়া যায়। যবন শিল্পীরা শরীরের সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য অঙ্কিত করতে কত রকম উপায়ে পাষাণ গাত্রে মুর্ত্তি উৎকীর্ণ করেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি হিন্দদেশে স্বচক্ষে দেখে এসেছি মন্দিরে দেবতার স্থানে মানুষের নগ্ন লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করা। সেগুলি কি মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তিকে জাগানোর চরম প্রয়াস নয়?

—যদি তাই হয়, তাহলে সেখানে মানুষের প্রবৃত্তির ও ধর্মের চরম পতন বলা যায়। এখানে এই নির্জীব নগ্ন মূর্ত্তি ও সজীব নগ্ন পরিচারিকাদের দেখে লজ্জায় আমার মাটির মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে।

এরপর দর্শন পূজার সময় বৃদ্ধা এসে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়। বৃদ্ধা তার যজমানদের নিয়ে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে পূজা শেষ করে ভক্তিভরে প্রণাম করে। পূজার সময় বৃদ্ধা ও মন্দিরের হেরপত (মোহান্ত) মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ করলেন। অতঃপর ভগবতীর আশীর্বাদ নিয়ে ওরা পাশের ছোট ছোট মন্দিরগুলি পরিদর্শন

করতে থাকে। তারপর বিশাল অগ্নিমন্দিরে গিয়ে হোমকুণ্ডে চন্দনকাঠ ও অন্যান্য সুগন্ধি সামগ্রী দিয়ে পূজা নিবেদন করে।

যদিও দর্শন পুরোপুরি শেষ হয়নি, ওরা মুখ্য মুখ্য মন্দিরগুলি দেখেই নিবাসস্থলে ফিরে আসে। সম্পূর্ণ দর্শন করতে একদিন পুরো ঘুরতে হবে। সেটা বরং দু-চারদিন পর দেখলেও চলবে।

ঘরে ফিরে এসে মাহপত সহচরীকে প্রশ্ন করে,—

—অনাহিতার মন্দির এবং তার বৈভব দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে অনাহিতাই সাসানী বংশের বৈভবের রক্ষিকা। তাই কত দূর দূর দেশ থেকে এখানে দর্শক সমাগম হয়। সত্যিই এমন সুন্দর কলা কমই দেখা যায়।

—কিন্তু এ ত নগ্নতা। ঐ নির্জীব নগ্ন মূর্ত্তি ও সজীব নগ্ন পরিচারিকাদের দেখলে মনে কেমন করে ভক্তির উদয় হয় বুঝি না।

—অর্থাৎ তুমি ঐ দীনধর্মের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করছ। ওটার ঐ নগ্নতা না হয় মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে হরণ করেছে এবং মানুষের বুদ্ধির উপর আবরণ টেনে রেখেছে। কিন্তু সেই ভারতীয় মন্দিরগুলিতে নগ্ন শিশ্ন দেখে সকলের মনে ভক্তিভাব কি করে জাগে? যারা ভক্তিভরে পূজা করে। তাদের কি মনে হয়?

—মনে নিশ্চয় উদয় হয় তবে সেই চিন্তাকে ভক্তিনামক পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। এমন পুরুষ ত দেখিনা যে অনাহিতার মন্দিরের ঐ নগ্ন মূর্ত্তি আর নগ্ন পরিচারিকাদের দেখে বিনা মনো-বিকার নিয়ে ফিরে আসতে সমর্থ হয়। আমার মনে হয় মানুষের মনের সবচেয়ে নিম্নস্তরের চিন্তাধারাকে উত্তেজিত করতে ধর্মের নামে এই জাল বিছানো হয়েছে।

—কিন্তু এ মনে কোরোনা যে এখানকার ভগবতী ঐ মগপতদের অর্থাৎ ধর্মযাজকদের তৈরী। এ মূর্ত্তি বহু পুরোনো, আজ থেকে পাঁচ হাজার বৎসর আগেও তিগ্রা ও ফ্রাতের উপত্যকা অঞ্চলে ঐ ভগবতীর পূজার প্রচলন ছিল। ঐ ধর্মযাজকদের সূর্যদেবের

পূজা ভগবতী পূজার কাছে নেহাত খেলা মনে হত, তাই ওরা অনাহিতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। ভগবতীকে ইরানীয় অহুর্মজদা ও ছয় অমস্যাস্পন্তানের চেয়েও জাগ্রত মান্য করা হয়। আজ বহুমন, অশাবহিস্ত, ক্ষত্রবীরিয়, অর্মায়তী, হুরতাত, অমরতাত, ও স্পেস্তামেন্যু প্রভৃতি সকল দেবতাদের তেজ ভগবতীর কাছে আবছা হয়ে গেছে।

—অতখানি প্রশংসা করোনা, আমার বিচারে মানুষের বিবেক চক্ষুতে ধুলো নিক্ষেপ করবার একটা প্রকৃষ্ট উপায় এটা।

—যাই বলো, ভারতীয় পুরোহিতদের তুলনায় এরা কম ধুলো ছুড়ছে এটা বলতেই হবে। এখানে তবু কিছুটা শিল্পচাতুর্যের নিদর্শন রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

।। মানব ।।

পাঁচ মাস পরের কথা। এই সময় মাহপত আর অনাহিতা দুখ্‌তকে ইস্তখ্‌রের অন্য একজায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। নগরের এক কোনে ছোট একটি বাগানবাড়ী। বাড়ীর চারদিকে কাঁচামাটীর প্রাচীর। তার মধ্যে চমৎকার ফল ও ফুলের বাগান। দ্বার ও দালানের মাঝে জলকুণ্ড, তার চারদিকে নানাপ্রকার ফুলের গাছ। দালানের হালকা দরজা খোলাই থাকে। দরজার পাশ দিয়ে চওড়া বারান্দা লম্বা হয়ে চলে গেছে এবং বারান্দার দুইধারে পরিষ্কার বড় বড় কামরা। দালানের শেষ দিকে কেয়ারী করা ফুলগাছের মাঝে বসবার জন্য বেদীকা। বাড়ীটা দেখলেই বাড়ীর মালিকের রুচীর কথা মনে পড়ে আশ্চর্য হতে হয়। বাড়ীর স্বচ্ছতাই নয় শুধু, ঘর গুলির উপযোগিতা, আলোবাতাস এবং শীত গ্রীষ্মের পার্থক্য অনুসারে প্রয়োজনের রীতিমত খেয়াল আছে বলতে হবে।

যাত্রীদ্বয়ের এমনি একটা বাড়ীর প্রয়োজন ছিল, কারণ তাদের ব্রতের নিয়ম অনুযায়ী এক বৎসর যাবত প্রতিদিন একবার ভগবতীর দর্শন ও পূজা করতে হবে। বৃদ্ধার সহায়তায় কোন এক সামন্তের এই বাড়ীটি তারা পেয়েছিল। বৃদ্ধার ইচ্ছা এই যাত্রী দুজন তার পুত্রের না হয়ে তার নিজের যজমান হয়ে থাকুক। তাই পুত্রের ফিরে আসার আগেই নিজে নির্জনে এই বাড়ীটা খুঁজে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যাত্রীরাও এখানে নিশ্চিন্তে বাস করছে। অনাহিতা দুখ্‌ত সবচেশে খুশী হয়েছে এমন পরম নিশ্চিন্ত একটা পরিবেশ পেয়ে।

দুপুরবেলা বাড়ীর পিছন দিকের একটা ঘরে রেশমী কালীন আর

মখমলী মসনদে বসে অনাহিতা কোনও গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। আজ অবশ্য অনাহিতার সেই বেশ নাই যে বেশে প্রথমদিন ইস্তখ্র নগরীতে এসেছিল। আজ তার পরণে রেশমী ঝালর দেওয়া পায়জামাও কঞ্চুক। আভূষণ অল্প হলেও সুন্দর ও বহুমূল্য। চোখে সূক্ষ্ম অঞ্জন, ভ্রূলতা উপর দিকে কামানের আকৃতিতে টানা। অনাহিতার অধর যুগল এমনিই রক্তবর্ণ।

আজ অনাহিতাকে দেখলে মনে হয় সে বিশেষভাবে নিজেকে সাজিয়েছে, কিন্তু তার মনে যেন কিসের একটা দুশ্চিন্তার ছাপ। চোখে জল নেই তবু যেন করুণভাব।

মাহপত এতক্ষণ বাইরে ছিল। ভিতরে আসতে দরজার পর্দা টানবার শব্দেও অনাহিতাকে সচেত হতে না দেখে মাহপতের মন বিষণ্ণভাব ধারণ করে। মাহপত চুপচাপ ভিতরে চলে যাচ্ছিল এমন সময় অনাহিতার দৃষ্টি পড়ে সেই দিকে। মাহপতকে দেখে অনাহিতার মুখে হাসি ফোটে। অনাহিতা মাহপতের কাছে এসে দাঁড়াতে মাহপত তাকে আদর করে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। অতঃপর ধীরে ধীরে অনাহিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মসনদের উপর বসিয়ে দেয় ও নিজে বসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলে,

—এমনভাবে একলা থাকতে তোমার মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। আমি অনুভব করতে পারি তোমার বেদনা।

—মাহ! আমি অনেক চেষ্টা করি যাতে এমন না হয়।

—আর সে চেষ্টায় তুমি বেশীরভাগ সফল হয়ে থাকো। তবুও মানুষের মন ত আর পাথর দিয়ে তৈরী নয়।

—ঠিক বলেছ। মানবমন ফুলের চেয়েও কোমল। তবুও আত্মসংযম ও ধৈর্যধারণ করা সকলের কর্ত্তব্য। এ ছাড়া মানুষের কোন কাজই সফল হয় না। আমাদের কাজ তো আরও কঠিন কাজ। আজ ছয়মাস হয়ে গেল এখনও ভবিষ্যতের কোনও রাস্তা

দেখতে পাচ্ছিনা। অনাহিতার শেষ কথাগুলির মধ্যে উদাস ভাব লক্ষ্য করে মাহপত।

—ভবিষ্যতের রাস্তা সবই ঠিক আছে, তবে তার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে ধৈর্য ধরে। মাত্র একবৎসর হয়েছে অমন ভীষণ ঝড় আমাদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। যদিও আমাদের পা মাটি থেকে সরে গেছে তবুও সেই মাটির কোলেই পড়ে আছি। ঝড়ে আমাদের ক্ষতি হয়েছে কিন্তু সর্বনাশ হয়নি।

—সর্বনাশ হতে পারে না কারণ আমাদের উদ্দেশ্যকে যারা পূর্ণ করবে তাদের সবল হতেই হবে এবং তারা সংখ্যায়ও অনেক।

মাহপত অনাহিতাকে আরও কাছে টেনে নেয়। মাথা নিচু করে অনাহিতার চুলের সুগন্ধ অনুভব করে।

—সবল ত নিশ্চয়। তোমার আজকের এই বেশ দেখে কেউ কি বলতে পারবে যে এই বিলাস বিলাসের জন্য নয়, কোনও কঠোর কর্ত্তব্য পালন করবার প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র।

—হ্যাঁ মাহ! পূর্ব্ব জীবনে সাজ-শৃঙ্গার করতে বাধ্য হতাম। তবুও সাধ্যমত সেই শৃঙ্গারকে যতখানি সম্ভব বিনীত ভাব বজায় রাখতাম। কিন্তু আজ তার চেয়ে অনেকগুন বেশী সাজ-সজ্জা করেছি।

—এত না বললেও আমি বুঝতে পারি। আমি কখনই অহুর্মজ্‌দ বা ভগবানে বিশ্বাস করিনা। কারণ মানুষের সঙ্গে এমন কিছুই ন্যায় বিচার তিনি করেননি। যদি বিশ্বাস করতাম তাহলে বলতাম, যে বিধাতা কম করে লক্ষ বৎসর অভ্যাস করবার পর তোমার মত অতুলনীয় রূপসৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তোমার স্বাভাবিক রক্ত অধর, কোমল অরুণ কপোলে কোনও অধর রাগ বা মুখচূর্ণের প্রয়োজন হয় না। চপযষ্টি সদৃশ ভ্রুতে শৃঙ্গার করবার দরকার হয়না, তোমার ঐ মৃগনয়নে অঞ্জনের প্রয়োজন হয়না, ঐ স্বর্ণ-কেশী বেণীতে দরকার হয়না কোন স্বর্ণ বলয় পরাবার।

—আমিও কৃত্রিম সাজ সজ্জার প্রয়োজন মনে করিনা। তবুও অবিশ্বাসী মন মানতে চায়না। কর্ত্তব্য কত কঠিন।

—অনাহিতা! মাহপত অনাহিতার কাঁধে ও কবরীতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,—তোমাকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। তোমার এই অসাধারণ রূপ ও সজ্জা আমাদের কঠিন কার্যোদ্ধারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। তোমার মধুর কণ্ঠ সঙ্গীত ছাড়াও সঙ্গীতময় মনে হয়। তাছাড়া সময়ও আমাদের অনুকুলে আসছে। অনাহিতা অধীর ভাবে পিছন ঘুরে মাহপতের চোখে চোখ রেখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

—আমাদের সময় কি এসে গেছে? আমাদের প্রতীক্ষার কি শেষ হয়ে এসেছে? চিন্তা করোনা, আমি আরও দু বছর স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে পারবো যদি জানতে পারি যে আমাদের কাজের সময় আসছে।

—নিশ্চিন্ত হও অনাহিতা, আমাদের কাজের সময় এসে গেছে। প্রায় একবৎসর হল সবে ঝড় থেমেছে। ঝড় থামবার পর সন্দেহের প্রবাহ চলা স্বাভাবিক। তবে এখন আমাদের শত্রুরা নিশ্চিন্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে। তারা ভেবেছে হয়ত আমাদের সহকারী সকলে সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। কেউ হয়ত জীবনে মরেছে আর বাকী সকলের বিচার ধারা বদলেছে, এই তারা ভাবছে, কিন্তু আসলে তার ঠিক উল্টো। এই ইস্তখ্রতেই নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল হাজার হাজার সহকারী রয়েছে আমাদের। একটা কেন হাজার বার ঝড় এলেও এদের উচ্ছেদ করা অসম্ভব। এ আদর্শ অমর, মহান। এ জনকল্যাণের জন্য সর্বোৎসর্গ করা। একে উচ্ছিন্ন করবার শক্তি কারও নেই। এই দাসী দীনককে ত দেখছ, যখন আমরা প্রথম ইস্তখ্রে এসেছিলাম, তখন ওকে তোমার কি মনে হয়েছিল?

—সাধারণ, নির্বোধ গ্রাম্য বালিকা।

—আমাদের লোকেরা এইভাবে শত্রুর অগোচরে থেকে কাজ

করে যাচ্ছে। ঝড়ের ধুলো যখন ভূমিতে এসে আশ্রয় নেয় তখন যেমন আবার সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায় তেমনি আমাদের ভাইরা কোথাও চুপ করে বসে নেই। সকলেই আমাদের মত ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শুধু শত্রুদের নিশ্চিন্ত হবার অবসর দেবার প্রয়োজন ছিল, এখন তারা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

—এখনও আর কতদিন আমাদের ইস্তখ্র থাকতে হবে?

—সে ত তুমি জানো। তুমিই ত বলেছ যে আমাদের ব্রতের নিয়মানুযায়ী এক বৎসর আমরা এখানে থাকবো।

—আচ্ছা যেতে দাও ওসব কথা। কিন্তু বুড়ী না জেনেও আমাদের অনেক উপকার করেছে।

—অজান্তে, কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে নয়। এত দক্ষিণা বোধ হয় ওর জীবনে কোনও যজমানের কাছে পায়নি। এই সকল অর্থ বুড়ী নিজের কাছে রাখে। তার বদলে ইস্তখ্রে এমন কোনও বস্তু নেই বুড়ীর দৌলতে যা আমরা উপভোগ করিনি। যদিও দেড়গুণ মূল্য নিয়েছে, কিন্তু সেটা ওর ব্যবসা। তবে ও যখন বিধর্মী কবাতের সম্বন্ধে যা তা বলে তখন অসহ্য লাগে শুনতে। অবশ্য আমাদের এই প্রতীক্ষার দীর্ঘ সময় কাটাতে বুড়ীর উপযোগিতা স্বীকার করতেই হবে।

—আমাদের প্রতীক্ষার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের তপস্যা অচিরাত ফলবতী হতে চলেছে। পাতা ঝরবার আগেই আমাদের ইস্তখ্র ত্যাগ করে যেতে হবে। ঐ শোন বাগানের কাছ থেকে বুড়ীর গলার স্বর শোনা আছে। দীনককে বোধ হয় কোন পাত্রের জন্য বকছে। চলো মন্দিরে যাই।

—মন আর মানছে না। আত্মগোপনের চেয়ে কঠিন তপস্যা বোধ হয় আর নেই।

—হ্যাঁ বড়ই কঠিন তপস্যা। চলো যাই।

কিছুক্ষণ পরে মাহপত আর অনাহিতা বুড়ীর সঙ্গে মন্দিরের

উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। অনাহিতাকে আজ খুব প্রসন্ন দেখা যায়। মাহপতের কথানুযায়ী ওদের প্রতীক্ষার দিন শেষ হয়ে এসেছে। এই সপ্তাহটা মাত্র বাকী। চলতে চলতে অন্দর্জগর সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা বলতে বলতে যগিয়ে যায় মন্দিরের দিকে।

—সত্যিই মাহ! এতদিনে কতই না পরস্পর বিরোধী বস্তু চোখে দেখলাম। যদি চোখে না দেখতাম তাহলে বিশ্বাস করতাম না কখনই। ভাবনে পারতাম না যার সারা জীবন ব্যসনে লালিত হয়েছে, বিলাসর মধ্যেই যার জন্ম, সেই মানুষ কঠিন থেকে কঠিনতর কাজের জন্য কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হয়েছে কেমন করে।

—হৃদয়ে আগুন লাগিয়ে দাও। তারপর দেখো নেভাবার চেষ্টা হবেই হবে।

—ঠিক বলেছ। অন্দর্জগরের বাণী কত মধুর। মনে হয় হাজার ঘড়া মধু দিয়ে ধূয়ে তৈরী করা এক একটা কথা। শুধু সেই কথা দিয়েই পাথরের মত শক্ত হৃদয়কে তিনি অনায়াসে মোমের মত নরম করে ফেলেন। কবাতকে দেখলে ত, মাত্র দুবৎসরের মধ্যে অন্দর্জ-গরের শিক্ষা তাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছে।

—হ্যাঁ অনাহিতা! তিনি ভীষণ কঠিন পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছেন।

—তাছাড়া কি রকম ভবয্যদ্বাণী করে ওরা লোকের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের বিরোধী নয় যারা, তারাও বলতে সুরু করে-ছিল যে বামদাতপুত্র স্ত্রী পুরুষের সমানতা এবং তাদের সম্বন্ধের মধ্যে অধিক স্বাচ্ছন্দতা স্বীকার করে ভুল করেছেন। এতে ওরা লোককে লম্পট হওয়ার সম্ভবনাই করছিল।

—ওদের ধারণাই ভুল। ওরা এটা উপলব্ধি করতে পারে না যে বাইরের শাষনের চাপে স্বীকার করা নিয়মের চেয়ে মনের স্বীকার করা নিয়ম বেশী দৃঢ় ও আচরনীয় হয়ে থাকে। আজকের পৃথিবীতে অবশ্য সেই নিয়মই চলে আসছে যার ভিতরে বাইরে এক নয়।

—ঠিক বলেছ মাহ। এখানকার মানব-সন্তানকে শিশুকাল থেকে সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়, বাইরে থেকে এমন ভাব দেখাও যা তোমাকে ধার্মিক বলে পরিচয় দিতে পারে, ভিতরে যা খুশী তাই করো কে আর দেখছে। প্রথম প্রথম অবশ্য আমিও ঠিক বুঝতে পারতাম না। পরে অন্দর্জগরের শিক্ষার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি। পৃথিবীতে দুই প্রকার সদাচারের দরকার নেই, এতে মানব জাতির কখনও কোনও সুফল ফলেনি এবং ফলবেও না।

—তাছাড়া পুরুষ-স্ত্রী কে সমানভাবা ত রীতিমত ন্যায়। মোট কথা আমাদের মানব সমাজের জন্য কাজ করতেই যখন হবে, তখন কেন উভয়েই অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষে মিলে সেই বোঝা ভাগ করে নিই না। কিন্তু স্ত্রীকে আমরা নিজেরাই দুর্ব্বল করে রেখেছি। ওদের আমরা ভাবি পরগাছা লতার মত, যারা অন্য গাছকে আশ্রয় না করে বেঁচে থাকতে পারে না। তুমিই বলনা, আজ যদি তুমি তেমনি পরাশ্রয়ী লতার মত হতে, তাহলে এত বড় ভয়ানক কর্ত্তব্য পালনে হাসিমুখে এগিয়ে আসতে পারতে কি ?

—সাধারণ জনতা এই বিচারের আসল অর্থ বুঝতে পারেনা, তাদের মধ্যে অল্প কথায় বিশ্বাস স্থাপন করাতে সুবিধে হয়।

—তাত হয়ই, রাজা তার অযোগ্য পুত্রের পক্ষপাত করে, ফলে রাজ্যের বিনাশ হয়। মগোপত, দপেহ্, অস্পাহপত সকলেই চায় তাদের পুত্ররা সকল কাজে অগ্রাধিকার লাভ করুক, তা সে যোগ্য হোক বা না হোক। যতদিন মানব সমাজে আমার-তোমার ভাব কায়েম থাকবে ততদিন এই রকম হবেই। এই জন্য সবচেয়ে উত্তরদায়ী ব্যক্তিদের উচিত তারা তাদের নিজ নিজ সন্তানদের মধ্যে আপন পর নীতি তুলে দিক।

—শুনেছি রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সম্বন্ধে যবন বিচারক প্লাঁতো এমনি কথাই বলছেন।

—হ্যাঁ, আমাদের অন্দর্জগরের নীতি এমন কিছু তাঁর মনগড়া

নয়। তিনি বুদ্ধের সিদ্ধান্তিক আদর্শ সমাজ' এর সঙ্গে প্লেঁতোর অধিক ব্যবহারিক রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন আপন পর চিন্তাকে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সকল বিচারকরাই হানিকারক বলেছেন। মানুষ তার সকল শক্তি তখনই জনকল্যাণের কাজে লাগাতে পারে, যখন তার মধ্যে আপন পর ভেদ ভাব না থাকে।

—বুদ্ধদেবও তাই বলেছেন যা বলেছেন প্লাতোঁ, কিন্তু ওরা নিজেদের আদর্শকে সমগ্র সমাজে স্বীকৃত করাতে পারেন নি।

—কারণ বোধ হয় তারা জনসাধারণকে তেমন বিশ্বাসের চোখে দেখতেন না।

—আমাদের অন্দর্জগরও সাধারণ জন পর্যন্ত এই উপদেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে যারা সে উপদেশ মেনে নিয়েছে, বিশ্বাস করেছে, তাদের কাছে ঠকিনি আমরা। অশিক্ষিত মজুর এবং দাসবর্গ পর্যন্ত আমরা সকল স্বার্থত্যাগ করতে দেখেছি। অপরের জন্য হাসতে হাসতে নিজেদের প্রাণ বলি দিয়েছে তারা। ঐ সকল নিম্ন-শ্রেণীর লোকের পক্ষে কি এসব সম্ভব ?

—না, অনাহিতা। গত দুর্ঘটনাই আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে আমাদের অন্দর্জগরের শিক্ষা শুধু সুন্দরই নয়, ব্যবহার্যও বটে। আপন-পর ভেদ নীতি শুধু নিজ উপাসকদের ত্যাগ করতে বলেছেন বুদ্ধদেব, এবং তাদের স্ত্রী দর্শন পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন স্ত্রী পুরুষের পক্ষে সাপ বিশেষ। একবার কামড়ালে তার সত্যকার জীবনলাভ অসম্ভব। কিন্তু আমাদের অন্দর্জগর বলেছেন, মানুষের মধ্যে কিছুটা অংশ পশু রয়েছে, যাকে ইচ্ছা করলেও সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা যায়না। মানুষকে জীবন ধারণ করতে হলে আহার করতেই হবে, নিদ্রা যেতেই হবে এবং আত্মরক্ষার কথাও চিন্তা করতে হবে। মানুষ স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারবে না, অবশ্য তার তেমন প্রয়োজনও হয়না। এ ছাড়া আরও কিছু এমন আছে যা মানুষকে পশুত্ব থেকে উপরে

উঠিয়ে রাখে। *অন্দর্জগর বলেছেন জনজীবনের জন্য মানুষের মনে অপার সহানুভূতি, অপার করুণা এবং বাচিক তথা কায়িক দিক থেকে নিজের জীবনে ব্যবহার প্রভৃতি মানুষকে পশুত্ব থেকে মুক্ত করে।

— হ্যাঁ মাহ! আমি স্বচক্ষে দেখেছি মানুষকে পশুত্ব থেকে বহু উঁচুতে উঠতে। অন্দর্জগর তাঁর প্রথম শ্রেণীর অনুগামীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ প্রথা বন্ধ করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং সে উপদেশ কার্যকরীও হয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে বিনা সম্বন্ধে আপন-পর ভেদ ত্যাগ করতে সফল হয়েছে। যদি শুধু কামবাসনা এবং বিলাসিতার জন্যেই এই সব করা হয়ে থাকত তাহলে বোধ হয় তাদের দিয়ে অতবড় বিরাট আত্মত্যাগ করতে দেখা যেত না যা ইরানের কোনে কোনে আমরা সকলে দেখেছি।

—অনাহিতা! প্লাতোঁ এবং বুদ্ধ এই আপন-পর নীতিকে সবচেয়ে বড় ব্যাধি বলেছেন। কিন্তু তাদের সময়ে তাদের উপদেশ ততখানি কার্যকরী হতে সুযোগ পায়নি যতখানি আমাদের সময়ে হচ্ছে। ইরানের এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট এই কথাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মানুষ এবং পশুতে বহু প্রকার উভয় সামান্য গুণ থাকা সত্বেও মানুষের স্থান সবচেয়ে উঁচুতে। অন্দর্জগরের অনুগামীরা এই ভেদ-ভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে বলেই তাদের নিজেদের মধ্যে অধিক আত্মীয়তা, সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছে। বন্ধনের আত্মীয়তা, স্বার্থের আত্মীয়তা বিশ্ব-বন্ধুত্বের আত্মীয়তা। সঙ্কীর্ণ ভেদ-ভাব ভুলে আমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তা স্থাপন হয়েছে, তাতে আমরা আর কখনও ঈর্ষাদ্বেষের বশীভূত হব না। আমরা মানুষের নির্ব্বলতার মধ্যেই তাদের মহানতাকে চিনে নিতে পারছি। অবশ্য অন্যান্য ধর্মের বিচারানুসারে স্ত্রী-পুরুষের যে উজ্জ্বল সম্বন্ধ মানা যায়, তাতে স্ত্রীকে পুরুষের সম্পত্তি হবার ধারণা কি রকম কার্যকরী হয়?

—মাহ! একথা ত আমরা অর্থাৎ স্ত্রীরাই বিশেষ করে অনুভব করতে পারি। পুরুষ স্ত্রীকে সম্পত্তি বলে ভাবে। এইসদাচার ও ভব্য

আদর্শের মধ্যে স্ত্রীদের নিজ অধিকার বা ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র নেই।

—অন্দর্জগর মানুষের সকল পরতন্ত্রতার পর কুঠারাঘাত করতে চান। তিনি এই পৃথিবীতে এমন এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সঙ্কল্প করেছেন, যাতে পশুত্বভাব সবচেয়ে কম এবং মানবতাভাব সবচেয়ে বেশী থাকে। শুধু স্ত্রী-পুরুষের ভেদভাব নয়, পুরুষ-পুরুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্গ ও ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ স্থাপিত রয়েছে, অন্দর্জগর সেগুলিকেও উপড়ে ফেলতে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। দেখছ ত, ইরানে জাতি সমূহের কত পার্থক্য ?

—এই সব দেখে আমি কখনও কখনও বিচ্ছিন্ন চিন্তার ফাঁদে পড়ে যাই, মগের পুত্র মগ হবে, পুরোহিত হবে, ন্যায়াধীশ হবে। আর বিস্পোহ্ অর্থাৎ সামন্তদের পুত্র শুধু সামন্ত হবে, সেনা সঞ্চালন করবে। তাছাড়া বচুর্ক, দপেহ্ এবং অন্যান্য বর্গের সন্তানদের ও সেই সেই শ্রেণীর বিভিন্ন কাজের জন্মগত অধিকার স্থায়ী থাকবে। যে বর্গের সন্তান, সেই বর্গের বাইরে গিয়ে কোন ব্যবসায়, কোনও কাজ করতে পারবে না এটা খুবই অন্যায়।

—না অনাহিতা। এই প্রথা শুধু ইরানেই নয়, হিন্দেও আছে। সেখানেও জন্মের থেকে ব্যবসায়িক অধিকার ভাগ করে দেওয়ার নিয়ম আছে। ভারতবর্ষেরও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অতিশূদ্র প্রভৃতি জাতিভেদ প্রথা রয়েছে। এখানকার মত সেখানেও একে অপরের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে না। শুধু তাই নয় একে অপরের হাতের অন্ন গ্রহণ পর্যন্ত করবার অধিকারী নয়। ইরানে ত শাহ নিজে বিশেষ অবস্থায় যে কোনও লোকের জাতিকে বদলে দিতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষে সে বিষয়ে ভীষণ কড়া নিয়ম।

অনাহিতা লম্বা শ্বাস ফেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে,—মানবতাকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।

—যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন এবং যারা নিয়ে যাবে তারা কখনই মানবতাকে বঞ্চিত করবে না।

নবম অধ্যায়

। যাত্রা ।

কারেন নদীর তীরে এই ছোট্ট পান্থশালায় সারাদিনের পরিশ্রান্ত পথযাত্রী রাত্রিকালে বিশ্রাম করে পথক্লান্তি দূর করে। তম্পোন থেকে ইস্তখ্র যেতে সোজা রাস্তা যদিও এখান থেকে যায় না, তবুও ভারত ও চীন দেশের যাত্রীরা বেশীর ভাগই এই রাস্তা বরাবর দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে যাতায়াত করে। রাস্তার কাছে ছোট একটা বস্তী। পান্থশালা আরও অনেক দূরে। এখানে শুধু যাত্রীদেরই থাকবার ব্যবস্থা নেই, তাদের ঘোড়া, উট, গাধা, খচ্চর প্রভৃতি পশুদেরও থাকবার ব্যবস্থা আছে। পাহাড়ী ভূমি। ইরানের অধিকাংশ পাহাড়ী অঞ্চলের মত এখানকার দিগন্তও বৃক্ষ-বনস্পতি শুন্য। এই পথে অধিক ধনীরা কমই যাতায়াত করে। কখনও কখনও কেউ যদিও আসে, তারা পান্থশালার অতিথি হয় না। তাদের নিজেদের সঙ্গে তাঁবু থাকে। ছোট ছোট রাজকর্মচারীরা গ্রামের প্রভুদের বাড়ীর অতিথি হয়। পান্থশালার একদিকে কয়েক খানা ঘর আছে বিশেষ ধরণের কোনও অতিথিদের জন্য। বাইরেও খোলা ঘর আছে অনেক ; যেখানে বেশীর ভাগ গরীব ও ভিখারীরা আশ্রয় গ্রহণ করে।

আজ এখানে গরীব যাত্রীদলের কয়েকটি ছোট ছোট দল আশ্রয় নিয়েছে। দলের মাঝখানে ছোট ছোট আগুনের কুণ্ডলী। যদিও শীতকাল শুরু হয়নি এখনও, তবুও শীতের পরশ এসেছে।

কিছুদূরে একটি অগ্নিকুণ্ডলীর সামনে একটী স্ত্রী ও দুটি পুরুষ বসে নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা বলছিল। এমন সময় জীর্ণ বসন পরিহিত আর একজন পুরুষ সেখানে এসে উপস্থিত হয়। আগন্তুক বসবার

অনুমতি নিয়ে পিঠ থেকে বোঁচকা নামিয়ে একটা কম্বল পেতে তার উপর বসে। লোকটার কথা শুনেই বোঝা যায় সে ইরানী নয়। আগন্তুককে লক্ষ্য করে একজন পুরুষ প্রশ্ন করে,—ভাই তোমাকে দেখে মনে হয় তুমিও বোধ হয় আমাদের মত বিদেশী। যদি কোনও বাধা না থাকে তাহলে তুমি কোথা থেকে আসছ বল। আগন্তুক যেন এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। প্রশ্ন শুনে তার বাদামী রংএর দাড়ীতে হাত বোলাতে বোলাতে বল্ল,—তোমার অনুমান ঠিক বন্ধু। আমি সোগ্দ দেশের অধিবাসী। বহুদিন যাবত ইরানে বেড়িয়ে ফিরছি, অর্থাৎ বর্তমানে ইরান সোগ্দ সবই সমান আমার কাছে। দুই জায়গার কোথাও আমার কেউ নেই।

সোগ্দী কথা বলতে বলতে বুকের কাছে চুলকাবার ছল করে কঞ্চুকের একটা দিক এমন ভাবে সরিয়ে দেয় যেন সেদিকে কারও দৃষ্টি পড়ে। উপস্থিত পুরুষ সেই দিকে তাকিয়ে একটি লাল রংয়ের চিহ্ন দেখে তার সাথীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতঃপর পুরুষটি কথার রেশ টেনে বলে,—হ্যাঁ ভাই, এ পৃথিবীতে কার কোথায় ঠিকানা। ঘর দুয়ার ত ছোট খাটো জিনিষ, রাজ্য এবং রাজবংশ পর্যন্ত লোপাট হয়ে যেতে দেখেছি। তরুণ তার ঝোলা থেকে একটা মোটা রুটি ও কিছু আঙ্গুর বার করে সামনে রেখে বললো,—মনে হচ্ছে আজ বহুদূর থেকে আসছ তুমি। খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়। অতএব যদি আপত্তি না থাকে তাহলে কিছু খেয়ে একটু জল খাও। রাত ত নিজেদের হাতে কথা চলতে থাকবে। আমরা উত্তর দিকে যাবো, যদি ওদিকে যেতে চাও ত আমাদের সঙ্গে তিন থেকে চার হয়ে চলো।

সোগ্দী পুরুষ কথার ছলে চোখ বাঁকিয়ে আড় নজরে তরুণ এবং তার স্ত্রীর দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল।

—বহুত ধন্যবাদ ভাই! আজ আমি দেড় দিনের রাস্তা একদিনে পূর্ণ করে এখানে এসে পৌঁছেচি। তাড়াতাড়ি করতে গেলে খাওয়ার চিন্তা থাকে না। আমি যাব গুন্দেশাপুর। দেরী হয়ে গেল, নইলে

আজই পৌঁছে যেতাম। কথা শেষ করে সোগ্দী তার ঝোলার মধ্য থেকে কিছু শুকনো মেওয়া, ভাজা গম ও এক কুতূপ মদিরা বার করে সামনে রেখে বলে,—আজকের এই মিলনোৎসবে সোগ্দী ভিখারীর তরফ থেকে নতুন সাথীদের জন্য এই সামান্য খাবার উৎসর্গ করছি। আশা করি আমার সাথীরা এইটুকু গ্রহণ করবে। সোগ্দী কুতুপ থেকে কিছু মদিরা একটা কাঠের চষকে নিয়ে নিজে পান করে কুতুপটা সামনে এগিয়ে দেয়। অতঃপর তরুণী তিনটি কাঠের চষক বার করে তিনজনকে মদিরা ভর্ত্তি করে দেয়। তারপর একখণ্ড মাংস বার করে সোগ্দীর সাথীকে উদ্দেশ্য করে বললো,—আপনি যদি একটু ধীরে ধীরে পান ভোজন করেন, তাহলে এখুনি আমি এই বৎসতরের মাংসটা প্রস্তুত করে দিই। সোগ্দী ভিখারীর চোখে মুখে প্রসন্নতা ভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

—লাল দ্রাক্ষার মদিরা আর বৎসতর'এর মাংস, এর চেয়ে উপাদেয় ভোজন স্বর্গেও দুর্লভ। আমি অবশ্যই প্রতীক্ষা করব।

অতঃপর তরুণী একটি পাত্রে মাংস খণ্ডকে টুকরা করে কেটে তিনটি পাথরের টুকরো জোগাড় করে তার উপর চাপিয়ে দেয়। পুরুষ তিনজন আবার কথা বার্ত্তা সুরু করেছে। তরুণী মাংস চাপিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সোগ্দী ভিখারী বলছিল,—মুসাফির জীবন খুবই কঠোর হয়ে থাকে। কত নরম-গরম কড়া মিঠা অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তার অন্ত নেই। কিন্তু আমার কাছে খুব আকর্ষক ও আনন্দদায়ক লাগে এ জীবন। আজ ত্রিশ বৎসর আমি ঘর ছাড়া।

—সেই সময় তুমি নিশ্চয় খুব ছোট ছিলে?

—মাত্র ষোলো বৎসর। নীড় ভেঙ্গে যেতেই পাখীর স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াবার রাস্তা পরিস্কার। সোগ্দীর ভাগ্যে ভাঙ্গাগড়া সেই থেকে সুরু। তাছাড়া সমস্ত সোগ্দ দেশের ভাগ্যেরও কোনও ঠিকানা নেই। উত্তরের তাঁবু ওয়ালারা ত দিনরাত তাক করে বসে আছে।

—হ্যাঁ, ওদের প্রথম প্রহার সোগ্দীদের উপরই পড়ে। তারপর আসে ইরানের উপর, তবুও তারা অজেয়। এই ত বেশীদিন হয়নি আমাদের ২য় যজ্দগর্দ ওদের হাতেই ত নিহত হলেন। কথার ছলে সোগ্দী স্ত্রীর দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। আগুনের লাল শিখায় স্ত্রীর হাতের দিকে লক্ষ্য রেখে বলে,—সোগ্দী শিশু মায়ের দুধ খেতে খেতেই তরবারী খেলা শেখে। সোগ্দী তরুণীর কোমল হাত আর সরু আঙ্গুলের কোনও মূল্যই নেই। শক্ত সামর্থ্য হাত তাদের রক্ষা করতে সাহায্য করে। কোমল হাতের কথা শুনে স্ত্রী তাড়াতাড়ি নিজের হাত কঞ্চুকের ভিতর লুকিয়ে ফেলে সকলের দৃষ্টিকে লুকিয়ে।

—ধন্য সোগ্দী ললনা। বলল একজন সাথী। তাদের বীরত্বের কাহিনী সুদূর ইরানের লোকও জানে। অর্মনীতেও লোকেরা সোগ্দী বীরদের জয়গান গেয়ে থাকে।

—অর্মনীরাও সত্যিই বীর। সোগ্দীদের যেমন উত্তর দিকের ঘুমন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়, তেমনি অর্মনীদেরও তাদের উত্তরের ঘুমন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়।

—তুমি অর্মনী দেশ দেখেছ?

—দেখার কথা কেন বলছ। গত ত্রিশ বৎসর যাবত আমার পায়ে সর্বদাই চাকা লাগানো হয়েছে। একদিনও বিশ্রাম দিইনি পা দুটোকে। অর্মনী খুব ভাল করে দেখেছি, ইবর দেখেছি এবং সেখানকার গগনচুম্বী হিমাচ্ছাদিত পর্ব্বত দেখেছি। তেমন পর্বত অবশ্য আমাদের দেশেও দেখা যায়। হিন্দুদের হিমবন্ত পর্বতও দেখবার মত। সুন্দর এবং বিশাল। আমার ত সব সময় সেই সকল জায়গায় থাকতে ইচ্ছা করে। তাদের শিখরগুলি যেমন চিরতুষারময় তেমনি তাদের কটিদেশ চিরহরিত বৃক্ষরাজি শোভিত। দেখলে মনে হয়, সে যেন নিজেই দর্শকদের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে। যদি থাকতেই হয়, তাহলে সেই সকল জায়গায় থাকা উচিত।

—শুনেছি দেবতারা নাকি সেখানেই বাস করেন। আবার শুনছি অসুররা সেই জায়গা দখল করবার জন্য বহুদিন থেকে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

—না মিত্র! তুমি হয়ত মনে করেছ যে সেই সকল পর্বত শিখর, তাদের সনাতন হিমানী আর চিরন্তন বনরাজী অসুররা দখল করে নিয়েছে, সব ভুল। মানুষ অনেক দূরের দুর্গম জায়গা সম্বন্ধে এমনি অনেক কল্পনা করে থাকে, কোহকাফের সমুদ্রের পূর্বদিকের সম্বন্ধে আমি শুনতাম সেখানে নাকি এমন পরী আছে যাদের মুখ দিয়ে আগুন বেরোয়। তারপর নিজে যখন সেখানে গেলাম দেখলাম সব ভুল। সেখানকার হুণদের মানুষাদ বলা হয়। সত্যিই লড়াই বা লুটপাটের সময় তারা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। কিন্তু তাদের মধ্যেও মনুষ্যহৃদয় আছে। আমি তাদের সঙ্গে বাস করে এসেছি। খজার হুণদের জন ঐ সমুদ্রের তীরে বহুদূর পর্যন্ত বাস করে। ওদের দেশে নাকি তিনমাস যাবত দিন হয়ে থাকে। সে কথা অবশ্য আমি জানিনা, কারণ অতদূর আমি যাইনি। তবে মুখ দিয়ে আগুন বেরুবার কথা একেবারে মিথ্যা। আগুন অবশ্য বেরোয়, তবে সেটা মাটি থেকে। খজার সমুদ্রের তীরে বহুদূর পর্যন্ত পাহাড়ী ভূমি আছে। সেইখানে মাটির ভিতর থেকে আগুনের গন্ধ পাওয়া যায়। এমন কি কোনও জায়গায় কূয়োর জলে কাপড় ভিজিয়ে আগুন দিলে জ্বলতে থাকে। সেই কথাই দূর দেশে গিয়ে পরীদের মুখ থেকে আগুন বেরোয় বলে রটিত হয়েছে।

তরুণ সাথীরা এই কথাই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না। সন্দেহজনক দৃষ্টিতে সোগ্দীকে প্রশ্ন করে,—তাহলে সেই দূরারোহ, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতের উপরে দেবতারা থাকেন একথা সত্যি নয়? অথবা দেবাসুরদের যুদ্ধের কথা তাও সত্যি নয়?

—আমি ত কোথাও দেবগণের সঙ্গে অসুরগণের যুদ্ধ হতে দেখিনি। তাহলে বোধ হয় সে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। হয়ত অসুর

পরাজিত হয়েছে এবং দেবতারা জয়লাভ করেছে। একজন সাথী আগুনের মধ্যে একখণ্ড কাঠ দিতে দিতে বললো,—

—দেবতারা জয়লাভ করেছে? তাহলে পৃথিবীতে ধর্মের ও ধার্মিকের অনুকুল সময় এসেছে। সোগ্দী তরুণের কানের কাছে মুখ নিয়ে ধীরে ধীরে বললো,—হ্যাঁ দেরেস্তদীনের অনুকুল সময় এসে গেছে।

সোগ্দীর কথা শুনতে সকল সাথীদের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঠোটের কোনে ফুটে ওঠে আশার হাসি।

* * * *

তার পরের দিন সূর্যদেব তখন বেশ উপরে উঠেছে। এমন সময় তিনজন পুরুষ আর একজন স্ত্রী গুন্দেশাপুরের দক্ষিণ দিকের নগর দ্বার পথে প্রবেশ করে।

গুন্দেশাপুর ইরানের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধ নগর। তস্পোনের মত যদিও বিশাল নয়, কিন্তু এখানকার বাড়ী, রাজপথ, গলিপথ, নগর প্রাকার, নগর দ্বার, উদ্যান, পুষ্প বাটিকা, দোকান ও বাজার প্রভৃতির সৌন্দর্য তস্পোনের চেয়ে কম নয়। তস্পোন এবং গুন্দেশাপুর' এর মধ্যে পার্থক্য ছিল একটি মাত্র বিষয়ে। গুন্দেশাপুরে দরিদ্র বস্তী একটিও ছিল না যেমন আছে তস্পোনে। গুন্দেশাপুর ইরানের রোমক নগরীগুলির একটা খণ্ড নগরী। এখানকার নিবাসীদের মধ্যে রোমকদের সংখ্যাই বেশী। প্রথম শাহপুর এবং তারপর যত শাহন শাহ রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং জয়লাভ করেছে যতবার, ততবারই কিছু কিছু রোমক বন্দী গুন্দেশাপুর'এর অধিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। বন্দীরা এখানে এসে মুক্ত জীবন লাভ করেনি। প্রথম শাপুর'এর স্থাপিত এই নগরীকে রোমক ঢংএ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী করতে অংশ গ্রহণ করেছে। বিদ্যা, কলা, সহিষ্ণুতা, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যতা, উদার বিচার ধারা প্রভৃতি সকল বিষয়ে গুন্দেশাপুর সমৃদ্ধশালী অদ্ভুত নগর। এখানে সকল ধর্মের লোক

একই সঙ্গে আনন্দে বাস করে। তার মধ্যে রোমক অর্থাৎ যারা সবচেয়ে বেশী সংখ্যায়, তারা খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী [illegible] বিশ্ব-জ্ঞান বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত, সুরক্ষিত নগরী [illegible] যবন বিচার[illegible] রোমক কলাকার, হিন্দী জ্যোতিষী ও চিকিৎসক সকলেই নিজ নিজ বিদ্যায় স্বাধীনভাবে ব্যবসা বা প্রসার করে। সকল ধর্মের দেবালয় যত্র তত্র দেখা যায়, সেখানে সেই সকল ধর্মের লোকেরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ নিয়মানুসার পূজা পাঠ করে।

চারজন আগন্তুককে দক্ষিণ নগর দ্বারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। এখানকার নিয়মানুযায়ী বহিরাগত প্রত্যেকটি লোককে নাম লিখিয়ে যেতে হয়। দ্বারপাল সকলের নাম ধাম লিপিবদ্ধ করে নেয়। অমুক দিন একজন সোগ্দী, দুইজন অর্মনী স্ত্রী পুরুষ ও একজন রোমক ভিখারী গুন্দেশাপুর নগরে প্রবেশ করল।

সোগ্দীপুরুষ এখানে তার অপর তিনজন সাথীর পথপ্রদর্শক হয়ে আগে আগে চলতে থাকে। অনেকক্ষণ যাবত ওদের নিয়ে নানা প্রকার ছোট বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নগরের শেষ প্রান্তে প্রাকারের কাছে এক অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করে। কিছুদূর গিয়ে অনুরূপ একটি অন্ধকার বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবার সময় সাথী তিনজন পরস্পর মুখ চাওয়া চাউয়ি করে। কিন্তু সাধারণ দ্বার পার হয়ে ভিতরে আঙিনার সামনে পৌঁছতে ওদের ভুল ভাঙ্গে। এবার ওরা বুঝতে পারে এমন জায়গায় এই বাড়ীর বাইরের চেহারা শুধু লোক দেখানো। ভিতরের ঘরগুলি যদিও মূল্যবান আসবাব পত্র রেশমী কালীন বা পর্দা দিয়ে সাজানো নয়, তবুও প্রতিটি ঘর চমৎকার গোছানো ও স্বচ্ছ। সোগ্দী ওদের পিছনের একটি ঘরে বসতে দিয়ে ভিতরে চলে যায়। একটু পরে দুইজন স্ত্রী ও একজন পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। সাথী এই পুরুষটিকে দেখে চমকে ওঠে। কিছুক্ষণ আগে নগর দ্বারে এই লোকটাকে রক্ষীদের সর্দার রূপে ওরা দেখেছে। সোগ্দী যদি সঙ্গে না থাকতো তাহলে

ওদের চিন্তার অবধি থাকতো না। সোগদীর সঙ্গের পুরুষ এসেই অতিথিদের অভিনন্দন জানায় এবং অতিথিদের রাস্তার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে স্ত্রী দুইজনকে অতিথিদের সুব্যবস্থা করতে আদেশ দিয়ে চলে যায়।

যাত্রীদের মাথার উপর দিয়ে যেন একটা পর্বত প্রমাণ বোঝা নেমে যায়। স্ত্রীদের একজন পুরুষ সাথীর ও একজন স্ত্রী সহযাত্রীনির স্নানের ব্যবস্থা করে পরিস্কার পোষাক হাতে দিয়ে স্নানাগারের সামনে নিয়ে যায়।

দশম অধ্যায়

॥ কারাগার থেকে পলায়ন ॥

গুন্দেশাপুরের উত্তর দিকের সেই সাধারণ মহল্লার মধ্যে কিছু অসাধারণ ঘর এখনও আছে। আজ সেই রকম একটি বাড়ীর উঠান ও ঘরগুলি দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যে এটা সেই বাড়ী। প্রতিটী ঘর মহার্ঘ্য পর্দা ও রেশমী কালীন দিয়ে সাজানো। বসবার আসন্দী ও কোচ প্রভৃতি দেখলেই মনে হয় এই ঘর সাজাতে রাজকীয় খরচ ও সুরুচি প্রয়োজন হয়েছে। এই ঘরে এখন সোগ্দ দেশের কোন এক সামন্ত কন্যা বাস করছে। পরিচারকদের মধ্যে বেশীর ভাগ স্ত্রী। স্বামিনী যে দিকে যান সেই দিকে মধুর গন্ধে বাতাস ভরে যায়। শীতের দিন না হলে বোধ হয় ভ্রমরার গুঞ্জন শোনা যেত। আঙ্গিনার কিছু কিছু গাছ নিষ্পত্র হয়ে গেছে বটে কিন্তু টবের ফুল গাছগুলি যখন বাইরের কোণে সাজিয়ে দেওয়া হত তখন উদ্যান আবার সজীব হয়ে উঠত। স্বামিনী রাজকুমারীর শুধু সুগন্ধের সখ নয়, নিজের সুন্দর দেহকে অলঙ্কৃত করবার শখ ছিল আরও বেশী। গৃহস্বামিনীর কলকণ্ঠ আরও মিষ্টি। দিনের মধ্যে বিশেষ কোনও সময় তিনি সঙ্গীতাভ্যাস করতেন। সন্ধ্যার পর আরও চমৎকার ভাবে সাজ সজ্জা করে নিজের কামরায় এসে বসতেন। এই সময় প্রায় প্রতিদিনই নগরের দু-একজন সম্ভ্রান্ত লোক দেখা করতে আসতেন। এদের সংখ্যা দুই তিন জনের বেশী নয়। কখনও বা নানাপ্রকার আলোচনায় মধ্যে সময় কাটত। কখনও বা সঙ্গীতের আসর বসতো। এমনি অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রায়ই মজলিস চলতো। তারপর পান ভোজনের পর জলসা শেষ হতো।

লোকে জানতো সোগদী রাজকন্যা তীর্থ দর্শন করতে এসেছে। দিনের বেলা পূজা পাঠ নিয়মিত ভাবেই হত। কলা ও সৌন্দর্যের দিকে রাজকন্যার যেমন খ্যাতি ছিল তেমনি ধর্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা হল রাজকন্যার সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের এমনি অদ্বিতীয়তা থাকা সত্ত্বেও তিন চার মাস পর্যন্ত তার কাছে আসা পুরুষের সংখ্যা পাঁচের বেশী হয়নি।

সময়টা ছিল হেমন্তের মধ্যকাল। মাঝে মধ্যে কখনও বরফ পড়ত কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হত না। আজকাল রাজকন্যার কাছে একজন নতুন পুরুষকে আসা যাওয়া করতে দেখা যায়। আগন্তুকের পোষাক পরিচ্ছদ ও তার সঙ্গে আসা পরিচারকদের দেখলে মনে হয় তিনি কোনও অসাধারণ ব্যক্তি। আগন্তুক পুরুষের সঙ্গীতের উপর ভীষণ নেশা ছিল। তিনি শুধু সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন না, বরং গবেষক বললেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু ইরানী সঙ্গীত নয়, হিন্দী রোমক ও সোগদী সঙ্গীতেরও বিশেষ রসজ্ঞ ছিলেন। তার সেই গুণে রাজকুমারী তার উপর বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিল। শুধু মনে মনে নয়, রাজকুমারী প্রকাশ্যেও বলত,—আমাকে সঙ্গীতে বিশেষভাবে শিক্ষিতা করেছিলেন আমার গুরু। কিন্তু আপনার মত সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ও প্রেমী আমি আমার জীবনে আর কখনও দেখিনি। রাজকুমারীর প্রৌঢ় অতিথিকে দেখলেই মনে হত তিনি খুব বিজ্ঞ ব্যক্তি; অতএব মৌখিক প্রশংসার দ্বারা তাকে খুশী করা কঠিন, একথা রাজকুমারী জানত। কিছুটা ভাষায় আর কিছু বলবার কৌশলে মনের কথা প্রকাশ পেত। কিন্তু জলসায় যখন লাল মদিরার চষক একের পর এক শেষ হয়ে যেত, তখন শব্দের উপর সংযম রাখা কঠিন হয়ে পড়ত। অতিথি কখনই মাত্রা ছাড়া পান করতেন না বা অসংযমী হতেন না। প্রথম প্রথম রাজকুমারী ততটা আগ্রহ প্রকাশ করত না বটে কিন্তু দিনঃ যত যেতে থাকে তত আকর্ষণও বাড়তে থাকে। এখন রাজকুমারী যখন কুতুপ তুলে

অতিথির চষকে মদিরা ঢেলে দেয় তখন অতিথির অস্বীকার করবার ক্ষমতা যেন ক্ষীণ হয়ে আসে।

হেমন্তের দিন শেষ হয়ে আসে। রাজকুমারীর অতিথি ভদ্র পুরুষ মাঝে মাঝে এখানে রাত্রিবাসও করতে লাগলেন। এর বিপক্ষে অবশ্য একটা কারণ লোককে দেখানো হত। সেটা হল রাত্রের হিমবর্ষা। হিমবর্ষার জন্য অতিথির পক্ষে তার দূরের আবাসস্থানে পৌঁছানো সবদিন সম্ভব হয়ে উঠত না, তাই রাত্রে থেকে যাওয়া।

অতঃপর রাজকুমারী অতিথির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তার নিবাস-স্থলে যাতায়াত করতে বাধ্য হতে লাগল।

গুন্দেশাপুরএর কিছু দূরে দুর্গের কাছেই এক পাহাড়ী ঢালু জমিতে ছোট খাটো সুন্দর প্রাসাদতুল্য অতিথির বাড়ী। বসন্তের পরশ পেয়ে বাড়ীর সামনের পুষ্পোদ্যান ও পিছনের ফলের বাগান যেন নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

রাজকুমারীর পরিচারক ও পরিচারিকা মহলে চিন্তার ভাব দেখা যেতে লাগল কিছুদিন থেকে। রাজকুমারী অবিবাহিতা। অবশ্য তার নতুন মিত্রও বিশেষ উচ্চকুলের অর্থাৎ কোনও পল্লব বংশীয় অথবা শাহনশাহের নিকট আত্মীয়ও হতে পারেন। এমন ব্যক্তির সঙ্গে যদি রাজকুমারী বিবাহ করেন তাহলে তার পিতৃকুলের দিক থেকে কোনও আপত্তি উঠবার কথা নয়। কিন্তু তাহলে আরও কতদিন থাকতে হবে এখানে তারও কোন ঠিক নেই। পরিচারকবৃন্দ সকলেই আপন আপন দেশে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই বসন্তেই তারা ফিরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু রাজকুমারী আজকাল কখনও কখনও তিন চারদিন পর্যন্ত বাড়ী ফেরেন না।

রাজকুমারীর মিত্র "হজারপত" পদে বিভূষিত ছিলেন। তেহরানের কাছে তার বিরাট একটা জায়গীরও আছে। এখানেও গুন্দেশাপুরের পাশের দুর্গটি তারই অধীনে। এক কথায় তিনি গুন্দেশাপুর ও সেই প্রদেশের সবচেয়ে বড় শাহী কর্মচারী ছিলেন।

তিনি এর আগে "কণারঙ্গ" ও "শাহ্"র পদও অলঙ্কৃত করেছেন। এখন অবশ্য স্ব-ইচ্ছায় তিনি গুন্দেশাপুরএর প্রধান অধিকারীর পদ স্বীকার করে নিয়েছেন। বিদ্যা এবং শিল্পের উপর তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। রাজকুমারী ইতিমধ্যেই তার শিক্ষা দীক্ষার গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরে তিনি যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। অন্যান্য সামন্তদের মত তার বিচার ধারা কু-সংস্কারপুর্ণ ছিল না। যবন দর্শনের উপর তার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। রাজকুমারীর মনে একমাত্র দুঃখ ছিল যে দর্শন সম্বন্ধে তিনি শুধু অরিস্তোতল, প্লাতোঁ, সোক্রাত প্রভৃতি কয়েকজন দার্শনিকের নামই শুনেছেন। হজারপত যখন দর্শনের বিষয় আলোচনা করতেন, তখন রাজকুমারীর মুখভাব ফ্যাকাসে হয়ে যেত। যেন অন্যমনস্কা হয়ে পড়ত, তখন বাধ্য হয়ে হজারপতকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে হত।

হজারপতের প্রাসাদেও পরিচারক পরিচারিকাদের সংখ্যা ছিল অনেক, কিন্তু পরিবার বলতে তিনি নিজে। হজারপতকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে তার আছে. কিন্তু তারা তাদের দাদামশায়ের কাছে থাকে। রাজকুমারী এই কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত না। কেউ তাকে বলে দিয়েছে যে বেশী দিন হয় নি হজারপতের স্ত্রী এই বাড়ী থেকে গেছেন। রাজকুমারী এও জানতে পারে যে তাদের মেলামেশা অনেকখানি বেড়ে যাবার পরও হাজারপত তার বাড়ীতে রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে আগ্রহ করেন নি, যতদিন তিনি বাড়ীটাকে কণ্টকশূন্য করতে পারেন নি।

শীত শেষ হতে হতেই হজারপতএর স্বভাবের অনেক পরিবর্তন চোখে পড়তে লাগল। মদিরার মাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে সংযমের সীমা পার হয়ে গেল। অবশ্য সংযম বজায় রাখার আর দরকার মনে করলেন না তিনি। কিন্তু তার ব্যবহারে রাজকুমারী বেশ বুঝতে পারে যে তাকে প্রাণাধিক প্রিয় বলে ভালবাসেন হজারপত।

সেদিন সায়ংকালে রাজকুমারীর মাথায় যন্ত্রণা হতে থাকে। সমস্ত রাত্রি পাশে বসে থেকে হজারপত রাজকুমারীর সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন। রাজকুমারীর সঙ্গে সর্বদাই দু-একজন পরিচারিকা থাকত। তারাও স্বামিনীর সেবার কসুর করেনি।

তার কাছে যত পুরুষরা যাতায়াত করত তার মধ্যে মিত্রদাতকে হজারপত সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করতেন। জাতি ও বর্ণের দিক থেকে মাত্র এক পুরুষের পার্থক্য ছিল দুজনের মধ্যে। সেজন্য মিত্রদাতকে শিষ্টাচার রক্ষার জন্য বিশেষ অভিনয় করতে হত না।

রাজকুমারী হজারপতের সম্বন্ধে সব কিছুই জেনে নিয়েছেন। হজারপত গুন্দেশাপুরের সর্বোপরি অধিকারী। প্রথম প্রথম নিজ প্রেমিকার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে নিজে দুর্গে গিয়ে দেখা শোনা প্রভৃতি কর্তব্য পালন করতেন। পরে সে সকল কাজ তিনি মিত্রদাতকে দিয়ে করাতে লাগলেন। মিত্রদাতকে তিনি খুব বিশ্বাস করতেন। ওদের কাজকর্ম দেখে মনে হয় এই দুর্গটির বিশেষ মহত্ত্ব আছে। মিত্রদাত রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় হজারপতের কাছে দুর্গের সকল সংবাদ দিতে আসত। সংবাদ গ্রহণের সময় রাজকুমারীর কাছ থেকে অন্যত্র গিয়ে কথাবার্তা হত। রাজকুমারীরও এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। হজারপত বয়সে প্রৌঢ়, দুজনের বয়সে বিশ বৎসরের পার্থক্য। তবুও রাজকুমারী হজারপতের উপর বিশেষ মুগ্ধ।

শীতের শেষ দুই সপ্তাহ গুন্দেশাপুর প্রায় বরফে ঢাকা থাকত। হজারপতের ভবন পাহাড়ের কিছুটা উপরে ছিল, তাই সেখানে বরফের চাপ আর হিমবৃষ্টির আধিক্য ছিল নিচের চেয়ে বেশী।

রাজকুমারী আজকাল তার প্রেমিকের বাড়ীতেই স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেছে। তার সঙ্গীতের জলসা প্রায় রাত্রি আড়াই তিন প্রহর পর্যন্ত চলত। মদিরার ফোয়ারা ছুটত হজারপতের বাড়ী।

তিনি আজকাল মদিরায় এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে এক মুহূর্ত আর মদিরা বিনা সময় কাটাতে পারেন না। নেশার ঘোরে বলতেন, রাজকন্যা! আমার এই ধন সম্পত্তি সব কিছুই তোমার, এ জীবন আমি তোমার জন্যেই উৎসর্গ করেছি। রাজকন্যা যখন কখনও সখনও নিজের দেশে যাবার কথা বলত, তখন হজারপত একেবারে ভেঙ্গে পড়তেন এবং তারপর রাজকুমারীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হত হজারপতকে সান্তনা দিতে।

হজারপতের পরিচারিকারাও আজকাল রাজকুমারীকে তাদের পুরোনো স্বামিনীর চেয়েও বেশী সম্মান দিয়ে থাকে! তাদের কাছে রাজকুমারী যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। সৌন্দর্য, তারুণ্য ও কলায় পূর্ণ হয়েও রাজকুমারীকে অভিমান স্পর্শ করতে পারেনি। সামান্যতম পরিচারিকার সঙ্গে মধুর ব্যবহার ও তাদের আর্থিক সহায়তা করে অল্পদিনেই সকলের মন জয় করে নিয়েছে রাজকুমারী। মিত্রদাত যদিও সকাল সন্ধ্যায় মাত্র দুবার আসত তবুও রাজকুমারীকে যথেষ্ট সম্ভ্রম করত। রাজকুমারীর সামনে এখন ভবিষ্যতের নির্ণয় করবার সমস্যা দেখা দেয়। হজারপত স্পষ্টই জানিয়ে দেন,— তোমার আর দেশে ফিরে যাওয়া চলবে না। আর যদি সত্যিই যেতে চাও, তাহলে আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে চল। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।

রাজকুমারী প্রথমে অনেক চেষ্টা করেছে দেশে যাবার জন্য কিন্তু হজারপতের অবস্থা দেখে তার প্রস্তাব স্বীকার করে নেয় শেষ পর্যন্ত। অতঃপর শীতের শেষে জ্যোতিষীর কাছে শুভদিন চেয়ে পাঠায় রাজকুমারী। আগামী বসন্তকালে প্রণয় পরিণয়ে পরিবর্তিত হবে বলে কথা পাকা হল।

হজারপতের ঘর এখন আর পরের ঘর নয়। এখানকার সব কিছুতেই ক্রমশঃ আপনত্ব অধিকার স্থায়ী হয়ে গেল। পূর্বাহ্নে হজারপত যখন মদিরার নেশায় প্রভাবিত হতেন না, তখন তিনি

রাজকুমারীর আচার ব্যবহারে আরও বেশী আকর্ষিত হতেন। যখন তিনি দেখতেন তার সঙ্গে সম্বন্ধিত প্রত্যেকটি বস্তুকে রাজকুমারী নিজের বলে গ্রহণ করেছে।

হজারপতের এখন আর এক কাজ বাড়ল। রাজকুমারীকে সন্তুষ্ট রাখতে বাড়ী-ঘর, বাগান-উষ্ঠান, প্রভৃতি নিত্য নতুনভাবে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রাজকুমারীও নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে তার হজারপতের সেবায়। মাত্রাহীন মদিরা হাতে তুলে দেবার সময় মাঝে মাঝে রাজকুমারী একটু অভিমান দেখাত বটে, কিন্তু চাইলেও না বলতে যেন তার প্রাণে আঘাত লাগতো। হজারপত মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পেরেছেন রাজকুমারী তার ভালোমন্দের জন্য তার জীবন দান করতে পারে।

সেদিন ছিল অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি। পৃথিবীর বুকে অন্ধকার এমন জমাট বেঁধেছে যে, কোথায় পাহাড় আর সমতলভূমি, কোথায় উপত্যকা আর কোথায় অধিত্যকা চেনা যায় না। আকাশে বেশ মেঘ করেছে। একটিও তারা দেখা যায় না। সমস্ত পৃথিবী নীরব নিস্তব্ধ। অন্ধকার আকাশের নিচে কোথায় কি হচ্ছে তার খবর কে রাখে। কিন্তু তবুও ধরনীর এক কোনে তিনটি জীবন্ত মুর্তিকে দেখা যায়। ঘন অন্ধকারের বুকচিরে মিট মিট করে জ্বলছে একটা মোমবাতী। সেই স্বল্প প্রকাশে তিনটি মানুষের মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। যে ঘরটীতে বাতি জ্বলছিল সে' ঘরটী এত ছোট যে তিনজন মানুষকে বসতেও অসুবিধা হয়, দাড়াতে গেলে মাথায় পাথরের ছাদ ঠুকে যায়। তুইপাশে তুটী জানলা আছে কিন্তু সেগুলি সব বন্ধ। ঘরের মধ্যে ছোট একটা চারপায়ার উপর একজন পুরুষ বসে আছে। দৃষ্টি তার পাথরের দেওয়ালের উপর নিবদ্ধ। অন্য একজন পুরুষ পাশে দাড়িয়ে। কিছুক্ষণ পর বসে থাকা পুরুষটীর দৃষ্টি ধীরে ধীরে প্রদীপের আলোর দিকে ঘুরে আসে। প্রদীপের পাশে তৃতীয় মূর্ত্তি একটি তরুণী অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। পুরুষটির যেন বিশ্বাস

হতে চায় না, বারবার চোখ বন্ধ করে আবার তাকায়। বোধহয় স্বপ্ন। আবার পরীক্ষা করে সে সচেতন আছে কিনা। নাঃ এ সত্যই বাস্তব। এবার পুরুষটী ধীরে ধীরে তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললো, —কেন এলে প্রিয়া! তুমি এখানে এসোনা। তোমাকে দেখলে আমার পরিতাপের সীমা থাকে না! অতঃপর কিছুক্ষণ আবার মৌনভাবে কাটে। কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিতা তরুণী নিচু অথচ স্পষ্ট স্বরে উত্তর দেয়,—আমি তোমাকে কষ্ট দিতে আসিনি।

—জানি, কিন্তু যখন তুমি সামনে থেকে চলে যাবে, তখন তোমার স্মৃতি আমার বুকের মধ্যে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা সৃষ্টি করবে। অনেক কিছুইত ভুলতে পেরেছি, এ স্মৃতিটাও আমাকে ভুলে থাকতে দাও প্রিয়া। আমি জানিনা এটা কোন বৎসর, কোন মাস, কোন দিন। যখন খুব শীত অনুভব করি, তখন মনে হয় এটা শীতের কোন মাস হবে। ঘরের বাইরে উদ্যান নামে দুহাত জায়গায় গোটা চারেক ফুলগাছ অবশ্য আছে, কিন্তু আজকাল সেখানেও যাওয়া বন্ধ করেছি। ধীরে ধীরে সব কিছু ভুলে যাচ্ছিলাম কিন্তু তুমি আবার কেন এলে, কেন মনে করিয়ে দিচ্ছ সকল পূর্ব্ব-স্মৃতি? এযে মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও ভয়ানক। কৃষ্ণবসনা করুণাময়ী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে চৌকির উপর উঠে বসে পুরুষের হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চেপে ধরে। পুরুষকে বেশ উত্তেজিত মনে হয়,— আমি তোমাকে প্রাণাধিক ভালবাসি প্রিয়তমা, আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত শুধু তোমারই নাম, তোমারই প্রেম অবশিষ্ট থাকবে, কিন্তু এমনি করে কি লাভ? হয়তো রোজ তোমার ঐ স্নেহময়ী হাত দুখানার পরশ পাবো, হয়তো তোমার উষ্ণ চুম্বন অনুভব করব। কিন্তু এই মায়া মরীচিকার পিছনে মিছেই ছুটো-ছুটি করে লাভ কি? আজ আমার এও মনে নেই আমি কবে শুয়েছি আর কখন জেগেছি। হায়! এ যদি শুধু স্বপ্ন হত, তাহলেও সে স্বপ্নকে মধুর স্বপ্ন বলে মনে স্বান্তনা পেতাম। কিন্তু খেদ শুধু এই

যে একে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু চিন্তা করবার মতও আমার ভাগ্যে নেই।

তরুণী পুরুষের মাথাটি নিজের বুকের সঙ্গে আবেগভরে চেপে ধরে। পুরুষ অনুভব করে তরুণীর তপ্ত অশ্রু টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ে তার কপোল বেয়ে মুখের উপরে।

—তুমি কাঁদছ প্রিয়তমা? না, না, আমাকে ক্ষমা করো। তোমার প্রেমই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। দেখ আমার চোখেও জল। তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাকোনা কেন, স্মরণ রেখ, তোমার চেয়ে আমার হৃদয় আরও বেশী বিচলিত হয়ে থাকে। এসেছ ভালই করেছ, যতটুকু সময় পাও এসো আমার বুকের মধ্যে। পুরুষ তরুণীকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে, তরুণীর অসহ্য লাগে পুরুষের নীরবতা, কম্পিত স্বরে বললো,—

—আমি শুধু স্বপ্নের মত আসিনি প্রিয়।

—বলতে পারো, কিন্তু আমি জাগতে চাইনা, এমনি স্বপ্নের মধ্যেই থাকতে চাই।

—না না অমন করে বলোনা, আমার হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। বিচ্ছেদ জ্বালায় জর্জরিত আমার হৃদয়। তুমি স্বপ্ন দেখছ না, সত্যই আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, কত কঠিন পরিশ্রম আর বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এতদূর আসতে পেরেছি?

—সব জানি প্রিয়ে, আমাকে স্বান্তনা দিয়ে লাভ নেই, আমি জানি, আগামীকাল সকালে যখন ঐ দরজা খুলবে, খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করবে এই ঘরে, তখন তুমি থাকবে না আমার পাশে। শুধু ঐ দুটি কাঠের কপাট, এই চারপায়া আর ঐ পরিমিত পাথরের দেয়াল আর ছাদটুকু তার সাক্ষী থাকবে।

—তুমি কি বলছ? এখনও কি তুমি ভাবছ এ সব স্বপ্ন?

তোমার গালে আমার উষ্ণ অশ্রু অনুভব করতে পারছ না, আমার হাতে তোমার হাতের স্পর্শ ও চাপ অনুভব করতে পারছ না?

—সব পারছি প্রিয়ে। এ সবকিছুই মধুর। এই স্বপ্নের এতটুকু অবহেলা করবার নয়।

তরুণী কিছুক্ষণ আবার চুপ করে থাকে, অতঃপর চঞ্চল হয়ে উঠে পুরুষের মাথায়, মুখে, বুকে, হাতে পায়ে মৃদু এবং জোরে চাপ দিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু পুরুষের এতে কোন ভাবান্তর না দেখে ভীত হয়ে ওঠে তরুণী। কম্পিত স্বরে বলে ওঠে:

—সময় খুব কম প্রাণনাথ। তোমার সম্বিক তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এতরাত্রে এসেছে। তাড়াতাড়ি বাইরে চল, বেরিয়ে চলো এই মৃত্যু কারাগার থেকে, আমাদের সকল ব্যবস্থা পাকা করা আছে বাইরে।

স্বপ্নপ্রিয়ার মুখ দিয়ে এই একটা কথাই বন্দী কবাতের কাছে নতুন মনে হয়। হঠাৎ চমকে উঠে সম্বিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ভয় হয় যদি স্বপ্ন হয়, যদি আবার স্বপ্নলোকে যেতে হয়? কিন্তু না। সম্বিক ত্রস্তভাবে উঠে কবাতের দুই বাহু ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। তবুও কবাত অবিশ্বাস্য স্বরে বলে,—তাহলে কি সত্যিই আমার প্রাণপ্রতিমা সম্বিক জাগ্রত অবস্থায় আমার কাছে এসেছে? যাই হোক, তুমি যা বলবে আমি তাই করছি প্রিয়া।

তিন চার হাত দূরে দণ্ডায়মান অন্য পুরুষ দ্বার খুলে দেয় এমন ভাবে যেন ঘরের মোমবাতীর প্রকাশ বাইরে না যায়। সম্বিক কবাতের হাত ধরে ঘরের বাইরে আসে। ঠাণ্ডা হাওয়ার এক ঝলক চোখে মুখে এসে ঝাপটা মারতে স্মৃতি সজীব হয়ে ওঠে। বাইরে জমাট বাধা অন্ধকারে কবাত সম্বিকের হাত ধরে অন্ধের মত যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এবার কবাত অধিক বিশ্বাসের সঙ্গে সম্বিকের হাতে চাপ দিয়ে বলে,

—আমার সম্বিকা রাণী, এবার আমার জন্য কি আজ্ঞা ? কবাতকে খানিকটা প্রকৃতিস্থ দেখে সম্বিক একমুহূর্ত্ত থমকে দাড়ায়। আনন্দে তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বিদ্যুতের মত কবাতকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে তার সারা শরীর চুম্বন করতে থাকে সম্বিক। সম্বিকের স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে। আজ কোনও দুঃখ নেই, যদি এই মূহুর্ত্তে ধরণী দ্বিধা হয়ে এমনি আলিঙ্গন বদ্ধাবস্তায় ওদের দুজনকে গ্রাস করে।

—তোমার মুক্তির সকল ব্যবস্থা হয়ে আছে। কারাপতি মদিরার নেশায় মত্ত। মদিরার সঙ্গে তাকে এমন কিছু খাইয়ে দিয়েছি যে আগামী তিন দিনের মধ্যে তার সম্পূর্ণ জ্ঞান হবেনা। এর মধ্যে তোমাকে বহুদূরে চলে যেতে হবে। আমি আপাততঃ এই খানেই থাকবো। কবাতের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। আবার সম্বিকাকে আকর্ষণ করে বুকের মাঝে।

—কিন্তু তুমি সম্বিকা ?

—আমার জন্য চিন্তা করোনা। আমার সঙ্গে আছে অন্দর্জগরের অপার কৃপা। আমার ধর্মভাইদের সহায়তায় এতদূর আসতে পেরেছি। এখানে তারাই আমাকে রক্ষা করবে। তারা আমার সহায়তার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সময় মত আবার আমরা মিলিত হবো।

কবাত কিছু যেন একটা স্মরণ করে বলেন,—আমার কাবুস ? আমার কাবুসকেও কি সেই শয়তানগুলো হত্যা করেছে ?

—না, তোমার কাবুস সুস্থ ও সবল অবস্থায় অন্দর্জগরের কাছেই আছে। তোমার গন্তব্যস্থলে তোমার কাবুসকে দেখতে পাবে, ঘোড়া প্রস্তুত। যাত্রা করো। মনে রেখ, বন্ধু সিয়াবখ্‌শ আমাদের জন্য যা করেছে, তার ঋণ আমরা কয়েক জন্ম ধরেও শোধ করতে পারবো না।

—সিয়াবখশ ? পল্লব তরুণ সিয়াবখশ অর্থাৎ আমাদের অন্দর্জগরের প্রিয়শিষ্য ?

—বেশী কথা বলবার সময় নেই। মনে রেখ সিয়াবখ্শ তার বয়সের তুলনায় লক্ষ কোটী গুণে চতুর ও বুদ্ধিমান। ওর প্রতিটী লোমকূপ নির্ভয়তা এবং বীরত্বে পূর্ণ। সম্বিক আবার কবাতকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করে। বিচলিত স্বরে কবাত বললো,

—সাসানী বংশের ভগবতী সম্বিক! তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য আর কিছু ভাবনার মত শক্তি নেই আমার।

—এখন তোমার বিচার করবার শক্তির আবশ্যকতা নেই। আমাদের সাথীর সঙ্গে যাও। চারটি ঘোড়া আরও দুইজন সওয়ারী তোমার সঙ্গে থাকবে। রাস্তার মাঝে মাঝে নতুন ঘোড়ার প্রবন্ধ করা আছে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবার আগে পর্যন্ত তোমরা চারজন সোগ্দী বনিকের অভিনয় করবে।

—হ্যাঁ ছোট থাকতে সোগ্দী ভাষা শিখেছিলাম, এখনও মনে আছে। "অনুস্বর্ত্তের" এই বিস্মৃতিকারায় কবাত সবকিছু ভুলে গেছিল, কিন্তু·········

—কিন্তুর কথা পরে হবে। যখন তোমার সম্বিক আবার তোমার পাশে আসবে, তখন সব শুনব।

গাঢ় অন্ধকারে মধ্যে দুটি বিরহী কপোত কপোতী শেষবারের মত আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হয়। অশ্রুজলে ভিজে যায় দুজনের মুখ, বুক, কঞ্চুক। তারপর দুজনে দুদিকের রাস্তায় যাত্রা করে গভীর রাত্রে অমাবস্যার আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে।

একাদশ অধ্যায়

।। মদ্রভূমি ।।

চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। যতদূরে দৃষ্টি যায় নিচেয় শুধু পাহাড় আর উপরে নীলাকাশ। সময়টা বসন্তকাল। কিন্তু বসন্তের প্রভাব তেমন দেখা যায়না এই ঘন পাহাড়ী দেশে। তারই সরু আঁকা বাকা উঁচু নীচু পথে চারজন অশ্বারোহী ছুটে চলেছে উত্তর দিকে। রাস্তাটা তেমন চালু বণিক অথবা রাজপথ নয়, তাই এদিকে লোক চলাচলও খুব কম। কখনও সখনও দু-একজনকে চোখে পড়ে এদিক ওদিক যেতে।

অশ্বারোহী চারজন প্রথম দিন শুধু রাত্রেই যাত্রা করেছিল। পরদিন সূর্য উদয়ের পর বিশ্রাম নিয়ে আবার রাত্রে যাত্রা সুরু করে। ইতিমধ্যে পথের মাঝে তিন জায়গায় ঘোড়া বদল করে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত ওদের যাত্রা নির্বিঘ্নে কেটে গেছে। তার পরদিন ওরা দিনের আলোয় চলতে থাকে। তিনদিন পর হমদানের রাজপথে এসে পৌঁছায় অশ্বারোহীরা। হখমতন অর্থাৎ হমদান নগর এখনও দূরে। সায়ংকাল উপস্থিত, অতএব চারজন পাশের গ্রামে বিশ্রাম করবার কথা স্থির করে।

গ্রামের লোকালয় দেখা যায়। চারিদিকে বসন্তের মধুর স্পর্শে সবুজের খেলা। খেত আর বাগিচা, তারপর উদ্যানের শেষে লোকালয়। মাটীর দেয়ালের রক্ষা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা গ্রাম। ভিতরের বাড়ীগুলি যেন শুকনো মাটীর ঢিবি। গ্রামে প্রবেশ করবার একটাই দ্বার। ভিতরে যাবার সময় দ্বারপাল বাধা দেয়। অশ্বারোহীরা জানত যে অধিক রাত্রিতে অথবা সঙ্কটকালে এই দ্বারে পাহারা থাকে। কিন্তু তারা জানত না যে এই সময়ে

শাহী প্রহরী দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত থাকবে। কে জানে আজ এই গ্রামে ইরানের মহামন্ত্রী রাত্রিবাস করবেন। দ্বাররক্ষী বাধা দিতে আগন্তুকদের বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। কিন্তু বাইরে সে ভয়ের চিহ্ন যাতে ফুটে না ওঠে তেমনি শান্তভাব দেখিয়ে একজন অশ্বারোহী দ্বারপালের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, আমরা সোগ্দ দেশের ব্যাপারী, চীনদেশের বহুমূল্য বস্ত্র আর উত্তর জঙ্গলের চামড়া নিয়ে শাহের দরবারে তস্পোনে গিয়েছিলাম। দ্বারপাল সুযোগ বুঝে স্বর আর এক মাত্রা উঁচু করে বলে।

—তোমরা হুনদের গুপ্তচর। তারাও ব্যাপারীর ছদ্মবেশে চলা ফেরা করে থাকে।

—না ভাই। গুপ্তচরগিরি করে আমাদের কোন লাভ নেই। সোগ্দ দেশে জন্ম। মধ্যবিত্ত কারবারী। সামান্য কেনা বেচা করে ছু-চার দ্রাখ্‌মা রোজগার করে পরিবার পালন করি। আজই আমরা হমদান নগরে পৌঁছতে চেয়েছিলাম কিন্তু রাত্রের অন্ধকারের জন্য বাধ্য হয়ে এই গ্রামে এসেছি রাত্রিবাস করবার জন্য।

অতঃপর সংবাদ পেয়ে দ্বারনায়ক এসে অশ্বারোহীদের দেখে দ্বারীকে প্রশ্ন করেন।

—কি ব্যাপার? এদের আটকে রেখেছ কেন?

—মহাশয়! আমরা সোগ্দী ব্যাপারী। রাতের অন্ধকারের জন্য এখানে একটু আশ্রয় চেয়েছিলাম এবং মহাশয়ের সেবায় হাজির হয়েছি। দ্বারীকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে আগন্তুক অশ্বারোহী এই কথা বলতে দ্বারনায়ক ওদের দিকে তাকিয়ে দেখেন এবং 'সেবায় হাজির' কথা শুনে যেন কিছু চিন্তা করে দ্বারপালকে আদেশ করেন।

—ঠিক আছে। ওদের ঐ পাশের ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দাও। সকালে অন্য সকলে জাগবার আগেই ওরা চলে যায় যেন। অতঃপর অশ্বারোহীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—, রাত্রে তোমাদের

খাওয়ার কষ্ট হবে না। তোমাদের ঘোড়ার জন্য ঘাস আর দানা এরা ব্যবস্থা করে দেবে। আমাদের সঙ্গেই তোমরা রাত্রি ভোজন করবে। সোগ্দী মনে মনে প্রসন্ন হয়ে ওঠে দ্বারনায়কের বুদ্ধি দেখে। আর কিছু নয় কিছু মুদ্রা দিয়ে ওর সেবা করলেই উনি প্রসন্ন। ঘোড়া বেঁধে রেখে সোগ্দী একশত দীনার-এর একটি থলি ও দুখানা মূল্যবান রেশমী বস্ত্র নিয়ে নায়কের সামনে রাখে।

নায়ক মশালের আলোয় দীনারের চকমকি দেখে খুশী হয়ে বলে,—আমি জানি আপনারা সোগ্দী দেশের বড় কারবারী। আপনারা নিশ্চিন্তে রাতকাটান এখানে। যদি বলেন ত আমার নিজের লোক দিয়ে আমি আপনাদের হমদান নগরীতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। সোগ্দী ধন্যবাদ দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললো,—ধন্যবাদ মহাশয়! কাল দুপুর পর্যন্ত আমরা হমদানে পৌঁছে যাব। সেখানে আমাদের দেশের ব্যাপারী আছে। তবে সেখানে যদি আবার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে সেজন্য অবশ্যই আপনার সাহায্য চাইব। দ্বারনায়ক অভয় দিয়ে বলে—না না সেজন্য আপনারা ভয় পাবেন না। হমদানে আমার একজন বন্ধু উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছে। তার নামে আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।

সরদারের কথার ইশারায় সোগ্দী বুঝতে পারে হমদানেও কিছু ভেট পূজা করতে হবে। নইলে সেখান থেকেও মুক্তি পাওয়া দুষ্কর।

কিছুক্ষণ পরে ভোজন সামগ্রী আসতে নায়ক এবং ব্যাপারীরা এক সঙ্গে ভোজন পর্ব সমাধা করে পান-পর্ব সুরু করে। নায়ক মশাইকে ধীরে ধীরে নেশায় বেশ চেপে ধরে। সোগ্দী তখন মদিরেক্ষণার আলোচনা আরম্ভ করে। মদিরার নেশার উপর মদিরেক্ষণার কথা শুনতেই নায়ক ভীষণ খুশী হয়ে নিজের অনুভবের কথা বলতে লাগল। অর্মনী, ইবের, রোমক, মুদ্র (মিশ্র) অথুর (অসীরিয়া), কপিশা, কানিশ (কাবুল), হরহুতী (হিরাত) এবং

বখত্রিয় প্রভৃতি দেশের সুন্দরীদের প্রশংসা করতে লাগল। তারমধ্যে কিছু তার নিজের চোখে দেখা, কিছু শোনা কথা। আর কিছু একেবারে মনগড়া। যেমন যেমন নেশা বাড়তে থাকে, তেমন তেমন কথাও বাড়তে থাকে। অতঃপর অর্দ্ধরাত্রির সময়ে বহুকষ্টে সোগ্দী ব্যাপারী বিশ্রাম করবার জন্য ছাড়া পায়। প্রহরীকে বলে রাখে ভোর হতেই যেন ডেকে দেয় তাদের।

সূর্য্যোদয়ের অনেক আগে সোগ্দীরা গ্রাম ছেড়ে বহুদূর চলে আসে। চলতে চলতে মুখ্য সোগ্দী বললো—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এত সস্তায় ছুটী পেলাম।

—যা বলেছ। বললো অন্যসাথী। তবে আমার মনে হয় দিনের বেলায় আমাদের রাস্তা চলা উচিত হবে না।

—না। এখন আমাদের প্রধান রাজপথ দিয়েই চলতে হবে। এদিকে রাত্রে রাস্তা চলা আরও কঠিন হবে, অর্থাৎ সন্দেহজনক। সে জন্য চিন্তা নেই, কাছে প্রচুর দীনার থাকা চাই। ওরা কি জানবে, কে যাচ্ছে। তৃতীয় সোগ্দী বললো।

—আমি জানি ওর নাম। ওর নাম জুবানদাত। প্রথমে কবাতের ভক্ত ছিল, এখন জামাস্প এর।

—ভুল বন্ধু! ও কারও ভক্ত নয়। ভক্ত যদি বলতে হয় ত একমাত্র দীনারের ভক্ত বলতে পারো। চতুর্থ সোগ্দী বলে,

—ওর দোষ দেওয়া বৃথা। সমস্ত ব্যবস্থাই ত এমনি করে চলছে। প্রথমে হয়ত কোন সামন্তের দাস বা বেতনভোগী মজুর ছিল। স্বামীর ঐশ্বর্য্য দেখে সকলেরই লোভ হওয়া স্বাভাবিক। তারমধ্যে যারা একটু চতুর বুদ্ধির হয়। তারা যে কোনও উপায়ে দীনার জমাবার সুযোগ করে নেয়।

—দীনার শাহনশাহেরও প্রয়োজন হয়। ওর মত লোকের আবশ্যকতা অনুযায়ী একশত দীনার দিয়ে সন্তুষ্ট করান গেল, আবার ওর উপর ওয়ালাকে সন্তুষ্ট করতে হলে হাজার দীনার দরকার।

—সেইটাই সবচেয়ে দুঃখের বিষয়। বললো প্রমুখ সোগ্দী। দেশের ধন জন্ম দেয় যারা তাদের শরীরের রক্ত জল হয়ে যায়, আর তাদের লুঠ পাট করে এরা কেমন দিব্যি আরামে সেই ধন জমা করছে। অথচ আশ্চর্যের কথা, আপোষে এরা ঝগড়া করলেও এদের একতাও আছে। শাহ পরিবার ও সামন্ত পরিবারদের মধ্যে ইরানী এবং পার্থিয় সকলেই আছে। পার্থিয়দের রাজত্ব দখল করে গদীতে বসল ইরানী কিন্তু আজও দেশের বড় বড় পদগুলি সেই পার্থিয় শাহ বা সামন্ত পরিবারদের হাতেই রয়েছে। এমন কি সেনাপতির পদও সেই পার্থিয়দের হাতে। পুরোহিতরা এখন ধর্মাচার্য হয়ে আনন্দে দিনাতিপাত করছে। এমন কি ন্যায়াধীশের পদও লাভ করেছে সেই পুরোহিত বর্গ। শিল্প-মন্ত্রীর হাতে শিল্প বাণিজ্য যাওয়ার ফলে শিল্পি কৃষাণ ও মজুরদের রোজগারের বেশীর ভাগ ধন তারই হাতে গিয়ে জমা হচ্ছে। এই তিন বর্গের লোকগুলিই ইরানের সকল সম্পত্তি ভোগ দখল করছে। ছোট ছোট ব্যাপারী, কৃষাণ, মজুর শুধু কাজ করবার মালিক। তারা এবং ক্রীতদাসরা সমস্ত ধন ঐশ্বর্যের জন্মদাতা অথচ তারাই সমাজের সবচেয়ে পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে। যত অপমান লাঞ্ছনা, দুর্ভিক্ষ সব তাদের ভাগ্যে জন্মগত অধিকার। ইরানে শতকরা কুড়িজন মাত্র লোক এই উচ্চ তিন বর্গের (শাহপরিবার অথবা সামন্ত পরিবার, পুরোহিত বর্গ এবং মন্ত্রিবর্গ)।

—হ্যাঁ, তবে ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই কিছু। কুয়োর জলে যদি মদ মেশানো থাকে তাহলে জলপানকারীদের নেশা হবেই। তারজন্য কাকে দোষ দেবে?

হমদান প্রধান নগর। কোহকাফ, সোগ্দ, দক্ষিণী সমুদ্র এবং তস্পোন যাওয়ার প্রধান রাজপথগুলির সংযোগস্থল হমদান। কাছাকাছি আসতে সোগ্দী অশ্বারোহীরা সাব্যস্ত করল দিনের আলোয় হমদান সহরে প্রবেশ করা ঠিক হবে না। এখানে সোগ্দী

ব্যাপারী অনেক আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করা ওদের ইচ্ছা নয়। অতঃপর ওরা নগরে প্রবেশ না করে রাস্তা বদল করে অন্যরাস্তায় চলতে থাকে।

হমদান থেকে খানিকটা উত্তর-পশ্চিমে গেলে পর্বত। এদিকের পাহাড়ী অঞ্চল আগেকার মত সঁবুজশুন্য শুষ্ক নয়। দেবদারু, বান প্রভৃতি হিমপ্রদেশী গাছের বিরাট বিরাট জঙ্গল দেখা যায়। এখানকার নদীর ধারাও সদানীরা ও স্রোতস্বিনী। তাছাড়া বসন্তের মধ্যভাগ, পশু-পক্ষীদের ক্রীড়া ও কূজন বনরাজিকে মাতিয়ে রেখেছে।

সোগ্দী ব্যাপারীরা এখন গ্রামের পাশে ছোট ছোট গ্রাম্যপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। এখানকার গ্রামগুলি খুব ছোট ছোট এবং গ্রামবাসীরা তেমন নাগরিক বা বেশভূষায় উন্নত নয় তবু অতিথি পরায়নতা লক্ষ্য করবার মত। অর্মনী পুরুষের পোষাকে চারজন অশ্বারোহী একের পর এক গ্রাম পার হয়ে চলেছে। প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামবাসীরা ওদের সহায়তায় আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। শাহনশাহী শাসনের দাপট এই গ্রামগুলিতে তেমন পৌঁছয়নি এখনও।

এই সকল-পাহাড়ী লোকেদের মধ্যে এখনও পুরোনো গণতন্ত্রের প্রভাব কিছু কিছু আছে। গ্রামবাসীদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে জানা যায় মাত্র এক হাজার বৎসর আগে এখামে মাদ (মদ্র) দেশীয় জনতন্ত্র ছিল। সে সময় তিগ্রা ও হুফ্রাতের উপত্যকায় অসুস্থর সম্রাটের রাজত্ব ছিল। তারা কয়েকবার স্বতন্ত্র চেতা মদ্র জাতিকে অধীন করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু সফল হতে পারেনি। এক এক উপত্যকায় মদ্র জাতি স্বতন্ত্র জন হয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় যদিও সকলে একত্র হয়ে যুদ্ধ করত বটে কিন্তু সকল জনপদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ছিলনা। ফলে বেশীদিন নিজেদের স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়নি। অসুস্থর

রাজ বার বার চেষ্টা করেছে মদ্রদের পদানত করবার জন্য। শেষ বার অস্সুর বংশকে ধ্বংশ করতে ওরা দেবকের নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে অস্সুর বংশ ধ্বংশ হয়। অস্সুর রাজধানী বাবীর ধ্বংস করে ওরা। কিন্তু এই জয়লাভই ওদের সর্বনাশ ডেকে আনল। মদ্রদের জনতন্ত্র রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হল। দেবক হল ওদের প্রথম রাজা। তারপর বেশীদিন মদ্রদেরও রাজতন্ত্র স্থায়ী হল না। কয়েক বৎসর পর পড়শীরাজ্যের পারস জাতিরা আক্রমণ করে বিজিত হয়ে তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের স্থাপন করল।

যদিও হাজার বৎসর হয়ে গেছে মদ্রদের এই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অধীন হয়ে থাকা। তাদেরই পুরানো নগর হখ্মতন শুধু নামমাত্র মদ্রদেশে রয়েছে। এই পাহাড়ী জাতি তাদের স্বতন্ত্রপ্রেমী পূর্ব্বপুরুষদের কথা ভুলতে পারেনি। অখামনশী সম্রাট কোরেশ এবং দায়যোশ রাজত্ব করে গেছে এখানে। যবন সম্রাট এবং পার্থিয়রাও শাসন করেছে এবং আজকাল সাসানী বংশ শাসন করছে। কিন্তু এই সকল দুর্ধর্স শাসকরা শক্তির জোরে এদের সম্পূর্ণ পদানত করতে পারেনি। প্রথমে শত্রুভাবে সকলেই চেষ্টা করেছে, তারপর এদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে তাদের প্রভূত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে। তারা সকলেই স্বীকার করেছে এরা পাহাড়ী জংলী জাতি, মরবে তবু স্বভাব ছাড়বে না। তাই আজও এরা স্বাতন্ত্রপ্রেম একেবারে ভুলতে পারেনি।

অশ্বারোহীরা এখন মদ্রদেশের শেষ অঞ্চল দিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। আর তাড়াহুড়া করে চলবার প্রয়োজন নেই। এদিকে এখনও মানবজীবনের অতখানি পতন হয়নি, যতখানি চলার পথে অন্যান্য জায়গায় দেখে এসেছে। সম্ভ্রান্ত নাগরিক জীবনের অনেক কিছু থেকে যদিও এরা বঞ্চিত রয়ে গেছে আজও।

চতুর্থ দিন সূর্য্যাস্তের কিছু আগেই অশ্বারোহীরা নদীর ওপারে এক খোলা উপত্যকায় এসে পৌঁছয়। এই অঞ্চল বেশীর ভাগ

সমতল ভূমি ও পরিষ্কার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। এককথায় প্রকৃতির ভাণ্ডার বলা যায়। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে অশ্বারোহীদের মনে আনন্দের সীমা থাকেনা। তারা যেন কোনও নতুন পৃথিবীতে এসে পৌঁছেচে। পাহাড়ী এলাকার চারিদিকে সবুজ বনরাজি পূর্ণ। কোথাও ঝরণার জল কলকল শব্দে এসে পড়ছে মাটীর বুকে। সামান্য দুএকটা ন্যাড়া পাহাড় ছাড়া বাকী সকল জায়গায় ঘাস, বন, ফল ও ফুলের সমারোহ। তারই পাশ দিয়ে নদীর ধারা সমতল ভূমির উপর দিয়ে চলেছে বলে নুড়ি পাথরের ঘর্ষণে স্রোতধারার শব্দ নেই। নদীর পাশে দুই দিকেই সমতল-ভূমি। তারই পাশে পাশে চলেছে চারজন অশ্বারোহী। কিছু দূর যেতেই তাদের রাস্তা মেওয়া বনের ভিতর দিয়ে চললো। বিশাল বাগিচা, কিন্তু তার চারদিকে কোনও ঘেরা নেই। ফলের যদিও দেরী আছে তবুও গাছগুলি ফলের আগমনের আভাষ দেয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল বাগানের সাজ। বিশেষ বিশেষ জায়গায় কিছু ঘাস দেখতে পাওয়া যায় শুধু, তাছাড়া সমস্ত বাগিচা স্বচ্ছ, পরিষ্কার। কোথাও কোন গাছে একটি শুকনো ডাল পর্যন্ত নেই, না কোথাও আছে, একটিও অঙ্গ ভঙ্গ গাছ। কোথাও কোথাও বহুদূর পর্যন্ত আপেলের বাগিচা, কোথাও আঙ্গুরের খেত, কোথাও ন্যাশপাতির গাছের সারি। আখরোট, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতির বাগানও পাশাপাশি অনেক দূর দূর পর্যন্ত ছবির মত সাজানো রয়েছে।

অশ্বারোহীরা ইরাণ, ইস্তখ্র ও গুন্দেশাপুরেও এই সকল ফলের বাগিচা দেখেছে, শাহী বাগিচাও দেখেছে অনেক, যেখানে খরচের মাত্রা না রেখে বাগান সাজাতে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এমন সুন্দর গাছ আর চাষের প্রবন্ধ কোথাও দেখেনি।

বাগিচা ছেড়ে এবার ওরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে। আশ্চর্য হয়ে এদিক ওদিক তাকায় ওরা। গ্রাম, বাগান, খেত, বন, পর্বত নদী সকলেই মিলে মিশে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য

গ্রামগুলির মত এই গ্রামের চারিদিকে রক্ষাপ্রাচীর নেই। যদিও তার আবশ্যকতা নেই, কারণ এই অঞ্চলের চারিদিকের পাহাড়শ্রেণী অক্ষয় রক্ষাপ্রাচীর হয়ে আছে। বাড়ীগুলি চমৎকার সাজানো। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে চওড়া রাস্তা, দুদিকে পর পর সাজানো ঘর। রাস্তার দুই দিকে ফলের গাছ লাগানো রয়েছে। সেগুলি রাস্তার শোভাবর্দ্ধন করেছে শতগুনে।

অশ্বারোহীরা যখন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে তখন সূর্যাস্ত হয়েছে। চারজনের একজনকে এই গ্রামে খুবই পরিচিত বলে মনে হল। অপরিচিত আগন্তুকদের অর্মনী পোষাকে দেখেও তারা কোনও প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করা অথবা ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনা।

বিশাল গ্রামের সকল বাড়ীঘরগুলি সাজানো গোছানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওরা চলতে চলতে গ্রামের শেষ সীমানায় পৌছয়। সেখানে অপেক্ষাকৃত একটা বড় বাড়ীর সদর দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। ঘোড়া থেকে নেমে সকলে দরজার সামনে দাঁড়াতে একজন সুন্দর প্রৌঢ় পুরুষ ওদের স্বাগত জানায়। স্বাগত শব্দ উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ় সকলকে গাঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করে। কারও মুখে কথা নেই। সকলের চোখেই আনন্দের অশ্রু চকমকিয়ে ওঠে।

দ্বাদশ অধ্যায়

।। দিহবগান ।।

গত রাত্রির চারজন অশ্বারোহীর মধ্যে একজন মিত্রদাত, অন্যজন সিয়াবখ্শ দিহ-বগানে বিশেষ পরিচিত। বাকী দুজন এই প্রথম বার এই অঞ্চলে পদার্পণ করল। এদের দুজনের মধ্যে একজন ভারতীয় মিত্রবর্মা, অন্যজন ইরাণের পদচ্যুৎ শাহেনশাহ কবাত। রাত্রে যদিও গ্রামের সব কিছু দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি, কিন্তু রাত্রে সম্মিলিত ভোজনের সময় ওরা অনুভব করে যে ওরা এক নতুন পৃথিবীতে এসেছে। সকল গ্রামের পাঁচ হাজার মানুষের ভোজন যদিও এক জায়গায় নয় তবুও শতাধিক স্ত্রী পুরুষ ও শিশু একজায়গায় খেতে বসেছে। তারই মধ্যে এক সারিতে ওদের অন্দর্জগর বামদাতপুত্রও অন্ন গ্রহণ করছেন। ভোজনের মধ্যে মাংস নেই এবং মদিরার ব্যবস্থাও নেই, কারণ অন্দর্জগর তাঁর উচ্চবর্গের অনুগামীদের জন্য মদ্য-মাংস অভক্ষ্য বলে নিয়ম করেছেন তবে মধু, মাখন, ভাত, রুটী, ডাল ও সুস্বাদু মেওয়া ও পাকা কলা আছে প্রচুর পরিমাণে। এখানে স্ত্রী পুরুষের কোনও ভেদাভেদ নেই। ছোট বড় বলে কিছুই নেই। সকলেই অকৃত্রিম ভাবে খেতে খেতে একে অপরের সঙ্গে আলাপ করছে। আগন্তুকরা পরে জানতে পারে দিহবাগানে চল্লিশটী ভোজনশালা আছে সেখানে গ্রামের সকল মানুষ নিয়মিত ভাবে ভোজন করে থাকে। ভোজনের ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সম্মিলিত ভাবে করা হয়।

দিহবগান সেই সকল গ্রামের মধ্যে একটি গ্রাম। যেখানে অন্দর্জগর মজদক এবং তার পূর্ববর্ত্তী গুরুসকল তাঁদের স্বপ্নের সাকার রূপ পৃথিবীর বুকে এনেছিলেন। এখানে কারও কোনও

নিজস্ব সম্পত্তি নেই। এখানে সকল ফলোদ্যান, খেত, খামার, স্থাবর-জঙ্গম সম্পত্তি সম্মিলিত সম্পত্তি। সকলের সমান অধিকার সেই সম্পত্তিতে। সকলেই এখানে মিলিত শক্তির দ্বারা তাদের সকল কাজ করে। অধিক বৃদ্ধ, রোগী এবং শিশুরা কাজ করেনা, তার জন্য রয়েছে তাদের সম্মিলিত অভিভাবকেরা। এদের পালন করা অন্যান্যরা তাদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ হিসেবে মনে করে।

দিহবগানের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি হল মধু। মধুর অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে এখানে। পাশেই পাহাড়ী জঙ্গল থাকার জন্য কাঠের উপযোগিতা খুব বেশী। পারিবারিক সকল কাজেই অধিক কাঠের ব্যবহার। দিহবাগান কোনও ব্যাপারিক গ্রাম নয় এবং বহির্জগতের সঙ্গে এখানকার সম্বন্ধ খুবই কম বলে তার নাম অনেকেই জানে না।

দিহবগানের জীবনযাত্রা একেবারে সাদাসিধে, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে তারা শিল্পপ্রেমী নয়। শিল্প-কলাকে তারা ধর্মের এক অঙ্গ মনে করে। এরা সকলেই জানে তাদের পরম গুরু "মানী ফাতিক পুত্র" একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পি ছিলেন, এবং সঙ্গীত বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। কাব্য এবং সাহিত্যেও তাঁর বিশেষ অধিকার। দিহবগানকে এক কথায় শিল্পীর গ্রাম বলা যায়। এখানে প্রতিটী কাজেই শিল্পকলার অপূর্ব স্পর্শ চোখে পড়ে। এমন কি তামা অথবা পিতলের পাত্র গুলিতেও অদ্ভুত রং এবং চিত্র উৎকীর্ণ করে সেগুলিকে চিত্তাকর্ষক করে তোলা হয়েছে। এখানে অন্যান্য কাজের মত কলার ক্ষেত্রেও অন্দর্জগর একদেশীয়তার স্থান দেননি। তাই এখানে চীন দেশের চিত্রও যেমন দেখা যায় তেমনি রোমক দেশের চিত্রও সমভাবে সমাদৃত।

মিত্রবর্মা নিজে পল্লব চিত্রকলায় সিদ্ধহস্ত শিল্পি। তাছাড়া উত্তর ভারতীয় গুপ্ত কলারও বিশেষ রসজ্ঞ ব্যক্তি। পরদিন সায়ং-

কাজে মন্দির দর্শন করতে গিয়ে মন্দিরের সুন্দর ভিত্তিকলা দেখে মিত্রবর্মার আশ্চর্যের সীমা থাকে না।

মিত্রবর্মা একে একে অনেক প্রশ্ন করে অন্দর্জগরের কাছে। অন্দর্জগর বললেন,—আমরা মানুষে মানুষে ভেদভাব মনে করিনা। বিশ্বের সকলেই আমাদের ভাই। ধর্মের কোনও বিচার নেই আমাদের কাছে, যে কেউ যে কোনও ধর্মের অনুগামী হোক না কেন সকলেই আমাদের ভাই।

তার মধ্যে কেউ যদি পথভুলে যায়, ভুল করে, তবুও সে আমাদের পর নয়। তবে শত্রুদের জন্য আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় একথা বলাই বাহুল্য।

—তা ত বটেই। এই ত কিছুদিন আগেও আমরা কি বিরাট রক্তপাতের সম্মুখীন হয়েছিলাম। আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাই বোন প্রাণ দিয়েছে সেই নৃশংস রক্তপাতে।

—সেই জন্যেই ত শত্রুদের জন্য সাবধানতা রাখা দরকার। এখানে এই দুর্গম পর্বতমালার মধ্যে সত্যিকার অথচ দুর্দ্দান্ত মানুষদের দিহবগানে সেই আগুনের আঁচও লাগবে না কখনও। এখানকার সকলেই একে বগ (ভগবান) এর দিহ (গ্রাম) বলে মানে। মনুষ্য মাত্রই প্রেম ও এবং বন্ধুত্বই আমাদের গুরুর একমাত্র শিক্ষা। তাঁরা এই নীতিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রচলন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু আমি তার ব্যাপক রূপ দিয়েছি। তাঁরা শুধু আরম্ভ করেছিলেন, তাকে ব্যাপকভাবে রূপ দেবার সময় পাননি। আমি সেই সুযোগ পেয়ে মানুষ মাত্রেই জীবপ্রেম প্রচার করেছি। আমি শুধু মানুষকে মৌখিক শিক্ষাই দিই নি। দেশে দেশে যাতে প্রচার হয় সে জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে আমাদের প্রচারক, পর্যটক কাজ করছে। ভারতবর্ষ, চীন, রোমক ও যবন দেশে আমাদের অনুগামীরা প্রচার করছে এই ধর্ম। তাছাড়াও দক্ষিণ দেশের তাঁবুবাসী আরবী এবং উত্তরে শক, হুন যাযাবরদের মধ্যে আমরা প্রচার করছি। আমাদের অনুগামীরা

জানে যে প্রেমের রাস্তা ফুলশয্যা নয়, তাই তারা এত কঠিন যাত্রা করতে প্রসন্নমনে রাজী হয়েছে। তারা জানে প্রেমের চেয়ে বড় রক্ষাকবচ আর কিছু নেই। তারা শুধু অন্যদেশে শেখাতেই যায়নি, সেই সকল দেশ থেকে অনেক কিছুই শিখে আসছে, তার অনেক প্রমাণ তুমি এই দিহ বগানে পাবে। সবচেয়ে বড় শিক্ষা তারা যা পেয়েছে তার নাম হল কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্তি পাওয়া।

—কূপমণ্ডুকতা. কি ?

—ভীষণ অভিশাপ। অজ্ঞানতার অপর নাম কূপমণ্ডুকতা। মানুষ এই কূপমণ্ডুকতার নেশায় তার আসল রূপের দর্শন পায় না তাই তাদের এই বিষময় পরিণতি। ইচ্ছে থাকা সত্বেও আমি নানাদেশে ভ্রমণ করবার সুযোগ পাইনি ; এখন ত প্রায় বৃদ্ধ হয়েছি। কিন্তু আমি আমার সাথীদের কাছ থেকে পৃথিবীর সকল কোনের সংবাদ রাখি, সেই সকল জায়গার ইতিহাস শুনি। পৃথিবীটা মানুষের জ্ঞানের চেয়ে বড় নয় অতএব তাকে শিখতে এমন কিছু বেগ পেতে হয় না। চেষ্টা থাকা চাই। রোমক জ্যোতিষীরা ত পৃথিবীর লম্বা চওড়া আয়তন পর্যন্ত নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন।

—শুধু রোমক জ্যোতিষী কেন। আমাদের ভারতবর্ষে আজও জীবিত আছেন এমন ভারতীয় জ্যোতিষী আর্যভট্ট পৃথিবীর ব্যাস ১০৫৬ যোজন এবং পরিধি ৮০০০ যোজন বলেছেন। কিন্তু তিনি বলেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তাই সকলে তাকে নাস্তিক বলে।

—লোকেরা নিরর্থক দোষী করে অপরকে। অবশ্য ধর্মের কারবারী যারা অন্যের দোষারোপ করাই ত তাদের পেশা। যে কোনও নবজ্ঞাত সত্য তাদের পক্ষে হানিকারক, তাই তাকে অধর্ম বলে প্রচার করে। সেই যে ভারতীয় জ্যোতিষী, তিনি কি নিজের মনগড়া একটা আবিষ্কার প্রচার করেছেন ? না, তার জন্য তাকে কত বৎসর-দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, তার খবর রাখে কেউ ? যাই বলনা

কেন আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীটা এমন কিছু বড় নয়। আমাদের বহু অনুগামী দেশ দেশান্তর থেকে ফিরে আসছে আবার যাচ্ছে। কেউ বা তারা পদযাত্রায় দেশ পাড়ি দিচ্ছে, কেউ বা জাহাজ, কেউ ঘোড়ায়। চীন থেকে নয় মাসে সিন্ধু নদীর সঙ্গমে জাহাজ পৌঁছয়, সেখান থেকে দু'মাস লাগে তম্পোন আসতে। যবদ্বীপ থেকে নয় মাস লাগে জাহাজে তম্পোন আসতে। খোতন তম্পোন থেকে মাত্র চার মাসের জাহাজের রাস্তা। রোম এবং যবন দেশ ত আরও কাছে। এখান থেকে মাত্র দুইমাসে উত্তরের হুন ঘুমন্তদের দেশে পৌঁছানো যায়। আমাদের লোকদের এই দেশ-জ্ঞানের জন্য আমরা বিশেষ ভাবে লাভবান। এতে আমাদের জড়তা দূর হয়েছে এবং আর্থিক লাভও হয়েছে প্রচুর। আমাদের এখানকার গাই গরু দেখেছ ?

—হ্যাঁ। কিছু কিছু আমাদের দেশের মত দেখেছি।

—রোম এবং যবন দেশেরও গরু আছে এখানে। সেই সব গাই অন্যান্য দেশের চেয়ে অধিক পরিমাণে দুধ ও মাখন দেয়। আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের গরু-বাছুর আনিয়েছি। অবশ্য কবাতের শাসনকালে এই সকল কাজে আমাদের সুবিধা ছিল অনেক। এখন আমাদের এখানে অধিকতর দুধের গাই আছে প্রচুর। এমনি করে ঘোড়ার জাতিকেও আমরা আরও ভালভাবে তৈরী করেছি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাল ভাল ঘোড়ার সংমিশ্রনে এ সম্ভব হয়েছে। এখনও নতুন ফল ঘরে আনবার সময় হয়নি। কিন্তু ফল দেখেছ তুমি ?

—দেখেছি, কিন্তু ছয় মাস পর্যন্ত কেমন করে এমন তাজা থাকে ?

—রাখবার বিধি। ভালো ভালো গাছের জন্ম দেওয়া এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করা। আমাদের এখানকার, দ্রাক্ষা, আপেল, ন্যাশপাতী, খর্বুজ-তর্বুজ, উডুম্বর প্রভৃতি যে কোনও ফলই দেখবে অন্যান্য দেশের চেয়ে আকারে বড় এবং স্বাদে অধিক সুস্বাদু। দিহ বগান যদি শুধু নিজেদের ফল ও গাছ নিয়ে পরিশ্রম করত, তাহলে অতখানি সাফল্যলাভ করতে পারতো না। আমরা নানাদেশের ফল ফুল গাছ

নিয়ে আমাদের দেশের মাটীর সঙ্গে সংমিশ্রন করে গবেষণা করে এত অল্প সময়ে এতখানি এগিয়েছি। সকল দেশের সকল মানব বন্ধুরা তাদের নিজ নিজ অনুভব আমাদের শিক্ষা দিয়েছে।

নবাগন্তুকদের মধ্যে দুজন ছিল, যারা দিহ বগানকে এই প্রথম চোখে দেখল তাই তাদের কাছে খুবই আশ্চর্য লাগবার কথা। কিন্তু যে দুজন দিহ বগানকে বহুবার দেখেছে তারাও তাদের প্রত্যেক যাত্রার পর ফিরে এসে দিহ বগানে কিছু না কিছু নতুন জিনিষ দেখেছে। দিহ বগানের অধিবাসীরা চির নবীনতার পূজারী। কখনও বা নতুন ধরনের বাড়ীঘরের সারি দেখা যায়, কখনও বা নতুন ধরনের শহর দেখেছে তারা প্রতিবার। কখনও ফিরে এসে দেখেছে পাহাড়ী ভূমি কেটে সমতল করে সেখানে চাষ হচ্ছে আবার কখনও দেখেছে নদীর ধারে আটা পিষবার বিরাট বিরাট পন-চাক্কী সারি সারি ঘুরছে।

যেদিকে তাকানো যায় শুধু সবুজের মেলা। কোথাও ফসল কাটা হচ্ছে, আবার কোথাও ফসল বোনা হচ্ছে। সকল জায়গায় স্ত্রী-পুরুষ সমান ভাগে কাজ করছে। কাজ করতে করতে তাদের সম্মিলিত সঙ্গীত শুনে মনে হয় এসব কাজকে তারা পরিশ্রম বলে মনেই করে না। এক খেতের সম্মিলিত সঙ্গীতের জবাব পাশের খেতের লোকেরা সঙ্গীতের মাধ্যমে ফেরত পাঠায় তখন এরা চুপ করে শোনে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

তাই বলে দিহ বগানের সকলেই খেত খামারে কাজ করছে না। গ্রামের মধ্যে ছেলেমেয়েরা খেলা-ধুলা করছে, তাদের মধ্যে কবাত পুত্র কাবুসও রয়েছে। তাদের চেয়ে একটু বয়সে বড় যারা তারা লেখা পড়ায় মগ্ন। দিহ বগানের একটিও স্ত্রী পুরুষ নেই যে লেখা পড়া জানে না। পরম গুরু মানী যে পূর্ণ-লিপি লিখে রেখে গেছিলেন তাতেই এখানকার পড়াশুনার সকল কাজ চলে। এদের মধ্যে অনেক বয়স্ক বিদ্যার্থীও আছে, যাদের কেউ বা পাশের গ্রাম থেকে

এসেছে, কেউ বা বিগত রাজনৈতিক দাঙ্গার সময়ে ছিন্নপত্রের মত এখানে এসে পৌঁছেচে। এই সকল বিদ্যার্থীদের শুধু দেশী শিক্ষা নয়, বিদেশী শিক্ষাও দেবার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। তবে সবই ইরানী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে যবন দার্শনিক প্লাঁতো, অরিস্তোতল-এর খুবই সমাদর। অধ্যাপক মহাশয় ভারতীয় নাগার্জ্জুন, অসঙ্গ এবং দিগনাগ' এর দর্শন সম্বন্ধে, বিশেষ করে তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করলেন। এখানকার শিক্ষা দীক্ষার প্রণালী দেখলে বোঝা যায় যে দেরেস্তদীনেরা কেন এত উদার হয়। দর্শনের অধ্যাপক বললেন,—অন্ধকারের মত অজ্ঞানতাও ভয়ের বস্তু। জ্ঞান অথবা আলোর প্রকাশ শুধু চোর বদমায়েশদের কাছেই ভয়াবহ। অন্দর্জগর বললেন,—তাই বলে আমাদের এই সামান্য কয়েকটা গ্রামের মধ্যে পৃথিবীর সকল সুন্দর জিনিষ নিয়ে আসা সম্ভব নয়। এমন কি তস্পোনও তার জন্য উপযুক্ত নয়। তস্পোন বড় নগর হতে পারে, কিন্তু দিহ বগানের সঙ্গে সমতা আনতে পারবে না কখনও। সেখানে আছে মানুষের রক্তে তৈরী বিরাট বিরাট প্রাসাদ আর মানুষকে ক্ষুধিত রেখে, অন্যের অপহরণ করে সঞ্চয় করা ভোগ। আর এই দিহবগানে সেই সব কথা কেউ চিন্তাও করে না।

তার পরদিন আগন্তুকদের কেটে গেল গ্রাম পরিদর্শন করে আর অন্দর্জগরের সঙ্গে আলাপ করে। সন্ধ্যায় অন্দর্জগরের সঙ্গে সকলে গ্রামের মন্দির দেখতে যায়। এই বিশাল মন্দিরে যদিও গ্রামের সকল মানুষ একসঙ্গে বসতে পারে না, তবুও এর আঙ্গিনায় কমপক্ষে হাজার লোক অনায়াসে আরাম করে বসতে পারে। মন্দিরের সামনের দেয়ালে বিরাট একটা চিত্র অঙ্কিত। চিত্রে সিংহাসনে ভগবান অহুর্মজ্‌দ বসে আছেন। তাঁর দুই কাঁধে পাখা লাগান, মাথায় মুকুট। পাশে চারজন অন্য দেবতার মূর্ত্তি।

তাঁদের নাম অন্বেষণ, জ্ঞান, স্মরণ এবং আনন্দ। এরা এমন ভাবে দাড়িয়ে আছেন যেমন ইরানের দরবার কক্ষে দরবারী সভায়

সকলে বসেন। তার নিচেয় বারোজন দূতের মূর্ত্তি। প্রত্যেকের নিচেয় তাদের নাম লেখা রয়েছে, খানন্দক, (স্বনস্তক) দেহান্দক (দদন্তক), বরন্দক (ভরস্তক), স্বরন্দক (স্বরস্তক), দবন্দক (ধাবন্দক) স্বেজন্দক (উত্তিষ্টস্তক), কুশন্দক (তাড়স্তক), জনন্দক (হনন্তক), কুনন্দক (কৃণ্বস্তক) আয়ন্দক (আয়াস্তক), শবন্দক (শবস্তক) এবং পাবন্দক (পাবন্ধক)। তার নিচেয় অকামেন্নুর (শয়তান) মূর্তি। হাতে পায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং নতশির। দেয়ালের বাকী সকল জায়গায় নানাপ্রকার দৃশ্য চিত্রিত করা রয়েছে, তার মধ্যে বেশীর ভাগ মানীর জীবনের ঘটনা সমূহের দৃশ্যাবলি। প্রথম অর্দশীর-এর রাজত্বকালে মানীর ভারত যাত্রা, শাপুর প্রথম এর সিংহাসন আরোহণের সময় তার দরবারে উপস্থিত হওয়া, জনতার সামনে উপদেশ দেওয়া এবং মানব সমাজের জন্য বাণী প্রচার করছেন, "অব জেরবান্গ ইশ ইশ্নোখাগ হেম, চে অজ বাবেল্ জমিগ বিস্প্রেখত" অর্থাৎ আমি অবজেরবানগের প্রেরিত দূত, তাঁর পবিত্র বাণী প্রচার করতে পৃথিবীতে এসেছি। "স্বর্থশোধ্ ই রোশন উদপুর মাহ ব্রজাগ" (সূর্য প্রকাশমান ও পূর্ণচন্দ্র দীপ্তিমান) আর একটি চিত্রে মানীকে দরজার সামনে দেখানো হয়েছে এবং তার পাশের চিত্রে গুন্দেশাপুরের দুর্গের এক দরজায় সামনে তাঁর কর্ত্তিত মস্তক টাঙ্গানো অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। কয়েক খানা চিত্র আছে যে গুলিতে বুদ্ধদেবের জন্ম, উপদেশ ও নির্বাণ প্রভৃতি দৃশ্য অঙ্কিত, কয়েক খানি বুদ্ধের পরোউপকারময় জীবনের জাতক-কথা সুন্দর ভাবে ভারতীয় কৌশলে চিত্রিত করা হয়েছে! মিত্রবর্মার কাছে এই চিত্র এমন কিছু বিস্ময় সৃষ্টি করেনা। কারণ সে আগেই জানতে পেরেছে মানী ভারতে গিয়ে বুদ্ধদেবের উপদেশ অধ্যয়ন করেছেন এবং তাঁর কয়েকটী উপদেশ নিজে গ্রহণ করেছেন পর্যন্ত। তার মধ্যে একটি হল পুনর্জন্ম। যা পশ্চিমের অন্য কোনও ধর্মই মানে না। খৃষ্টের জীবনের কতকগুঁলি বিশেষ ঘটনারও চিত্ররূপ রয়েছে এই মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে।

এই সময় অন্দর্জগর মন্দিরে দেবতার সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে বসলেন, হে বগানবগ অহুর। তুমি স্বর্গে শয়তানকে পরাজিত করেছো, এবং তাকে এমন ভাবে বশীভূত করেছো যেন আর কখনও সে মাথা তুলতে না পারে। কিন্তু এখনও সে আমাদের হৃদয়কে রণাঙ্গন করে রেখেছে। এখনও আমাদের ভাই বোনদের মধ্যে আপন পর ভেদ ভাব বজায় রাখতে হচ্ছে। এখনও তাদের মনে রাগ এবং দ্বেষ ভাব পুরোমাত্রায় রয়েছে। হে মজ্‌দা! আমাদের শক্তি দাও, যেমন করে তুমি অকামেন্যুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করেছ। তেমনি করে আমরা আমাদের হৃদয়ের উপর যেন বিজয় লাভ করতে পারি এবং তোমার যশস্বী পুত্র বলে নিজেদের পরিচয় দিতে পারি।

মন্দির থেকে ফিরবার সময় অন্দর্জগর বলতে লাগলেন,—আজ এই যে সুন্দর সুন্দর বাড়ী-ঘর-গাছ-বাগান প্রভৃতি সব কিছু দেখছ, মাত্র ত্রিশ বৎসর আগে এখানে কোনও মানুষ বাস করতো না। জমি কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, পাথর-কাঁকরময় ছিল। আজ যা কিছু দেখছ এ সবই মানুষের হাতে তৈরী। এ-পরিশ্রমের ফল। ঈশ্বর জল, মাটী, আকাশ, পর্বত প্রভৃতি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, মানুষও তারই সৃষ্টি। মানুষকে শুধু তিনি সৃষ্টিই করেননি, মানুষের মধ্যেও তিনি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা দিয়েছেন এ তারই প্রমাণ। তিনি আমাদের হাত পা দিয়েছেন কাজ করতে। যতদিন কাজ করবে ততদিন তুমি সুখী থাকবে। হাতকে দিয়ে কাজ না করালে তুমি বেকার। এই বেকারত্বই মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় পাপ। কিন্তু মানুষ জাতি এখনও এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলো না। এখনও তারা কু-সংসর্গে পড়ে কষ্টভোগ করছে। তবে একদিন এর শেষ আসবে। তখন মানুষ সব বুঝবে এবং সেই দিনই পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবে সমস্ত মানবের সমতা, পরস্পর প্রেম এবং সার্বত্রিক সুখ ও সমৃদ্ধি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

।। সমতা ।।

দিন যায় দিন আসে। ধীরে ধীরে দিহবগানে প্রকৃতি দেবীর নবীন পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সেদিন সাপ্তাহিক ছুটীর দিন দিহ বগানে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গ্রামের সকল নরনারী বনচারনের জন্য বেরিয়ে পড়ে। ছুটীর দিনে সকলেই নানা রং‌এর পোষাকে সজ্জিত। স্ত্রীদের মধ্যে বেশীর ভাগ মুক্ত কেশী। কেউ কেউ খোঁপা অথবা বেণী বেঁধেছে। একে একে সকলে নদীতটে বনে, উপবনে ছড়িয়ে পড়ে। আপেল গাছগুলি এখন সবুজ পাতায় ঢাকা পড়েছে বটে কিন্তু তাতে পাতার চেয়ে ফল বেশী। সবেমাত্র ফলের গায়ে রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে। কতকগুলি গাছ ফলভারে আভূমি নত হয়েছে। কিছু কিছু গাছ অথবা ডালকে ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে নিচের দিকে খুঁটি লাগিয়ে অবলম্বন করে দেওয়া হয়েছে। আঙ্গুরের গাছেও লতায় লতায় থোকা থোকা আঙ্গুর সবুজ পাতায় ঢাকা পড়েছে। নিচে থেকে উপরের দিকে তাকালে মনে হয় যেন গুচ্ছ গুচ্ছ মুক্তাফল ঝুলছে। ফল পাকতে এখনও দু তিন মাস দেরী আছে, কিন্তু নয়ন তৃপ্ত করতে এখনই সে যথেষ্ট। উদ্দ্যানের মধ্যে মাঝে মাঝে নানা রংঙের গোলাপ ফুটে আছে, আরও কত রকমের রং-বিরং‌এর ফুলের ঝাড়। এই সকল ফুলের কিছু কিছু ইতিমধ্যেই দিহ বগানের সুন্দরীদের খোঁপার শোভা বর্দ্ধন করছে। উদ্যান এবং খেতের বাইরের ভুমি প্রাকৃতিক পুষ্প বাটিকার রূপ নিয়েছে। নরনারী কোথাও তাদের সন্তানদের নিয়ে বসে আছে। কোথাও গীতমণ্ডলী বেশ জমে উঠেছে। কোথাও এক জোড়া কপোত কপোতী প্রেমালাপে মত্ত। কোথাও বা সাথীরা মিলে নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা

হাঁসি ঠাট্টা করছে। কোথাও বা বালক বালিকাদের ক্রীড়া উপভোগ করছে স্ত্রীপুরুষেরা চারিদিকে ঘিরে দাড়িয়ে। কিছু দূরে নদীর কাছে একটা ফুল গাছের ঝোপের পাশে তিন জোড়া নরনারী সামান্য সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে বসে আছে। বয়সে এরা সকলেই তরুণ। এদের কারও বয়স ত্রিশের বেশী নয়।

এরাই আমাদের চিরপরিচিত তিনজন অতিথি। একদিকে একটু ঢলানের উপরে গা এলিয়ে দিয়েছে মিত্রবর্মা। তার পাশে সম্বিক বসে আছে হাসিমুখে। তার একটু উপরে কবাত বসে আছে, পাশে অর্দ্ধ এলায়িত দেহে একজন সুবর্ণাক্ষী কি যেন বলছে আর মিটি মিটি হাসছে। আর একজায়গায় দুজন তরুণ তরুণী, একজন তার সিয়াবখ্‌শ অন্যজন এক নীলাক্ষী সুন্দরী। সাসানী সাম্রাজ্যের মহারানী পরমাসুন্দরী সম্বিককে কিন্তু আজ এখানে অন্যান্য স্ত্রীদের চেয়ে ভিন্ন মনে হয়না। সে অকৃত্রিম রূপে মিত্রবর্মার মুখের দিকে তাকিয়ে নিভৃত আলাপে লীন হয়ে আছে। তারই পাশে কবাত তার সুবর্ণাক্ষীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুবর্ণাক্ষীর কোমল হাত দুটী নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মৃদু মৃদু চাপ দিয়ে হাসি মুখে আলাপ করছে। আর ওদিকে সিয়াবখ্‌শ তার নীলাক্ষীকে কোনও এক সাহসী যাত্রার কাহিনী বলছে। সিয়াবখ্‌শ এর কথা শুনতে শুনতে নীলাক্ষী সুন্দরীর চোখের তারা মাঝে মাঝে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, আবার কখনও বা দীর্ঘ নিশ্বাষ ফেলে মৃদু হাসি হেসে শুনতে থাকে।

দিহবগানে এত অধিক এবং শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যরাশি একত্রিত হয়েছে যে, এখানে পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর গর্ব খর্ব হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সম্বিক এখানকার কোমলাঙ্গী-দৃঢ়বাহু সুন্দরীদের দেখে প্রায়ই বলে—আমি ত এর জল আনবার চাকরাণীর উপযুক্তও নই। কিছুক্ষণ পরে সকলের অনুমতি নিয়ে তিনজন সুন্দরী মিলে একটি মধুর সঙ্গীত শোনায়, তারপর এক একজন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। নীলাক্ষীর কণ্ঠ যেন কোকিলকেও হার মানায়। গান শেষ হলে

কবাত স্মিতহাস্যে মন্তব্য করে,—সত্যিই দিহ বগানের নামটা পর্যন্ত সার্থক নাম। সত্যিই এ ভগবানের গ্রাম (দিহ-গ্রাম, বগ-ভগবান) মিত্রবর্মা কবাতের কথার রেশ ধরে শেষ করে,—দেবতা এবং দেব-লোকের কল্পনা আমরা আর বড় করে করতে পারিনা, যা এখানে দেখছি।

—কি চমৎকার পরিবেশ! কত মুক্ত আবহাওয়া। সব কিছুই আনন্দময়। বলে সিয়াবখ্‌শ

—তুমি কেমন অনুভব করছ, সম্বিক? কবাত সম্বিককে উদ্দেশ্য করে বলে। মুচকী হেসে সম্বিক জবাব দেয়।

—কেন ঈর্ষা হচ্ছে নাকি তোমার? কবাত সুবর্ণাক্ষীর হাতে আবার ঝাঁকুনি দিয়ে হাসতে হাসতে বলে,

—এই দেবলোকে ঈর্ষা বলে কোনও বস্তুই নেই। তবে তোমার সাহসের কথা মনে পড়লে আমি ভীষণ আশ্চর্য হই। সম্বিক মিত্রবর্মার হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে কবাতকে দেখিয়ে বলে,

—পীরোজ কন্যা এখন আর সেই মোমের পুতুলটি নেই। বাইরে থেকে যত কোমলই দেখ না কেন, ভিতরে আমি ততখানি কঠিন হতে পেরেছি, যতখানি দিহ বগানের অন্যান্য সুন্দরীরা হয়ে থাকে। তাদের সঙ্গে এখন আমি সমান সমান খেতের কাজ করি, তাদের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে নাচি ও গান গাই,

—আহাহা। কিন্তু দেখ যেন ভিতরের মত বাইরেটাও তোমার লোহা না হয়ে যায়। ব্যঙ্গ করে আড় চোখে তাকায় কবাত। অতঃপর নীলাক্ষী কবাতের কথার উপযুক্ত উত্তর দেয়।

—দিহ বগানের সুন্দরীরা বাইরেই হোক আর অন্তরেই হোক ইস্পাত যদি হয়েও যায়, আবার মোমের মত গলে যেতেও দেরী লাগেনা তাদের। পীরোজ পুত্র কবাতের চিন্তার কিছুই নেই আমাদের খ্বাহর (ভগ্নী) সম্বিক যাই হোকনা কেন তার নিজস্ব কোমলতাকে কখনই ত্যাগ করতে পারবেনা। এবার মিত্রবর্মা মুখ খোলে।

—আমাদের সকলের জন্যেই এ যেন এক নতুন পৃথিবী। চিন্তা কটুবচন, হিংসা, অলসতার কথা কেউ এখানে কল্পনাও করে না। এখানকার আকাশ, বাতাস, খরস্রোতা নদী সব কিছুতেই যেন প্রেমের জোয়ার বয়ে চলেছে। এই দুই মাসের অনুভবে আমি দেখেছি, একজন মানুষ আর একজন থেকে ভিন্ন, এদের মধ্যে মতভেদও হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, কোন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তির টানে নিমিষেই উবে যায়। এখানকার বাতাবরণ প্রেম ও সহানুভূতিতে পূর্ণ। এখানে হিংসা, দ্বেষ, লোভ অলসতার নাম গন্ধও নেই, ঠিক যে কয়টি কারণ পৃথিবীকে কটু করে তোলে, সমাজকে নিচেয় নামিয়ে দেয়।

—সুখ এবং শান্তির জীবন মানুষকে উচ্চমার্গে তুলে নিয়ে আসে, মন্তব্য করে সিয়াবখ্‌শ।

—বহুলোক অবশ্য এতে সন্দেহ করে থাকে। তারা বলে সুখ ও শান্তি মানুষকে স্বার্থকার কাপুরুষ করে। কিন্তু সম্বিক তার জীবন দিয়ে এই ভাবনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত করেছে।

—না মিত্র। সম্বিক নিজ অরুনবরন কপোল আরও অরুন করে বলে, আমার প্রশংসা করোনা। আমি জানি এই দিহ বগানের প্রত্যেকটি স্ত্রীর মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে যারা সময় পেলে তাদের অদ্ভুত বীরতা দেখাতে পারে।

মিত্রবর্মা সম্বিকের সুবর্ণ কেশ স্পর্শ করে অনির্বচণীয় আনন্দ অনুভব করতে করতে বললো,—না সম্বিক! রাগ করোনা। জীবনের ভোগ জ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞানপূর্বক, দ্বিবিধ উপায়ে হওয়া সম্ভব। আমি দেখেছি অজ্ঞানতাপূর্বক ভোগকারী রাজা, সামন্ত ও তাদের সৈন্যেরা সেই ভোগের মূল্য শোধ করতে হাসি মুখে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে, প্রাণ দেয়। দিহ বগানের অধিবাসীদের কথাও সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ এর পিছনে এক মহান আদর্শ রয়েছে, প্রেরণা রয়েছে। যে আদর্শ চায় শুধু

দিহবগানের দশ পনেরটা গ্রামই নয় সারা দেশটা দিহবগান হোক। সে শুধু আমিই অনুভব করতে পারি যে এখানে এসে আমি কতখানি আনন্দ পাচ্ছি। সিয়াবখ্শ আর চুপ করে থাকতে পারেনা, সেও মিত্রবর্মার প্রশংসা করে মন্তব্য করে।

—কিন্তু বন্ধু তুমিও ত নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাদের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছ।

—না ভাই। আমি এমন কিছুই করিনি যা অন্দর্জগরের একজন সাধারণ অনুগামীকে করতে স্বচক্ষে দেখেছি। তবে এই যে পৃথিবীর কোনে কোনে আমি ঘুরছি, সেত শুধু সেই সত্য এবং আদর্শের জন্যেই। তাহলে এখানে আমি তোমাদের পিছনে থাকবো কেন? মিত্রবর্মার কথা শেষ হবার আগেই অন্দর্জগর এসে সম্বিকের পাশে বসে পড়েন এবং সকলের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন,

—মিত্র, আমিও তোমাদের আলোচনা শুনতে চাই। আশা করি তোমরা সঙ্কোচ বোধ করবে না।

অন্দর্জগরের উপস্থিতিতে সকলের মুখে চোখে বিশেষ প্রকার আভা প্রতিফলিত হয়। সকলেই পূর্ববৎ নিজ নিজ স্থানে বসে থাকে। মিত্রবর্মা তার কথার রেশ ধরে বললো।

—প্রথম দিনই মন্দির দর্শন করতে গিয়ে সকলকে রক্ত বস্ত্র পরিহিত দেখে আমার দেশের স্মৃতি মনে পড়ে যায়।

—নিশ্চয়ই বুদ্ধ শাক্যমুনির? বললেন অন্দর্জগর।

—হ্যাঁ, অন্দর্জগর আমার মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

—এতে এমন কিছু চমৎকারিত্ব নেই মিত্র। আমাদেব এই রক্ত পট ধারণ বুদ্ধের সংঘ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

—আমাদের দেশে ভিক্ষু ভিক্ষুনিরাই ধারণ করে, সেটা কিছুটা তাম্রবর্ণ। কোথাও অরুন এবং পাণ্ডুবর্ণ পরিধান (চীবর) প্রচলিত আছে, কিন্তু গান্ধার এবং কাশ্মীর দেশে রক্তপট এর প্রধানতা লক্ষ্য করেছি।

—আমাদের পরম গুরু ফাতিকপুত্র মানী ভারত যাত্রার পথে কাশ্মীর হয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বুদ্ধের শিক্ষা, ভিক্ষুদের নিয়ম প্রভৃতি অনেক কিছুই শিখে এসেছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম থেকে অনেক কিছু নিয়ম গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের মজ্‌দয়স্নী ধর্ম ছাড়া আরও সকল ধর্ম অধ্যয়ন করেছেন, যবন দর্শনেও অবগাহন করেছেন, কিন্তু বুদ্ধধর্মে যতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন ততটা আর কোনও ধর্মে নয়। তাঁর স্বভাব ছিল সকলের কাছ থেকে গুণগুলি আহরন করা। তাদের অপগুনগুলির হিসেব না করা। এই প্রকৃতিটাও তিনি বুদ্ধের কাছেই পেয়েছিলেন। ধর্মের সেবার জন্য চিরকাল অবিবাহিত থাকাও বুদ্ধের কাছ থেকে শেখা। তাছাড়া প্রাণীমাত্রে দয়া, সর্বজীবে সমতা প্রভৃতি সবই বুদ্ধদেবের প্রভাব। তিনি যতটা গ্রহণ করতে সুযোগ বা সময় পাননি, আমি সেগুলি পূরণ করেছি বুদ্ধ ধর্ম থেকে অনেক কিছু নিয়ে। মিত্র, তুমি ত জানো ত্রিরত্ন কি ?

—হ্যাঁ, বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ।

—বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী, পরম জ্ঞানী। পৃথিবীর কল্যাণ একমাত্র জ্ঞানীর শরণ নিলেই হওয়া সম্ভব। অজ্ঞান, স্বার্থপর ও পাপীর শরণ নিলে কখনও কল্যাণ সাধন হয় না। যাকে তোমারা ধর্ম বলে থাকো, আমরাও তাকে দেরস্তদীন (ন্যায় পথ) বলি। যে পথে চললে কখনও কেউ অপরের অনিষ্ট করতে চাইবে না। এই পথেই ব্যক্তি অথবা সমষ্টির কল্যাণ হওয়া সম্ভব। এমনি ধর্মের শরণ নিতে নিশ্চয়ই কোনও বুদ্ধিমান সঙ্কোচ করবে না। আর তোমাদের তৃতীয় রত্ন সংঘকে আমরা অধিক মান্য করি। আমরাও চাই সকলকে সংঘের শরণে নিয়ে আসতে। বুদ্ধদেব যে সময়ে যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন সেখানে সকলের ব্যবহারে সংঘবাদ প্রথার প্রচলন করা সম্ভব ছিল না। যে কোনও মহৎ কাজে দেশ-কালের ও সীমার প্রয়োজন হয়। মহাপুরুষরা সময় বুঝে ন্যায় মার্গের

সংকেত মাত্র করেই ক্ষান্ত হন। আজ আমরা যে সঙ্ঘবাদ প্রচার করছি, আমার বিশ্বাস, বুদ্ধ শাক্য-মুনি এই সঙ্ঘবাদই চেয়েছিলেন। আমি তাঁর সকল উপদেশ পাঠ করবার সুযোগ পাইনি। তার প্রধান কারণ ইরানী বা সোগ্দী ভাষায় সেই সবগুলির অনুবাদ নেই। তবুও আমার বিশ্বাস বুদ্ধদেব এমনি সঙ্ঘবাদেরই সমর্থন করতেন। মিত্র! বুদ্ধধর্ম তুমি অধিক জানবার অবসর পেয়েছ বুদ্ধোপদেশের কোথাও কি এমন সংকেত আছে?

—সংকেত নয় অন্দর্জগর, স্পষ্ট বাক্য পাওয়া যায়। বুদ্ধের মাতা মায়াদেবী বুদ্ধের জন্মের সাত দিন পর দেহত্যাগ করেন। তখন বুদ্ধের মাসীমা প্রজাপতী গৌতমী তাঁর নিজের স্তণদুগ্ধ পান করিয়ে বুদ্ধকে লালন পালন করেন। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ হবার পর যখন নিজ জন্মভূমিতে গিয়েছিলেন তখন প্রজাপতি গৌতমী নিজের হাতে কাটা সুতোয় ও হাতে বোনা বস্ত্র দান করতে চেয়েছিলেন, তখন বুদ্ধ বলেছিলেন,—গৌতমী। এই বস্ত্র তুমি যদি আমাকে দান করো তাহলে তোমার ব্যক্তিকে দানের পুণ্য হবে, আর যদি সঙ্ঘকে দান করো তাহলে সঙ্ঘকে দানের মহাপূণ্য হবে। ব্যক্তি যত বড়ই হোক না কেন সঙ্ঘের সমকক্ষ হতে পারে না। অতএব যদি তুমি মহাপুণ্যের ভাগী হতে চাও তাহলে সঙ্ঘকে দান করো।

এই সময় বুদ্ধ এও বলেছিলেন, শুধু আজ নয়, অদূর ভবিষ্যতে এই সঙ্ঘ যদি অযোগ্য ব্যক্তির হাতেও চলে যায়, তবুও তার মহিমা আমার চেয়ে অনেক বড় হবে, কারণ আমি একজন ব্যক্তি মাত্র।

অন্দর্জগরের দাড়ী ঢাকা মুখ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি উল্লসিত হয়ে বলেন,—আমার বিশ্বাস ছিল মিত্র। আমি বুদ্ধকে অদ্বিতীয় পথ প্রদর্শক বলে মানি। তাঁর বুদ্ধি ছিল অনুপম, তাঁর হৃদয় ছিল অসীম।

আমার মনে হয় তার একার পক্ষে যদি সম্ভব হত তাহলে

তিনি সঙ্ঘবাদকে ও সমতাবাদকে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করতেন নিশ্চয়।

—তবুও তাঁর যে সাম্যবাদ বা সঙ্ঘবাদ ছিল তা তাঁর পরবর্ত্তী রাজারা বিনষ্ট করে দিয়েছে।

—কারণ, তাতেই স্বার্থ ছিল সেই সব রাজাদের। আমাদের গুরু ও বুদ্ধের মত মানুষকে ইহলোক ও পরলোকের সুখের সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি বুদ্ধের মত কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে নরনারীর সমতার ব্যবহারিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিষমতার সমূদ্রে সমতার দ্বীপ স্থায়ী হয়ে থাকতে পারেনা।

—তার কারণ বিষমতার সমূদ্র সমতাকে সহ্য করতে পারেনা। বললো সিয়াবখ্‌শ। সমতা নিজের শক্তির জোরে বিষমতাকে গ্রাস করতে পারে, কারণ সমতা দ্বারা লাভবান হবার সংখ্যা অসংখ্য আর বিষমতার দ্বারা লাভবান হওয়ার সংখ্যা এক মুঠো।

—কিন্তু আমাদের আচার্য এবং বুদ্ধ এই সাম্যবাদকে ভোগের সমানতা পর্যন্তই সীমিত রেখেছিলেন। ভোগের উৎপাদনেও সমান শ্রমের বিচারধারা তারা গ্রহণ করেন নি, তাই সেখানে এমনি দিহবগানের পারবর্ত্তে শুধু ভিক্ষুদের মঠ পর্যন্ত তৈরী হয়েছিল এবং সাম্যবাদ শুধু মঠের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো অবশ্য পরে সেই মঠের চার দেয়ালের মধ্যেও তা রক্ষা করতে পারেনি।

সম্বিক এতক্ষণ অন্দর্জগরের দিকে স্নেহ ও সম্মানের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এবার সম্বিক বললো,—

—কেবল মাত্র ভোগের সমানতা অপূর্ণই নয়, তাকে সমানতা বলা যায় না। যার শিকড় ভূমির মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনা। অন্দর্জগর সম্বিকের পিঠ চাপড়ে বলেন,

—ঠিক বলেছ সম্বিক। সমানতার দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীই ভোগ সাম্যকে স্থায়ী রাখতে সমর্থ। সেই সঙ্গে সাম্যভাবে উৎপাদনের শ্রমও বড় আনন্দের বস্তু।

—এ বিষয়ে আমি নিজের অনুভব দিয়ে প্রমাণ পেয়েছি। সে সময় মাস দুয়েক আমার সত্যিই খানিকটা কষ্ট হয়েছিল। হাতে ফোস্কা পড়েছিল। শরীর বেদনায় টন টন করতো। কিন্তু তারপর শরীর যে কতখানি হাল্কা ও উৎসাহযুক্ত মনে হয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায়না। এখন ত পরিশ্রমকে নৃত্য গীতের মত প্রসন্নতার বস্তু বলে মনে হয়।

—কিন্তু প্রসন্নতার বস্তু ততখানি, সম্বিক! যতখানি তাকে মাত্রার মধ্যে রাখা যায়। সুস্বাদু ভোজন ও মাত্রাধিক আহার করলে তার পরিনাম খারাপ হয়, এতএব এই জন্যেই আমি ভোগ-সাম্যকে শ্রম-সাম্য বিনা অপূর্ণ মনে করি। কিন্তু শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীতে সমতা এতটুকুতেই চিরস্থায়ী হয়না। পরে সেই সমতায় ধীরে ধীরে ভাঙ্গন ধরে, যখন সেই সকল শ্রমকারীদের সন্তানরা আসতে আরম্ভ করে। তখন প্রত্যেক ভাই তাদের সন্তানদের পৃথক পৃথক পক্ষপাত করতে থাকে। যার সন্তানের সংখ্যা যত বেশী তার চিন্তাও বাড়তে থাকে। তখনই সে নিজ স্বার্থের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়। পরিনামে নির্মম ভাবে এই সমতা ভেঙ্গে পড়ে এবং সৃষ্টি নষ্ট নয়। সেজন্য আমাদের অন্যান্য গুরু এর একমাত্র উপায় যা বলেছেন। তা হল বিবাহ না করা।

—আমাদের দেশে হিমালয়ের কাছে কিছু অঞ্চল আছে যেখানে অন্য এক নিয়ম পালন করা হয়।

—কি সে নিয়ম মিত্র? বললো সম্বিক।

—সেখানে এক পরিবারে সকল ভাইদের একজন পত্নী রাখবার প্রথা। অর্থাৎ যে সন্তান জন্মাবে সে সকল পরিবারের সম্মিলিত সন্তান হবে।

একথা আমিও শুনেছি। বললেন অন্দর্জগর, কিন্তু এই ঔষধি কেবলমাত্র একটি পরিবারের জন্যেই উপযুক্ত হওয়া সম্ভব। বিশ্বের সাম্যবাদের পাঠ এই উপায়ে ব্যবহার্য করা যায়না।

এবার সুবর্ণাক্ষী বলতে শুরু করে তার নিজস্ব মতামত।

—আমার মনে হয় আমাদের ভারতীয় ভাই মিত্রবর্মা পরিবারের এই যে নিয়ম বললো তা শুধু সঙ্কুচিত স্বার্থের সাধনের জন্যেই হতে পারে। সন্তানের জন্য স্বভাবতই মাতা পিতার প্রেম হয়ে থাকে। একক ভাবে তাকে বেঁধে রাখা কম কষ্টসাধ্য। কিন্তু এর দ্বারা মানব মাত্রের প্রেমের প্রসার করা যায় না। সম্বন্ধ নিষেধ করে সাম্য-ধর্মের করা ত আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়, কি বল কবাত ?

—তুমি কবাতের মনের কথাই বলেছ সুন্দরী। বললো কবাত।

—অবশ্য আমি অস্বাভাবিক বলেছি আমার সাধারণ দৃষ্টিতে। এক আধজন এমন ব্যক্তিও আছেন যারা নিজ উচ্চ আদর্শে তন্ময় হয়ে ওদিকে আকৃষ্টও হন না।

সুবর্ণাক্ষীর কথায় নীলাক্ষী অসন্তোষ প্রকাশ করে বলে,

—তারই বা প্রয়োজন কি বোন? পাশে সদ্যফোটা সুন্দর গোলাপ ফুলকে দেখে তার সুগন্ধ শুঁকে দেখার ইচ্ছা কি অন্যায়? যদি সুবর্ণাক্ষীর দীর্ঘ নেত্রচ্ছটায় আকৃষ্ট হয়ে কেউ চুম্বন করে, তাহলে এমন কি ক্ষতি হয়। সিয়াবখ্‌শের মত প্রশস্ত ললাট, তুঙ্গ নাশা, পীত শ্মশ্রু, কম্বু গ্রীবা, বৃষ স্কন্ধ ও পীনউরস্ক পুরুষকে দেখে যদি কোন সুবর্ণাক্ষী, নীলাক্ষী বা সম্বিকা একবার স্পর্শের জন্য আকৃষ্ট করে, তাতে এমন কি অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে? আমি ত মনে করি, প্রেম জীবনের স্বাভাবিক রস, তবে আমাদের প্রত্যেক জিনিষের "অতি" হতে দেওয়া উচিত নয়। সব কিছুই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

—অর্থাৎ মধ্যমার্গে থাকা উচিত, কি বল ? বলে মিত্রবর্মা।

—ঠিক বলেছ মিত্র। কিন্তু এখন আমরা অন্দর্জগরের কাছে শুনতে চাই।

—ঠিকই বলেছ তুমি নীলাক্ষী। সব কিছুই সীমার অন্তর্গত

হওয়া উচিত। তাতেই তাকে সুন্দর দেখায়, তবেই জীবনের প্রতি অঙ্গের সামঞ্জস্য থাকে। যদি প্রেমের পরিণাম দুইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হত তাহলে মানুষ দেবতা হতে পারত।

—দেবতারাও ভিন্ন হয় না অন্দর্জগর। বলে মিত্রবর্মা। আমাদের শাস্ত্রে আছে, মেনকা, রম্ভা আদি দেবীরাও তাদের প্রেমের পরিণাম সন্তান ছেড়ে চলে গেছে।

—সন্তানকে অনাথ করে চলে যাওয়া বড়ই ক্রুরতা। মন্তব্য করেন অন্দর্জগর।

—এমনই এক প্রেমের পরিণাম ছিল সুন্দর শিশু শকুন্তলা। যার কথা নিয়ে আমাদের দেশের এক মহাকবি কালিদাস নাটক লিখেছেন।

—নাটক ? অভিনয় করা নাটক ?

—হ্যাঁ। কিন্তু তার বিষয়ে পরে কখনও বিস্তারিত শোনাব। এখন আমরা আপনার কথা শুনতে চাই।

—আমি ত ভাইদের সম্মিলিত বিবাহ প্রথা নিজ পরিবারের পক্ষেই উপকারক বলে মনে করি। তাছাড়া নিজ গুরুদের প্রবর্ত্তন করা নিয়ম বিবাহ-নিষেধ প্রথাও কিছু সংখ্যক সাধু-সন্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব। আমাদের এমন এক আদর্শ সামনে রাখতে হবে, যার মধ্যে বিষমতার স্পর্শ না লাগতে পারে। তাই আমি দেখছি বিবাহ-প্রথা সন্তানদের মধ্যে "আপন-পর" ভেদভাব সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এবং সেই জন্যেই মাতাপিতা সমতার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে চায়। এখানে এই দিহবগানে দেখছ ত, আমাদের সুন্দর সুন্দর বালিকারা তাদের মাতাপিতা কে তা জানবার প্রয়োজনই মনে করে না। প্রয়োজন হলে সে শুধু তার মায়ের নাম নিতে পারে। এখানে এমনি বাতাবরনে পালিত হওয়া সন্তানের বয়স পঁচিশ বৎসর হয়েছে, যাদের সংখ্যা কম নয়। তারা পুরোনো ভাবধারা বুঝতেই পারে না। দিহবগানেও যদি সন্তান ও পিতার

আপন-পর ভাবনার সৃষ্টি হয়, তাহলে নিশ্চয় এই সমানতা লুপ্ত হতে বেশী দেরী লাগবে না।

—কাবুসও এখানে এসে কবাতকে ভুলে গেছে, অন্দর্জগর। বললো সম্বিক।

—আচ্ছা, আচ্ছা! তোমাকে ত ভোলেনি, তাতেই আমার হবে। ব্যঙ্গ করে বললো কবাত। এই কথায় তিনজন তরুণী সমস্বরে বলে ওঠে,—মাতাদের এজন্য বিশেষ অধিকার আছে। মাতাদের এই অধিকার সামাজিক সমতায় বাধা সৃষ্টি করে না।

—তাহলে বিষমতার মূলে বুঝি পুরুষরা? তিনজন পুরুষ একসঙ্গে বললো।

—কোনও কাজেরই মূল এক বা কারণ এক হতে পারে না। অনেক কারণ মিলে এক রোগের সৃষ্টি করে। সেইজন্যেই আমাদের উচিত এই সমতার পথের সকল কাঁটাকে মিলিতভাবে তুলে ফেলা। মানব জাতি দুঃখের থেকে দূরে সুখে যদি বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে সে সুখ একমাত্র সমানতার মাধ্যমেই নিয়ে আসা সম্ভব।

চতুর্দশ অধ্যায়

॥ ক্ষু গচ্ছামি ॥

মানুষের শ্রমের ফল ক্ষেতে এবং উদ্যানে পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছে। এ বৎসর ফল এবং ফসল জন্মেছে প্রচুর পরিমাণে। ফসল বোনা ও জোতবার সময় যেমন উদ্যম দেখা গেছিল, ফসল কাটবার ও ফল পাড়বার সময়ও দিহবগানের অধিবাসীদের মধ্যে তেমনি উৎসাহ। ফসল তুলবার কাজে তাদের দিন রাত্রির কথা মনে থাকে না। তারপর আসবে সঞ্চয়ের কাজ।

আঙ্গুরগুচ্ছ শুকোবার জন্য বিশেষ প্রকারের ঘর তৈরী করা হয়েছে। যার ছাতে, দেয়ালে, ঘরের মধ্যে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আঙ্গুরের থোকা। ফল সঞ্চয়ের কাজে বালক বালিকাদের তৎপরতা বিশেষ লক্ষণীয়। তবে একথা সঠিক করে বলা যায় না তারা সত্যিই সঞ্চয়ের কাজে সহায়তা করতে যেত, না কাজের অছিলায় মাঝে মাঝে দুচারটার সদ্ব্যবহার করবার জন্য যেত। তাছাড়া বাগিচায় গিয়েও কাজ করে তারা। গাছ থেকে ঝরে পড়া ফলগুলিকে তৎপরতার সঙ্গে কুড়িয়ে জমা করতে ওদের সঙ্গে তরুণ বা বয়স্করা পেরে ওঠে না।

প্রকৃতি নিজের যৌবনকাল পেরিয়ে চলেছে। পাহাড়ের উপরি-ভাগের গাছগুলির পাতা হলুদবর্ণ ধারণ করেছে। নিচেয় এখনও তেমন ঠাণ্ডা পড়েনি। গ্রামের সকল ঘরাটগুলি (আটা পেষণ করবার যন্ত্র) শীতকালের জন্য আটা তৈরীর কাজে ব্যস্ত। ওদিকে সবুজ ঘাস কেটে ঘরে তোলা হচ্ছে গৃহপালিত পশুদের জন্য। ঘাস ক্রমশঃ ফুরিয়ে চলেছে। ঢোর, ভেড়া প্রভৃতি রোমশ জন্তুর দেহ সম্ভাব্যানুসারে মোটা হয়েছে। দিহবগানে মাংস খাওয়ার প্রচলন

নেই, তাহলে এই সময়ে ঐ সুন্দর-স্বাস্থ্য পশুদের অনেকে কাটা পড়ত। দিহবগান তাদের পশুদের শীতকালীন আহার যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করতো বলে পরের ঋতুতে তাদের পশুগুলির স্বাস্থ্য একই প্রকার বজায় থাকতো। গ্রামের থেকে দূরে দূরে এমনি অনেক পশুশালা তৈরী আছে, যেখানে পশুদের লালন-পালন করবার সকল রকম সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

একদিকে দিহবগানের নরনারীরা শীতের পাঁচ মাসের জন্য, জ্বালানী, খাওয়া দাওয়ার সকল বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত, অন্যদিকে আর এক যোজনার প্রস্তুতি চলছে। এই যোজনার বিষয়ে খোলা-খুলি বিচার করবার জন্য একটা ঘরে অন্দর্জগর সিয়াবখ্শ, কবাত, মিত্রবর্মা ও সন্বিক একত্রিত হয়েছে। অতিথিরা আজ ছয় মাস যাবত দিহবগানে বাস করছে। বাইরের সংবাদ এদের কাছে নিয়মিত ভাবে আসছে, তাই বাইরের কোন বিষয়েই এরা অজ্ঞাত নয়। তবুও কবাতের চিন্তার যেন শেষ নেই, অনুশ্বর্তের কারাগার থেকে কবাতের পলায়নের পর তার শত্রুরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। গত ছয় মাস যাবত সমগ্র ইরান পাঁতি পাঁতি করে খোঁজ করা হচ্ছে। দিহবগান যদি একলা গ্রাম এবং দুর্গম্য পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত না হত তাহলে এতদিন হয়তো কবাত ধরা পড়ে যেত। এদিকের কথা চিন্তা না করবার একটা বিশেষ কারণ হল এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা দেরেস্তদীনের গুপ্ত অনুগামী ছিল! এই অধিকারী লোক দেখাবার জন্য যেমন বিরাট অভিযান চালিয়েছেন কবাতকে খোঁজ করবার জন্য, তেমন আর কোন প্রদেশ-প্রধান করেনি। নেশাপোরএর কনারঙ্গ, গর্জিস্তানের বরাজবন্দ, জাবুলিস্তানের পীরোজ অথবা কির্মানশাহের শাহ কেউই এতখানি তৎপরতা দেখায়নি। কিন্তু একই জায়গায় চিরকাল লুকিয়ে থাকাও কবাতের পক্ষে অসম্ভব। কারণ এতে আর মৃত্যুতে পার্থক্য কি? বেশ বদল করে অন্দর্জগরের অনুগামীদের মধ্যে সারাজীবন কবাত থাকতে পারে নিশ্চিন্তে, কিন্তু এতে

কবাতেরও যেমন কোনও ভবিষ্যৎ নেই তেমনি দেরেস্তদীনেরও কোনও লাভ নেই।

আজ সেই কথাই আলোচনা হচ্ছিল। কবাতকে কোথায় পাঠানো যায়, কোথায় সে সাহায্য পেতে পারে যাতে কবাত আবার তম্পোনের সিংহাসনে বসে দেরেস্তদীনের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে সহায়তা করতে পারে। মিত্রবর্মা নিজ বিচার ধারা প্রকাশ করে।

পূর্ব্বদিকে ভারত বা চীন সমুদ্রপথে যেতে পারে। কিন্তু চীনদেশ থেকে সৈনিক সহায়তা পাওয়া অসম্ভব। চীন যেমন বহুদূরে তেমনি আজকাল কয়েকটা রাজবংশ ভাগ করে শাসন করছে, অতএব সে আশা বৃথা। কম্বোজ এবং যবদ্বীপএর কাছে কোনও আশাই নেই। তারপর ভারতের দক্ষিণভাগে পল্লব, কাদম্ব এবং গঙ্গ তিনটি প্রভাবশালী রাজবংশ আছে।

—পল্লব মানে আমাদেরই পল্লব ত ? বলে সিয়াবখ্‌শ।

—হ্যাঁ সেই পল্লবই এখানকার পল্লব। যদিও তার অন্য দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য আগেকার মত আর সবল নেই, তবুও আড়াই শ বৎসরের পল্লব রাজলক্ষ্মী এখনও বৃদ্ধা হয়নি।

—পল্লব আমাদের স্ববংশী। এতে আমরা আশা করতে পারি তারা আমাদের নিশ্চয়ই হতাশ করবে না। সবল থাকার জন্য সহায়তা নিশ্চয় করবে বলে আমার মনে হয়।

—হতাশ করবে না তা আমিও জানি। তারা বরং কবাতকে মাথায় তুলে নেবে। কিন্তু কথা হল পল্লব বাহিনীর পক্ষে সুদূর সামুদ্রিক জাহাজে করে এসে তম্পোনের উপর অধিকার স্থাপন করা সম্ভব হবে কি না। এসে পৌঁছানো যদিও সম্ভব ; কিন্তু সাফল্য লাভে সন্দেহ আছে। অন্দর্জগর বললেন।

—আমারও তাই মনে হয়। এ অসম্ভব। জলসেনা দ্বারা তম্পোন অধিকারএর চেয়ে স্থলসেনার দ্বারা অধিকার করা খুবই

সহজ। তিগ্রার মধ্যে প্রবেশ করতেই তপোনের মজবুত স্থল-সেনার সঙ্গে প্রথম লড়াই করে জিততে হবে। অতএব জলপথে সৈনিক সহায়তার আশা করা যায় না।

—তা বলতে গেলে ভারতের উত্তর রাজ্য চিরকাল স্থলসেনায় সবল থেকে এসেছে, কিন্তু তারা কখনও কাবুলের এপারে এসেছে বলে আমি শুনিনি। আজকাল গুপ্তবংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার পর কয়েকটা রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া তাদের এক বিরাট অংশ হুনজাতি দখল করে বসে আছে।

—ঠিক হুনরা নয়, কেদারীয় জাতি। বলেন অন্দর্জগর। এরা ঠিক হুনজাতি নয়। বস্তুতঃ সোগ্দ দেশের উত্তরে মহানদীর পারে হুনরাজ্য স্থাপন হবার পর থেকে গত চার পাঁচ শ বৎসর যাবত পুরানো শকদ্বীপকে হুনদেশ বলে ধরা হয়ে থাকে। সেখানকার কুষাণ পার্থিয় প্রভৃতি শকজাতি দক্ষিণভাগে চলে এসেছে কিন্তু তবুও অনেক শকবংশ এখনও রয়ে গেছে যাদের আজ হুন বলা হয়। নিজ জনপতি কেদারের নেতৃত্বে তারা দক্ষিণ দিকের সোগ্দ, খারেজম্, বখ্ত্রী, কপিশা এবং হিন্দদেশের বহুস্থান দখল করে রাজ্যবিস্তার করেছে। যদিও তারা শত্রুদের সঙ্গে হুনদের চেয়ে কম বর্ব্বরতা দেখায়নি। সেই জন্যেই লোক এই কেদারীয়দেরও হুন বলে থাকে। কিন্তু কেদারীদের কথা এখন থাক। অন্য কথা বলো। যেখানে কবাত গিয়ে আশ্রয় এবং সৈনিক সহায়তা দুইই পেতে পারে।

—আমাদের পশ্চিমী পড়শী রাজ্য খুব কাছে এবং সবল। মন্তব্য করে সিয়াবখ্শ।

—অর্থাৎ রোমক কৈস্র ? প্রশ্ন করে মিত্রবর্ম্মা।

—হ্যাঁ। রোমক কৈসরকে সমুদ্র পার থেকে সৈনিক আনতে হবে না। আমাদের রাজধানী থেকে কয়েকদিনের পথ হুফ্রাতের তীরেই তার বিরাট শক্তিশালী দুর্গ রয়েছে।

—কিন্তু সিয়ারখ্শ, তুমি অন্যদিকে ভেবে দেখছ না। বললেন

অন্দর্জগর। আমি স্বীকার করছি যে জরথুস্তী এবং খৃষ্টান এরা পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মের হলেও চিরকালই ইরানী ও রোমক একে অপরকে সাহায্য করে এসেছে। তাছাড়া নিজ স্বার্থের জন্য অনুকূল অন্য লোককেও সেনা সহায়তা করেছে। কিন্তু কবাতকে তারা সহায়তা করতে রাজী হবে না। কারণ কবাত এমন বিচার ধারার সমর্থক যাকে মজ্‌দয়স্নীরা এবং খৃষ্টানরা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। এমনও হতে পারে কবাতকে তারা আশ্রয় পর্যন্ত দেবে না।

—ঠিক বলেছেন। সেদিকেও আমাদের নজর রাখতে হবে। দেরেস্তদীন কেবল ধর্ম্মের কথাই বলে না, তাহলে অনেক মতভেদীর জায়গাও হত এখানে। দেরেস্তদীন স্বল্পজন নয় বহুজনহীতায় সংঘর্ষ করছে। যেখানে সে নিজের কথা অন্যকে বোঝাতে পারে। ইরানে সেই জন্যেই লোকে একে এত মান্য করে।

—শুধু ইরানে কেন, উত্তরের ঘুমন্তদের মধ্যেও আমাদের দূতরা বিশ্বাস স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে। তাই এদিকটা চিন্তা করে দেখিনি। এখন মনে হচ্ছে রোমক সম্রাট মজদকী কবাতকে কখনই সাহায্য করবে না। বরং ভয় হয় হয়ত বিশ্বাসঘাতকতা করতেও পারে। আচ্ছা উত্তরের ঘুমন্তদের সম্বন্ধে ভেবে দেখলে কেমন হয়।

—উত্তরই বলো আর উত্তর পূর্ব্বের বলো ওদিকেও তেমন আশা দেখি না। বললেন অন্দর্জগর। উত্তরের ঘুমন্ত খজার আজকাল তেমন সবল নয়।

তাদের নিজেদের মধ্যের একতা ভেঙ্গে পড়েছে। দশ পাঁচ হাজার সেনা নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে লুঠপাট করা অন্য কথা। ইরানী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়লাভ করা অন্য কথা। তম্পোন পর্যন্ত ওরা পৌঁছতেই পারবে বলে মনে হয় না।

—তাত নিঃসন্দেহে। তম্পোন পৌঁছতে হলে পথিমধ্যে ইবের (গুর্জর) অর্মনী প্রভৃতি যোদ্ধারের সঙ্গে লড়াই করে জয়লাভ করে

তবে আসতে হবে। খজার ঘুমন্তদের পক্ষে অতখানি সাফল্যলাভ করা কঠিন।

—তাহলে ত দেখছি একমাত্র কেদারীই শেষ অবলম্বন থেকে যায়। বললো মিত্রবর্মা। আজকাল কেদারীরা বেশ শক্তিশালী। তার প্রমান, ভারতবর্ষও তাদের নাম শুনে ভয়ে কাঁপে। কেদারী সম্রাট তোরমানই ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। "সদ্য মুণ্ডিত মস্ত চুনচিবুকাপ্রস্পর্ধি নারঙ্গক" দের দেখলেই ভয়ে পিলে চমকে যায়।

—বল কি মিত্র? ভারতবর্ষে কি বীরত্ব বলে তবে কিছুই অবশিষ্ট নেই? অন্যমনস্ক হয়ে বললো সিয়াবখ্শ।

—তা নয় ভাই। বীরত্বের অভাব কখনই নেই ভারতে। কিন্তু সেই বীরত্ব তারা যখন পারস্পরিক দ্বন্দে খরচ করে ফেলে, তখন বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করবার মত আর অবশিষ্ঠ থাকে না। হিংসা ভয়ানক ক্ষতিকর। শুধু হিংসা নয়, আমাদের দেশে আরও একটা নিয়ম অথবা অনিয়ম যাই বলো সবচেয়ে খারাপ জিনিষ, সেখানে যুদ্ধ বিগ্রহ কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় জাতিরই অধিকার বলে মান্য করা হয়। অর্থাৎ এক-শ'য়ে কেবলমাত্র পাঁচ ব্যক্তি যুদ্ধে যাবার অধিকারী।

—ইরানের ধর্মগুরু বা রাজপ্রধানও এখানে এমনি বাঁধ বেঁধে-ছিলেন। বলে কবাত। কেবলমাত্র সামন্ত এবং ক্ষত্রিয়রাই যুদ্ধের অধিকারী ছিল। কিন্তু পড়শী শত্রুদের সঙ্গে কয়েকবার লড়াই করবার পর কিষান শিল্পীদেরও অস্ত্রধারণ করবার অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছে।

—তা যাই বলো আমাদের পড়শীদের মধ্যে একমাত্র কেদারী ঘুমন্তরাই অধিক শক্তিশালী। গত পঞ্চাশ বৎসর যাবত তাদের শক্তি উত্তোরোত্তর বেড়ে এসেছে। বললেন অন্দর্জগর।

কবাত বলে,—যখন থেকে আমার ঠাকুর্দা দ্বিতীয় যজ্দগর্দকে

যুদ্ধে নিহত করেছে তখন থেকে। আমি ছোটবেলায় কয়েক বৎসর তাদের কাছে থেকেও এসেছি। যুদ্ধের সময় যাই হোক না কেন, তারা সত্যিই ততখানি ক্রুর নয়।

—তার কারণ তাদের মজ্‌দকী ভয় স্পর্শ করতে পারেনি। যদিও কেদারী সামন্ত এবং রাজারা এখন রাজকীয় আদপ-কায়দায় বাস করতে স্থরু করেছে তবুও তাদের মধ্যে এখনও ঘুমন্ত জনের প্রাবল্যই অধিক দেখা যায়। তাদের রাজা অপরের জন্যেই রাজা। কিন্তু নিজেদের মধ্যে জন ইচ্ছানুবর্ত্তী জনপতি ভিন্ন আর কিছু নয়। তাছাড়া বর্ত্তমান কেদারী রাজা কবাতের নিকট সম্বন্ধী।

—হ্যাঁ, সে আমার ভগ্নীপতি। আমি যখন তার কাছে ছিলাম, তখন তার পুত্র (মিহিরগুল) মিত্রকুমারের সঙ্গে আমার বিশেষ প্রেম ছিল। আমরা দুজনই সমবয়সী। শৈশবে আমরা দুজনেই খেলার সাথী ছিলাম। তাছাড়া আমার ভগ্নীও সেখানে উপস্থিত রয়েছে।

—কেদারী হুনদের আমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা হুন বলে থাকি। বলে মিত্রবর্মা। যদিও হুনদের নামের সঙ্গে এমন এক বর্বরতা জড়িত রয়েছে যা কল্পনাও করা যায় না। তবে আমার মনে হয় কেদারীদের মধ্যে তেমন স্বভাব নেই। ধর্মের ব্যাপারে তারা আরও উদার। উত্তর ভারতের গোপগিরি (গোয়ালিয়র) তে রাজা তোরমান অদ্ভূভ স্থন্দর এক সূর্য্যমন্দির নির্মান করেছে। লোকে বলে এমন কলাপূর্ণ মন্দির গুপ্ত বংশের আমলেও কোথাও তৈরী হয়নি।

সম্বিক মিত্র বর্মাকে বললো,

—মিত্র কিছু আগে তুমিই ত বলেছ যে, কেদারী হুনরা বৌদ্ধদের দেখতে পারে না।

—বলেছি সম্বিক। তবে তার কারণ ধার্মিক অসহিষ্ণুতা নয়। কেদারী হুনরা কুষানদের উত্তরাধিকারী। সোগ্দ, কপিশা থেকে শুরু করে ভারতের মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত কুষান রাজ্য তারাই ধ্বংস

করেছে। মূলতঃ এরা দুই পক্ষই শক জাতি। কিন্তু কেদারী সনাতন ঘুমন্তদের ভূমি থেকে তখন নতুন এসেছে, তাই শতাব্দী যাবত রাজ্য শাসন ও ভোগ দখলকারী কুষানদের মত তখনও ততখানি কোমল হতে পারেনি। কুষানদের মত নাগরিক শিক্ষা পায়নি। কিন্তু অত সহজে কুষানরা তাদের অস্ত্র ত্যাগ করেনি। দুই পক্ষে ভীষণ সংঘর্ষ চললো। সে সময় কুষান কনিষ্ক রাজা হবার পর থেকে বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিল, সেজন্য বৌদ্ধদের কুষানদের প্রতি অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু কেদারী কেমন করে বৌদ্ধদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারে? শত্রুর ধর্ম। কিন্তু আমাদের এখন সে সব বিচার করতে গেলে চলবে না। এখন আমাদের দেখতে হবে তারা কবাতকে কেমন স্বাগত করবে এবং সহায়তা করতে রাজী হবে কি না।

—সহায়তা নিশ্চয় পাবে এবং আশাতীত ভাবে পেতে পারে। দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন অন্দর্জগর। তবে সেটা কোনও পরমার্থের বিচার ধারার বশবর্তী হয়ে নয়। কেদারীদের মধ্যে এখনও তাঁবুতে বাস করবার সংখ্যা বহু রয়েছে। এখনও সামান্য পশু পালন করা ছাড়া লুঠপাট, যুদ্ধ বিগ্রহই বেশী পছন্দ করে তারা। কেদারী জনপতি কবাতের মুখ দেখেই সহায়তা করবে বলে মনে করলে ভুল করা হবে। তারা এমনই এক জাতি, বাইরে লুঠপাট করতে সুযোগ না পেলে নিজেদের মধ্যেই লড়াই করতে আরম্ভ করবে। অতএব জনপতিকে নিয়মিতভাবে তাদের যুদ্ধ বিগ্রহ লুঠপাট করবার ব্যবস্থা করে দিয়ে তার সমর্থকদের শান্ত রাখতে হয়। কেদারী রাজা জানে যে এখন যদি তার সমর্থকদের একটা যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে কিছুদিন পরেই তার অমন সাধের সাজানো গোছানো রাজধানী বরখশা একদিনেই ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। কেদারী সেনা যখন কবাতকে নিয়ে তস্পোনে উপস্থিত হবে, তার আগে পথের মধ্যে কত সুন্দর গ্রাম নগরী তারা প্রাণ খুলে লুঠ করতে পারবে। তাছাড়া তাদের রাজাও বৎসর বৎসর দীনারের বস্তা নিয়মিত পেতে থাকবে।

এই প্রলোভন এমন ভয়ানক, যে এ সুযোগ তারা কখনই হাতছাড়া করবে না।

—তাহলে ত কথাই নেই। এখন প্রশ্ন হল কেদারী সীমা অবধি পৌঁছনোর কথা। বললো সিয়াবখ্‌শ। রাস্তায় যদিও পদে পদে বিপদ আছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আমাদের ধর্ম ভাইদের সাহায্যে কবাতকে হুন সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে কোনও অসুবিধা ভোগ করতে হবে না।

অন্দর্জগর উপসংহার করে বললেন।

—অতএব সর্বসম্মতিক্রমে কবাতকে হুনদের কাছেই যাওয়া ঠিক হল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

॥ লোলিদের সঙ্গে ॥

—এই পর্বতমালা কি সর্বদাই হিমাচ্ছাদিত থাকে ?

—আজকাল কোন এমন পাহাড় আছে যা বরফে ঢাকা থাকে না ? তবুও হিমপাত হতে এখনও দুই মাস দেরী আছে।

—তাহলে এই পর্বত নিশ্চয় খুব উঁচু হবে ?

—উঁচু কতখানি তা কাছে গেলেই বুঝতে পারবে। আমি শুধু জানি এর শিখর থেকে কখনও হিম নষ্ট হয় না। এইজন্যে একে হিমবন্ত (দমাবন্দ) বলে।

—আশ্চর্য লাগছে। ভারতবর্ষের মহান পর্বতের নাম এখানে কি করে এল ? বলে মিত্রবর্মা।

—চলে আসার কি দরকার। বরফকে যখন হিম বলা হয় আর বরফাস্তীর্ণ পর্বতকে হিমবন্ত, হিমওয়ালা, (হিমালয়) বলতে দোষ কি ?

এমনি নিজেদের মধ্যে নানাপ্রকার কথা বলতে বলতে দুইজন তরুণ যুবক গাধার পিঠে বসে পথ চলছিল। কিছুদূর যেতে গ্রামের বাইরে খালধারে একজন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। যুবকদ্বয়কে দেখে স্ত্রী উঠে এসে বললো,

—দেবর ! আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। এত দেরী হল কেন।

—বৌদী দেরীর কথা আর জিজ্ঞাসা করো না। এ সব তোমার গাধার কেরামতি। চলতেই চায়না যেন। ওর ইচ্ছে ও এই গ্রামেই থেকে যাবে।

—না দেবর, আমরা অনেক দেরী করে ফেলেছি। আমাদের দলের লোকেরা এতক্ষণ অন্য গ্রামে পৌঁছে তাঁবু টাঙ্গিয়ে ফেলেছে।

—আমরা ত যেতে চাইছি কিন্তু তোমার পক্ষীরাজ যে যেতে চাইছে না।

—চলতে চায় না ত এইখানে ছেড়ে দাও ওদের।

—উহুঁ সেটী হবে না। বলল প্রথম পুরুষ। ওদের যদি কাঁধে করেও নিয়ে যেতে হয় তবুও ওদের সঙ্গেই যাব।

—বেশ, তবে দেখ ওদের চলবার ওষুধ আছে আমার কাছে। কথা শেষ করেই স্ত্রী তার হাতের লাঠিটা দিয়ে গাধা দুটোর পিঠে কষে কয়েক ঘা বসাতে সত্যিই তারা বেশ জোরে জোরে চলতে থাকে। তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত, একটা মেয়েছেলের কাছে গাধা চালানো শিখতে হবে।

—বৌদীরাই শিখিয়ে থাকে দেবরদের।

—কিন্তু তোমরা ত আর কচি খোকাটি নও।

—তোমার কাছে নিশ্চয়। তাছাড়া তুমি ত জানো তোমার দেবর শিখতে পিছু হটে না। দু একবার বলে দিলেই সব শিখে যাব।

—ঠিক বলেছ। এখন চুপ করো, গ্রামের বাইরে গিয়ে আবার কথা হবে।

গ্রাম খুব বেশী বড় নয়। তবে রাস্তাটী প্রধান বনিকপথ বলে প্রায়ই ছোট বড় ব্যাপারিক সার্থ চলাফেরা করছে। এদের দ্বারা গ্রামবাসীদেরও রোজগার কম হয় না। গ্রামের বাইরে অনেক আপেলের বাগান আছে। দরকার মত সামান্য মূল্যে পাওয়া যায়। এমনি জনবহুল রাস্তায় দুজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীকে রাস্তা চলতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কে কার দিকে তাকায়, যে যার রাস্তায় চলেছে আপন মনে। ওদের বেশভূষার অবস্থা ত আরও সঙ্গীন। ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত পোষাক। শরীরের দিকে তাকালে মনে হয় বোধ হয় এক যুগ হাত পা ধোয়নি। গাধা দুটীও তেমনি রোগা হাড় জিরজিরে, আর তাদের পিঠের বোঝাও লতাপাতা বই আর কিছু নয়। অতএব এদের দিকে কে আর তাকিয়ে থাকতে চায়।

গ্রামের পথ ছেড়ে স্ত্রী গান আরম্ভ করে। গান শুনে অবশ্য অনেকে ওর দিকে এক আধবার তাকিয়ে দেখেছে। কারণ স্ত্রীর কণ্ঠ ভারী মিষ্টি। কিন্তু এই জাতীয় লোলী গায়িকাদের নাচ গান এই গ্রামে এমন কিছু নতুন কথা নয়। নাচ গানই এদের জীবিকা। তবে অন্যান্যদের মত এখানকার লোকরাও এই লোলীদের ভীষণ যাদুকর বলে ভয় করে। মাতারা বিশেষভাবে তাদের সন্তান সম্বন্ধে সাবধান হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চুরি করাও লোলীদের একপ্রকার ব্যবসা। তিনজনকে এমনি গ্রামের পথ ধরে যেতে দেখে স্থানীয় সকলে সতর্ক হয়ে যায়।

গ্রামের বাইরে যেতে একটি দুই তিন বৎসর বয়সের বালককে রাস্তার উপর খেলা করতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে বোধ হয় তার মা সংকেত পেয়ে গেছে, মা ছেলেকে অনেক ডাকাডাকি করে, ছেলের ভ্রুক্ষেপ নেই। সে তার মনে রাস্তার উপর বসে মাটীর ঢিবি তৈরী করছে। অথচ লোলীরাও প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, এবার মায়ের ধৈর্য্য থাকে না, ছুটে এসে ছেলেকে মারতে মারতে টেনে হিঁচড়ে বাড়ী নিয়ে যায়।

কে জানে যদি ঐ যাদুকররা ওকে থলির মধ্যে করে নিয়ে যায়। ওদের আবার বিশ্বাস আছে নাকি। যাদুবলে মানুষকে মাছি করে রাখে যারা।

গ্রামের শেষে কিছুদূর যেতেই পাহাড়ী উঁচু নীচু পথ। দুই পাশে ন্যাড়া পাহাড়। এদিকে পক্ষীরাজ দুজনই বুঝতে পেরেছে লাঠ্যৌষধি কি জিনিষ, তাই স্ত্রীর কাশির শব্দ শুনতেই আবার গা ঝাড়া দিয়ে জোরে জোরে বলতে থাকে।

—দেখেছ এরা আমাদের কি দৃষ্টিতে দেখছে? বললো স্ত্রী।

—হ্যাঁ, বড়ই ঘৃণা ও শঙ্কার দৃষ্টিতে দেখছে ওরা।

—ঘৃণা সবাইকে করে থাকে কিন্তু শঙ্কার দৃষ্টিতে সকল লোলীদের

দেখা উচিত নয়। লোলীদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের সঙ্গীতের মান রাজ দরবারেও সুপ্রতিষ্ঠিত।

—তাহলে তাদেরও কি ওরা এমনি ঘৃণার চোখে দেখে ?

—তাদের শরীরে থাকে মূল্যবান পোষাক কোমরে থাকে দীনারের থলি, সঙ্গে থাকে দাস দাসী। এই গ্রামবাসীদের পক্ষে তাদের দর্শন করবার সুযোগই হয় না। যদিও চিনতে পারে তবে মায়েরা তাদের সন্তান সম্বন্ধে নিশ্চয় সতর্ক হয়ে যাবে। আমাদের কোলে গৌরবর্ণের শিশুকে দেখে ওরা বলে এই কালো লোলীদের কাছে ইরানীদের মত শিশু কোথা থেকে এল ? নিশ্চয় চুরি করেছে। এই হল লোলীদের জীবন।

—আচ্ছা বৌদী! তুমি ত ভারতবর্ষ দেখেছ, সেখানে চলে যাওনা কেন ?

—ভাই দেবর, আমার মনে আছে যে আমি ভারতীয়। সেখানকার ভাষাও আমি ভুলিনি। অবশ্য আমাদের এমন অনেকে অর্মনী ও ইবের এ গিয়ে নিজ ভাষা ভুলে গেছে। অনেকে আছে সেই সব দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের এমন ভাবে মিলিয়ে নিয়েছে যে এখন তারা নামে মাত্র লোলী। আমার দশ বৎসর বয়সে আমি ভারতে গেছিলাম। এখনও স্পষ্ট মনে আছে সেখানকার শষ্যশ্যামল বনভূমি, সবুজ প্রান্তর আর পাহাড়ে ঘেরা পার্বত্য অঞ্চল। বড় বড় নদী আর সভ্য জনপদ। এখানে তা কোথায় পাবো।

—কিন্তু ইরানের মেওয়া খুবই মিষ্টি হয়।

—তা হলেও ভারতের আম এখানে কোথায় পাবে ?

—ও হো, তুমি এখনও সে কথা ভুলতে পারোনি ?

—পাগল, নিজের দেশ কেউ কখনও ভোলে ? দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে আবার বলে, আমাদের ভাগ্যে একস্থানে বেশীদিন থাকা ত লেখা নেই ভাই। আমাদের পায়ে চাকা বাঁধা থাকে। আজ এখানে ত কাল এক যোজন দূরে।

—তাহলেও তোমাদের দেশ দেখবার আনন্দ হয় প্রচুর।

—দেবর! আমাদের জীবনেও আকর্ষণ আছে, রস আছে। তাইতো আমরা চিরকাল ঘুরে ঘুরে বেড়াই। লোলীদের বেঁধে রাখা যায় না। রাজ্যের সীমাও আটকায় না এদের।

—তাহলে একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যেতে তোমাদের অসুবিধা হয় না?

—অসুবিধা হলেও আমরা সে সব গায়ে মাখাই না। গত বৎসর বসন্তকালে ছিলাম রোমক রাজ্যের ভিতর, আজ ইরান ছেড়ে চলেছি। অর্দ্ধেক ইরান দেখা হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। আবার কাল বা পরশু তেহরান গিয়ে পৌঁছব। শীত শেষ হতে হতেই আবার আমরা হুন রাজ্যের সীমানা পার হবার আশা করছি। সকল দেশের সীমান্ত সৈনিকরা জানে লোলীদের কাজই একজায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ান। যদি কোথাও কড়া নজর দেখতে পাই ত দু-চারটে গানের বাজে খরচ, ব্যাস।

—চমৎকার। তোমাদের এই জীবন আমার ভীষণ ভালো লাগছে। কিন্তু……

—কিন্তু কি দেবর? আমাদের লোলীরা ত মজদক বাবার ধর্ম মেনে নিয়েছে। তবে সেটা আন্তরিক। বাইরে প্রকাশ করবার ক্ষমতা নেই কারও। "কিন্তু" যদি বলতে চাও, তাহলে আমার বিশ বৎসর বয়স্কা বোন "বর্দকা" (লাল গোলাপ) তোমার জন্য প্রস্তুত।

—তুমি কি বলছ বৌদি? দেবরকে এমনি করে ঠাট্টা করতে আছে?

—না ভাই। চলতে চলতে স্ত্রী পুরুষের একটা হাত ধরে কিছু অন্য মনস্ক ভাবে বলে, তবে বৌদীকে ছেড়ে যেওনা কখনও, এই আমার অনুরোধ।

—তুমি ত জানো বৌদি, ছাড়া না ছাড়া আমার হাতে নয়।

—সবই জানি, কিন্তু যখনই মনে হয় যে তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে, তখন আমি ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ি।

—এখুনিই ত আর ছেড়ে যাচ্ছিনা। এখনও খুরাসান এবং গুরগান এর রাস্তা পর্যন্ত আমাদের এক সঙ্গেই থাকতে হবে।

—আমি ভাবছি দেবর! তোমাকে কেমন করে বেঁধে রাখি।

—মনে মনে বাঁধাই আছি। তুমি ত শুধু বৌদী নও, আমার গুরুও বটে। গত তিন সপ্তাহে তোমার কাছে কত কী যে শিখলাম। সে কি জীবনেও ভুলতে পারব?

—সত্যিই দেবর। এখন সত্যিই তুমি লোলী হয়ে গেছ। আর উনি ত কথাই বলেন না।

—দেবর বৌদীর কথার মধ্যে মাথা গলানোর পরিণাম যে কত ভয়ানক, তা যারা জানে তারা জীবনে কখনও অমন কাজ করবে না। দেখছই ত তোমাদের কথাবার্ত্তা কেমন মন দিয়ে শুনছি। তবে মাঝে মাঝে যখন অন্য ভাষায় কথা বলো, তখন আমার পক্ষে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ঠিক করেছি যে দেবর বৌদীকে শুধু বলবার কাজ দিই আর আমি এই পক্ষীরাজ জোড়াকে সামলাই আর শুনি।

—তাহলে বৌদী এবার বুঝতে পেরেছ ত? আমাদের লোলী ছাড়া আর কিছু বলবে না কেউ।

—হ্যাঁ আগেও তোমাকে অন্য কিছু ভাবতো না। কারণ তোমার চুলও কয়লার মত কালো। দেহের বর্ণেও আর কিছু না হোক এখানকার লোকদের চেয়ে একটু বেশী শ্যামল। কিন্তু উনি মশাইয়ের ত অবস্থা খারাপ। একদিনও যদি চুল দাড়ীতে রং না লাগিয়েছি ত হলদে হয়ে যাবে, তাহলেই বুঝছ?

—হুঁ! আচ্ছা বৌদী সত্য করে বলত অন্দর্জগরের কথা তোমার এত ভালো লাগল কেন?

—এও আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি? দেখছ না, সমগ্র

পৃথিবীর লোকে আমাদের মত গৃহহীনদের ঘৃণা করে। আমরা মানব সমাজ থেকে বহিষ্কৃত। কিন্তু অন্দর্জগর বড় সহৃদয়। কত বিশাল আর কোমল তাঁর হৃদয়। দুর্ভিক্ষের সময় তম্পোনে আমি কয়েক বার তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তিনি লাখ লাখ মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছেন। কত সরল তাঁর হৃদয়, আমাদের ছেলে মেয়েরা যখনই তার কাছে যাক না কেন তিনি আদর করে কোলে তুলে নেন নিজের সন্তানের স্নেহে। মুখে না প্রকাশ করলেও তাঁর প্রতিটি লোমকূপ যেন বলে, আমরা তার অতি নিকট আত্মীয়। তাঁর সকল কথা বুঝবার মত শক্তিই বা কোথায় আমার। একে ত স্ত্রী তায় লোলী। কিন্তু যা কিছু স্বচক্ষে দেখেছি, তাকে ত অবিশ্বাস করতে পারি না। আমাদের জাতি সকলেই অন্দর্জগরকে সবচেয়ে প্রিয়জন বলে ভাবে।

কথাবার্ত্তা ক্রমশঃ গম্ভীর ভাব ধারণ করছে দেখে দেবর কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে,

—দেখ বৌদী! এই পাশের হিমবন্ত পর্বত কি চমৎকার।

—চমৎকার নিশ্চয়, তবে পাশের কথা বলো না। জানো এই হিমবন্ত যে সে পাহাড় নয়

—না না যে সে পাহাড় হবে কেন, এখানে ত পরীরা বাস করে।

—মানুষ সেই জন্যেই ওখানে যেতে ভয় পায়। ছোট ছোট শিশুদের তারা নিশ্চয় চুরি করে নিয়ে যায়।

—তারা নিশ্চয় লোলী নয়, কি বল দেবরের বৌদী? এতক্ষণে তৃতীয় পুরুষ টীপ্পনি কেটে কথা বলে।

—ওখানে গেলেই সব বাহাদুরী বোঝা যাবে। এখান থেকে ঠাট্টা করা খুবই সোজা।

—কেন পরীরা কি অন্ধ খঞ্জ বা অন্য কোনও রকম হয়?

—না না। খুব সুন্দর হয় তারা। তপ্তকনক অথবা জ্বলন্ত আগুনের মত সুবর্ণ।

—তাহলে ত পরীদের হাতে পড়া খুবই সৌভাগ্যের কথা। তারা ত আর খেয়ে ফেলবে না।

—না তারা খাবে না বটে, কিন্তু তাদের ভাই বন্ধু দেব'রাও ঐ পাহাড়েই থাকে। মানুষের মাংস তাদের কাছে সবচেয়ে বেশী উপাদেয় খাদ্য।

—তাই নাকি বৌদী? তুমি কখনও তাদের দেখেছ?

—দেব দেখলে কি আর দেবর বৌদীর এমনি আলাপ করবার সুযোগ হত? তারা এক একটা পাহাড়ের মত বড় হয়। তাদের মাথায় বিরাট লম্বা লম্বা শিং থাকে, মুখে চার পাঁচ পাটি দাঁত, এক একটা দাঁত হাত খানেক লম্বা। সেই জন্যেই ত দমাবন্তের পাহাড়ে কোনও মানুষ ওঠে না। রাত্রে ত কথাই নেই।

—বিনা কারণে পাহাড়ের উপর মানুষ যাবেই বা কেন? তবে সেখানে যদি কোনও পরীর দর্শন হয়ে যায় ত ভাগ্য খুলে গেল বলতে হবে। আচ্ছা বৌদী! এমন সুন্দর বর্ণনা দিলে যে পরীদের তাদের ভাই বন্ধুরা অমন কুরূপ কেন হবে? অত খারাপ হবে?

—পরীরা কি আর কম খারাপ? অন্য মানুষকে ও শিশুদের তারা হয় ভেড়া বানিয়ে রাখে নয়ত গাছ বানিয়ে রাখে।

—তা এমন আর কি খারাপ। দিন ভরে খাটা খাটুনি দুশ্চিন্তার হাত থেকে ত বেঁচে যাবে। আমার ভীষণ ইচ্ছা করছে পরীদের দেখতে, একটিবার অন্ততঃ দর্শন পাই ত মনটা শান্তি হয়। এবার তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দূরে রাস্তার উপর দাড়ানো এক তরুণীর দিকে দেখিয়ে বললো,—

—ঐ দেখ একজন পরী তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

—হ্যাঁ দেবর, ঐ দেখ বর্দকের অবস্থা। এতটুকু ধৈর্য ধরতে পারলো না যে তাঁবুর মধ্যে বসে অপেক্ষা করে। তা নয় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বর্দক সত্যিই গোল্লাপ নামের উপযুক্ত। সাধারণ এবং ময়লা

কাপড়ে ওর সৌন্দর্য ঢাকা পড়বার নয়, নিস্তেজ হয় না এতটুকু। ওর দেহলতাটী যেন কোনও ঢাচে ঢালাই করা। বিশেষ করে ইরানের চোখে বর্দক অদ্বিতীয়া সুন্দরী। বর্দকের চকচকে কৃষ্ণ কেশের দিকে তাকালে তারা চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। সাথীরা কাছে আসতে বর্দক দুই পা এগিয়ে এসে বললো,

—আমি ত ভেবেছিলাম তোমাদের ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে। দেবর পুরুষ বর্দকের কাছে এসে জবাব দেয়।

—ভগবানের কাছে সেই সেই প্রার্থনা করছিলে বুঝি? আমাদের যদি ডাকাতে ধরে নিয়ে যেত বা পাহাড়ের দেবরা খেয়ে ফেলত তাহলে কোনও চিন্তাই ছিল না কিন্তু এই পক্ষীরাজ ছুটোর কি অবস্থা হত তা ভেবেছ? বর্দক দেবরের মুখের দিকে কটাক্ষ করে জোরে জোরে বললো।

—খাওয়ার সব কিছু তৈরী, সকলে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমার মন মানল না তাই বাইরে এসে দাড়িয়েছি আর কত রকমই না ভাবছি।

—আশঙ্কা করছিলি? বললো বৌদী। তুই বুঝি ভেবেছিস যে তোর তরুণকে দমাবন্ত পাহাড়ের কোনও পরী নিয়ে গিয়ে মাছি তৈরী করে রেখে দেবে?

—দমাবন্তের পরীদের কি দরকার পড়েছে? সাথে ত আরও লোক আছে।

—বর্দক। চীৎকার করে ওঠে বৌদী। তুই তোর দিদিকে অবিশ্বাস করিস? এবার বর্দক তার দিদিকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে হেসে ওঠে।

—না দিদি তুই কিছু মনে করিস না। আমি ওকে ঠাট্টা করছিলাম শুধু।

গ্রামের শেষে খালধারে এক বাগানের মধ্যে ওদের তাঁবু পড়েছে। সেখানে সকলে পিছিয়ে যাওয়া সাথীদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

পক্ষীরাজ দুইজন তাদের ভাই বন্ধুদের কাছে চলে যায়। আর তাদের সঙ্গে আসা স্ত্রীপুরুষরাও তাদের জাতির লোকের কাছে গিয়ে বসে।

কিছুক্ষণ পরেই কম্বলের উপর বসে গরম মাংসের ঝোল'এর সদ্ব্যবহার করতে দেখা যায় সকলকে।

এখনও অন্ধকার তেমন হয়নি। রাত এখানেই কাটবে। তাঁবুই লোলীদের ঘর বাড়ী। যে গ্রামে যেদিন তাঁবু পড়বে সেদিন তারা সেই গ্রামেরই অধিবাসী। ভোজন পর্ব শেষ হলে নাচ গান শুরু হয়। এমনি চলবে আধা রাত্রি, বা তারও বেশী।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

॥ মৃত্যু নৃত্য ॥

তেহরান নগরী থেকে পাহাড়ী অঞ্চল অনেকটা দূর হলেও, দেখা যায়। দূর থেকে উদ্যান বলে মনে হয় তেহরানকে। চারিদিকের বৃক্ষ বনস্পতিহীন পর্বত মালার মধ্যে অমন সুন্দর উদ্যান নগরী দর্শককে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। স্পন্দিয়ার বিস্পোহ্রের মানস নগরী তেহরান শুধু উদ্যান ভবনেই পরিপূর্ণ নয়। চীন ও ভারত থেকে স্থলপথে আসা যাওয়ার পথের উপর অবস্থিত বলে সার্থবাহ ও শ্রেষ্ঠীদের মিলনস্থল হবার জন্য প্রচুর ধনী এই নগরী। স্পন্দিয়ার বিস্পোহ্র সাসানী সাম্রাজ্যের পুস্তেনী দুর্গপাল ছিলেন। এই নগর এবং বহু গ্রামের শাহ ছিলেন তিনি। গত দশ বৎসর এই বিস্পোহ্র (সামন্ত) এবং ধনী মানীদের একটা দুঃসময় গেছে। এখন আবার সব যেমন ছিল তেমনি হয়েছে। আবার তারা দাস, কর্মকার বর্গের প্রাণ ও ধনের প্রভু হয়ে বসেছেন। তাদের বিশ্বাস হয়েছে, এবার ভগবান অহুর্মজ্‌দ দীন (ধর্ম) কে রক্ষা করেছেন এবং বিধর্মীদের বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন, অর্থাৎ আবার তারা তাদের স্বেচ্ছার রথ চালাতে পারবে নির্বিচারে।

রগা নগরী (তেহরান) র বাইরে যেখানে দমাবস্ত থেকে ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসার জন্য খাল কাটানো হয়েছে, সেই খালের পাশে আজ অনেকগুলি লোলীদের তাঁবু পড়েছে। তাঁবুগুলি দেখলে মনে হয় এখানে এই সময় বহু জায়গা থেকে আগত লোলীরা একত্র হয়েছে।

সেদিন দুপুর বেলা। তাঁবুর মালিক সব বাইরে গেছে। তাঁবুতে রয়েছে শুধু, শিশু, বৃদ্ধ এবং কুকুর। তাঁবুবাসীরা কেউ তাদের বানর-বানরী নিয়ে, কেউ বা ভালুক নিয়ে খেলা দেখিয়ে জীবিকা

উপার্জ্জনের জন্য বাইরে বেরিয়েছে। কেউ বা গেছে তামাসা দেখাতে, কেউ জাদু, কেউ বা ভিক্ষে করতে অথবা ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আসা নানাপ্রকার জিনিসপত্র বিক্রি করতে।

একটা তাঁবুতে বর্দ্দক পিতলের দর্পনের সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করতে ব্যস্ত। তার তরুণ মিত্র "দেবর" সামনে বসে কথাবার্ত্তা বলছে।

—আমাকে আজ এক সামন্তের প্রাসাদে যেতে হবে। বললো বর্দ্দক।

—সামন্তের প্রাসাদে একলা যেতে ভয় করে না?

—ভয় লাগবে কেন, ওরা কি সিংহ যে খেয়ে ফেলবে? জীবিকার জন্য সকলেই বাইরের কোথাও না কোথাও বেরিয়েছে। গলিতে বা কারও ঘরে নাচ গান করলে তেমন আর কি'ই বা রোজগার হবে। সামন্তের দরবারে রোজগার হয় প্রচুর। সেখানে আমি গান অথবা নাচ দেখাব। তাছাড়া আমি একেবারে একলা থাকব না সেখানে।

—তাহলে আরও গায়িকা সেখানে থাকবে?

—সামন্তের অন্তঃপুর তম্পোনের অন্তঃপুর থেকে নেহাৎ কম নয়। হাজার হাজার নারী, এবং একাধিক গুণী থাকবেই সেখানে। আজ আমার যখন পালা পড়বে আমার নাচবার ইচ্ছে আছে। আমার মনে হয় নৃত্যে আমি সকলকে আজ পরাস্ত করতে পারব।

—পরাস্ত করে ফিরে আসতে পারবে ত? বর্দ্দক! আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। আমি বাজনা বাজাব।

—হুঁত। সেখানে পান ও সঙ্গীত গোষ্ঠী বসে সেই অন্তঃপুরে কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

—তাহলে আজ তুমি সকলকে পরাস্ত করেই আসবে?

—নিশ্চয়ই। অনেক পারিতোষিকও সঙ্গে আনতে পারবো। যার মধ্যে সামন্তদের দুর্গের পুরোনো লাল মদিরা অবশ্যই থাকবে। তারপর আমরা দুজনে বসে আরাম করে পান করবো, কি বল মাসী?

বর্দকাকে সাজিয়ে দিচ্ছিল এক বৃদ্ধা, তার দিকে তাকিয়ে বললো বর্দক।

—হ্যাঁ মা, চিরায়ু হও। বললো মাসী।

বর্দকের সজ্জা শেষ হতে হতে সূর্য প্রায় অস্তে যেতে বসেছে। কিছুক্ষণ পর বর্দক তার মাসীর সঙ্গে দুর্গের দিকে রওয়ানা হয়।

বর্দক অন্তঃপুরে রক্ষিতা নয়, পোষাক যতই জাঁক জমক পূর্ণ হোক না কেন ওর জাতিকে যেন লুকোতে পারে না। দুর্গে যেতে হলে রগা'র পন্থ বীথির মধ্য দিয়ে যাবার প্রয়োজন হয় না। তাহলে এই সুযোগে হাট-বাজারগুলি চোখে পড়ত। দুর্গের মহাদ্বারের কাছেই লোলী রাজার সঙ্গে দেখা হয়। লোলী রাজা (লোলীদের মুখ্য, সর্দার) বর্দককে সঙ্গে নিয়ে মহাদ্বারের দিকে এগিয়ে যায়। দুর্গের দ্বার যদিও সকলের জন্য খোলা নয়, তবুও লোলী রাজা তার রং বেরং এর পোষাকের জন্য বর্দককে সঙ্গে নিয়ে অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করে। দ্বার রক্ষীরা একবার বর্দকের দিকে তাকিয়ে দেখে আর একবার নিজেদের দাড়িতে হাত দেয়। রাজা ভিতরে গিয়ে এক প্রৌঢ় স্ত্রীর হাতে বর্দককে সঁপে দেয়। সেই স্ত্রী বর্দক ও তার মাসীকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় কুড়ি পঁচিশটা দরজা পার হয়ে ক্রীড়োদ্যানে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে লম্বা একটা ঘরে আরও পঞ্চাশ যাট জন সুন্দরী স্ত্রী অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ পর একজন বৃদ্ধা এসে সকলের মধ্য থেকে দশজনকে বেছে বেছে ভিতরে নিয়ে যায়। বর্দকের আনন্দের সীমা নেই, সেও এই দশজনের একজন।

অন্তঃপুরের কয়েকটা দরজা পার হয়ে ওরা বিশাল লম্বা চওড়া একটা ঘরে এসে দাঁড়ায়। চমৎকার সাজানো ঘর। সুগন্ধিতে ভরপুর। বর্দক এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে। ঘরের মেঝেয় বিছানো বিরাট একটা কালীন, নানাপ্রকার ফুল, লতা পাতা উৎকীর্ণ করা। দেয়ালের চিত্রগুলিকে দেখে বর্দক অধিক আকৃষ্ট হয়। এগুলি সবই শিকারের দৃশ্য। একজন বিস্পোহ্ন ঘোড়ার পিঠে বসে ধনুক

টেনে নিচের ক্রুদ্ধ সিংহকে তাক করে রয়েছে। কোনও চিত্রে পলায়মানা হরিণীকে তাক করে আছে। কোনটীতে শূকরকে বানবিদ্ধ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

চিত্র দেখতে দেখতে বর্দকের দৃষ্টি সামনের এক সজীব চিত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। ঘরের একদিকে সিংহাসনের উপর একজন তরুণী সুন্দরীর পাশে এক প্রায় বৃদ্ধ পুরুষ বসে আছে। মাথায় ছোট একটি মুকুট। ছোট করে ছাঁটা দাড়ী। মূল্যবান কাজ করা লাল রংয়ের রেশমী বস্ত্রের কঞ্চুক, তার উপর সুবর্ণ সূত্রের লতা পাতা আঁকা।

কঞ্চুকের মাঝখানে একটি গোল বৃত্তের মধ্যে একটা কুকুরের চিত্র উৎকীর্ণ। মজ্‌দয়স্নী ধর্মে কুকুরকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। পুরুষের বয়স পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু ব্যায়াম এবং মৃগয়ার অভ্যাসের ফলে পেশীবহুল শরীর দেখে অতখানি বয়স মনে হয় না। পাতলা ছিমছাম চেহারা। স্ফীত বক্ষ, সরু কোমর। কোমরে রত্নজটিত কোমরবন্ধ। পরনে ঝালর দেওয়া চওড়া পায়জামা। পায়জামার ফাঁকে একখানা পা দেখা যায়। গলায় একাবলী মুক্তার মালা, হাতে কঙ্কণ। এই ঘরে একমাত্র এই সিংহাসনাসীন পুরুষ ব্যতীত আর সকলেই স্ত্রী। তাদের সংখ্যাও কুড়ি পঁচিশ জন হবে। পানভোজন সম্বন্ধী সকল স্ত্রীদের মুখে রুমাল বাঁধা। যাতে তাদের নিঃশ্বাস স্বামীর পানভোজনের সামগ্রীতে না লাগে। কয়েকজন স্ত্রীর হাতে জলের কুঁজা। যাদের হাতে কিছুই নেই তারা দুই হাত স্বস্তিকা চিহ্নের আকারে বুকে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষের পাশে উপবিষ্ট তরুণীর বয়স খুব কম। পরিচারিকারা মদিরার চষক হাতে দেবার সময় যেমন পুরুষকে সম্মান প্রদর্শন করে তেমনি এই তরুণীকেও। সিংহাসনের দুই পাশে আরও দুজন স্ত্রী চামর হাতে দাঁড়িয়ে। আর দুজনের হাতে ময়ুরপঙ্খ।

বর্দক যে সময় ঘরে প্রবেশ করে সে সময় সিংহাসনের সামনের

বেদীর উপর একজন তরুণী বাঁশী বাজাচ্ছিল, আর তুইজন স্ত্রীর হাতে বাজছে ত্রিকোণ তারের যন্ত্র। পরিচারিকার সদাজাগ্রত দৃষ্টি রয়েছে সিংহাসনের দিকে, চষক শূন্য হলেই আবার গিয়ে পূর্ণ করে দিয়ে আসে। কিন্তু ওরা তুজন ধীরে ধীরে পান করছেন।

গান শেষ হলে পুরুষটি পরিচারিকার কাছে নিচু স্বরে কিছু বলতে পরিচারিকা এগিয়ে গিয়ে চারজন তরুণীকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বর্দক তাদের একজন। একজন স্ত্রীর হাতে শকটাকার তারযন্ত্র আর একজনের হাতে ডফ্ (চামড়ায় মোড়া একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র)। যন্ত্রে ভারতীয় সঙ্গীতের সুর শুনে বর্দক বুঝতে পারে যে বিম্পোহের ভারতীয় সঙ্গীত খুবই প্রিয়। অতঃপর বর্দক ইরানী ভাষায় একটি ভারতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে। পুরুষের চোখে তখন মদিরার নেশা চেপে বসেছে। কিন্তু বর্দকের মধুর কণ্ঠ পুরুষকে আকর্ষণ করে, পুরুষকে বর্দকের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে পাশের তরুণীর চোখে মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়ে। পুরুষ এবার মুচকী হেসে আবার পরিচারিকাকে কিছু বলে। পরিচারিকা এগিয়ে গিয়ে বাদ্যকরদের ইশারা করতে নৃত্যের সুর বাজতে থাকে। বর্দক উঠে দাঁড়ায়। এখানে উপস্থিত আরও সুন্দরী রয়েছে, যারা বর্দকের চেয়ে কম নয় সৌন্দর্যে। কিন্তু বর্দকের মত এমন চমৎকার শারীরিক গঠন কারও নেই।

ধীরে ধীরে বর্দকের হাত পা চঞ্চল হয়ে ওঠে, বাজনার তালে তালে ওঠে, নামে। বর্দকের দিকে তাকালে মনে হয় হংসপক্ষ হাওয়ায় তুলছে, উপরে উঠছে নিচেয় নামছে। তার পায়ের গতি দেখলে মনে হয়, জলের মধ্যে কুশলী মরালএর পদচালনা, অথবা পারাবতের লীলাপূর্ণ আকাশে উড্ডয়ন। ধীরে ধীরে নৃত্যের গতি বাড়তে থাকে। পুরুষ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বর্দকের দিকে। বর্দকের শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়া দেখলে মনে হয় তার শরীরে হাড় নামক কোনও শক্ত জিনিষ নেই।

এমনি কতক্ষণ কেটে গেছে, তা কারও খেয়ালই নেই। এক সময় নাচ থামে। বর্দক আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে। লোক যেন স্বর্গ থেকে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে।

পুরুষের সংকেত পেয়ে একজন পরিচারিকা স্বামীর লাল মদিরা থেকে এক চষক ভর্ত্তি করে বর্দকের হাতে দিয়ে যায়। বর্দক চষক হাতে নিয়ে বন্দনা করে এক নিঃশ্বাসে চষক খালি করে ফেরত দেয়। বর্দকের কলা দরবারের পছন্দ হয়েছে, আজ বর্দকের সৌভাগ্যের উদয় বলতে হবে।

ভাগ্য খুললেও বর্দকের জন্য তারও একটা সীমা রয়েছে। শুধু বর্দক কেন সকলের জন্যই এই সীমা সীমাবদ্ধ। বর্দকও নীচ রোমনী জাতির কন্যা (লোলী)। যদি ইরানীও হত, তাহলেও ইরানের বিস্পোহ্নদের কন্যা ছাড়া অন্য বিস্পোহ্ন কাউকে পত্নীর আসন দিতে পারবে না। রগা'র এই বিস্পোহ্নের ঘরে এমন একশতেরও বেশী বিস্পোহ্ন কন্যা উপস্থিত রয়েছে। তাছাড়া নিজ ভগ্নী ও কন্যা-স্থানীয় তরুণীও আছে অনেক, যাদের দাবী সর্ব্বাগ্রে। এই বিস্পোহ্নের জ্যেষ্ঠ সন্তান স্পন্দিয়ার হতে পারে এবং তখন ঐ সকল তরুণীদের কেউ নিশ্চয় ভট্টারিকার পদ পাবে। তারপর বিস্পোহ্ন কন্যা সাধারণ পত্নীর সম্মান পেতে পারে। তারপর হল চাকর পত্নীর পালা। রগা'র অন্তঃপুরে এমন চাকর পত্নীর সংখ্যা এক হাজারের কম নয়। তারপরে হল সুন্দরী দাসী আর পরিচারিকাদের নম্বর। স্বীকৃত হলে বর্দক দাসী বা পরিচারিকা পর্যন্ত হতে পারে, তার উপর নয়। তবু কোনও পান ভোজনের সামগ্রী স্পর্শ করবার অধিকার সে পাবে না কখনও।

বর্দকের পর আরও অনেক গায়িকা তাদের সঙ্গীতের মায়াজাল বিস্তার করে, কেউ বা নৃত্যের ফুলঝুরি তোলে, কিন্তু নৃত্যে বর্দককে কেউ পিছনে ফেলতে পারে নি। বর্দক যদিও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে তবুও দু একজনের পরেই তাকে আবার নাচতে হচ্ছে।

রাত্রের তৃতিয় প্রহর এমনিভাবেই কেটে যায়।

সমস্ত দরবারে নেশার ঘোর লেগেছে। স্বামীর চোখ বন্ধ হয়ে আসছে মাঝে মাঝে। আবার চোখ খুলেই তিনি বর্দককে নাচতে হুকুম করেন। এবার বর্দকের শরীর অসমর্থতা প্রকাশ করে। তবুও সাহস করে উঠে দাঁড়ায়। মনের শক্তি দিয়ে দেহের ক্ষয়িত শক্তিকে পূরণ করতে চায়।

নাচ আরম্ভ হয়। বর্দকের শরীর ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে কিন্তু নৃত্যের গতি রুদ্ধ হয়নি এতটুকু। ক্রমশঃ নৃত্যের গতি বৃদ্ধি হতে থাকে। এক সময় নৃত্যে বৃত্ত রচনা করতে করতে বর্দকের দেহ কালীনের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। ছুটন্ত হরিণী যেমন তীরবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে। এতক্ষণে স্বামীর যেন জ্ঞান হয়, তিনি ছুটে এসে বর্দককে টেনে তুলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁরও শরীর তখন অসমর্থ। বর্দকের মুখ দিয়ে স্বেদ বিন্দু গড়িয়ে পড়ে, কঞ্চুক ভিজে গেছে ঘামে। স্বামীর সংকেত পেয়ে সকল পরিচারিকা ছুটে এসে পাখার হাওয়া করতে থাকে। অন্য সকলকে ছুটি দিয়ে দেন স্বামী। স্বামীর চেহারা বর্দকের প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্দকের সেবা পরিচর্যার জন্য অন্যান্য পরিচারিকাদের চেয়ে স্বয়ং স্বামী অধিক অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু হায়, বর্দক এ সকল কিছুই জানতে পারে না তাহলে আজ সে কতই না খুশী হত।

সপ্তদশ অধ্যায়

।। জীবনের দর্শন ।।

গতকাল এই তাঁবুগ্রামে কতই না চঞ্চলতা ছিল। আনন্দের জোয়ার বয়ে চলেছিল প্রত্যেকটি নরনারীর মধ্যে। তাঁবুর বাইরে গেছিল যারা তারাও সানন্দে ফিরে এসেছে তাঁবুতে। কালও সারারাত এদের নাচ গানের মধ্যে কেটেছে। কিন্তু আজ? আজ তাঁবুর বাইরে কেউই যায়নি। সকলেই রয়েছে ভিতরে, কিন্তু সকলেই তারা মৌন, উদাস। এই তাঁবুর মধ্যেই কাল বর্দক অমন অনুপম সাজ সজ্জা করেছিল, ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, "আজ আমি বিজয়প্রাপ্ত করে ফিরব।" বস্তুত, বিজয়প্রাপ্ত করেই ফিরেছে বর্দক। আজ সেই তাঁবুর সামনে শুয়ে আছে! তার সারা শরীর নতুন লাল বস্ত্রে ঢাকা, কেবল মুখটি খোলা রয়েছে। বর্দক আজ গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। তাকে যেন কেউ জাগায় না। সে স্পন্দিয়ার' এর মজলিস জয় করে এসেছে। ওর চোখ দুটি বন্ধ রয়েছে, কিন্তু ঠোঁটের কোণে লেগে রয়েছে হাল্কা হাসির রেখা। অধররাগ আর মুখচূর্ণ কখন মুছে গেছে, চেহারাও কিছুটা ফ্যাকাশে কিন্তু ওকে দেখে মনে হয়, ও যে আত্মসন্তোষ লাভ করেছে, তাতে ওর চেহারা যেন আগের চেয়েও বেশী খুলেছে। ওর পাশে বসে ওর বোন আর মাসী নিজেদের মাথার চুল টেনে টেনে ছিঁড়ছে আর বুক চাপড়ে কাঁদছে, "হায় বর্দক, হায় বর্দক" বলে।

এত কোলাহল কিসের? ওরা কি জানে না যে বর্দক শুয়ে আছে? ওকে জাগাতে নেই? হ্যাঁ, ঘেরার বালক-বালিকারা অবশ্য তাই ভাবছে, মাঝে মাঝে আসছে আর একবার করে বর্দককে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে। কিন্তু বর্দক কি সত্যিই

জাগবে? সত্যিই কি শুয়ে আছে সে? ঘেরার সকল নরনারীর এই তরুণ জীবনের অবসান অসহ্য লাগছে। সকলের চোখেই অশ্রুধারা। সকলেই চীৎকার করে কাঁদছে না বটে, কিন্তু বুক ফেটে যাচ্ছে সকলের। বর্দক! সুন্দর লাল গোলাপ। এখনও পরিপূর্ণ ফুল বলা যায় না। মুকুলের অন্তিম অবস্থা মাত্র। শুধু নৃত্য-গীতেই নয়, সর্বগুণসম্পন্না ছিল বর্দক। ঘেরার সকলেই বলে, বর্দকের কখনও কালো মুখ কেউ দেখেনি। মনে হয় বিরাট এক দীর্ঘ জীবনের সকল আনন্দ বর্দক তার ঐ বিশ বৎসর বয়সেই ভোগ করে নিয়েছে, এমনি তৃপ্ত ছিল সে। চিন্তা বা শোক বলে কিছুই জানত না।

ভাই বন্ধু সকলে বর্দকের অন্তিম কাজের কথা ভাবছে। দখ্‌মার কূপের মধ্যে রেখে আসা, এই ইরানী ধর্মের প্রচলিত নিয়ম। দখ্‌মার গবাক্ষের মধ্যে শায়িত করে দিয়ে আসতে যতটা দেরী, তারপরেই শকুন প্রভৃতি প্রাণীরা এসে তাদের কাজ শেষ করে যাবে। কিন্তু বর্দকের স্মিত বদন যেন বলছে, আমার এই দেহ কি কুকুর শকুনের টেনে ছিঁড়ে খাবার জন্য তৈরী হয়েছিল? বর্দকের বড় ভগ্নীপতি বললো,—আমাদের জন্য দখ্‌মা পাওয়া অসম্ভব। দখ্‌মা বড় জাতিদের জন্য। তাদের কেউই আমাদের বর্দককে রাখবার জায়গা দেবে না। তাছাড়া জমিতে পুঁতে দেবার পক্ষপাতী আমি নই। বর্দকের এই দেহ দখ্‌মায় শকুনের জন্য আর কবরে পোকা-মাকড়ের জন্য ফেলে যেতে আমি রাজী নই।

—তবে কি ওকে ঘেরার মধ্যে রেখে দিতে চাও? বললো মুখ্য লোলী।

—না, ঘেরায় রাখতে চাই না। ঘেরায় যদি থাকবে তাহলে কাল মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে যাবে কেন? আমার মতে আমাদের ভারতবর্ষের নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। কাঠ এখানে একটু বেশী দাম দিয়ে কিনতে হবে। তবুও বর্দকের হাসিমুখ অগ্নিকে দান করাই

ভালো। সেই একমুহূর্তে বর্দকের সৌন্দর্যকে নিজের মধ্যে লুপ্ত করে নিতে পারবে।

—আগুনে জ্বালাবার গুণ আমি আজ বুঝতে পারছি, সত্যিই আপন প্রিয়জনকে, যদিও তার বোধশক্তি রহিত থাকে, এমনি শকুন, কুকুর অথবা পোকা-মাকড়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া খুবই ক্রূরতা।

ঘেরার মধ্যে একপ্রহর পর্যন্ত কাঁন্না আর বুক চাপড়ান চলল। ইতিমধ্যে অন্যান্য সকল ব্যবস্থাই হয়ে গেছে। নগর থেকে বহুদূরে এক নির্জন প্রান্তরে জ্বালাবার অনুমতি পাওয়া গেছে। বর্দক চারজনের কাঁধে উঠে চলেছে অন্তিম শয়নে। সামনের দুজন পুরুষ সেই দুজন যারা সেদিন গাধার পিঠে চেপে আসছিল। দেবর'এর হৃদয়টা যেন বিদীর্ণ হয়ে যেতে চাইছে। মনে মনে সে ভাবে, ওরা কি ভাগ্যবান, তাই ত চীৎকার করে কাঁদতে পারছে।

রগা নগরীতে বোধ হয় এই প্রথম কোনো মানুষের শব জ্বালানো হল। স্পন্দিয়ার বর্দকের মৃত্যুতে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছেন, কাল থেকে তার মনে এতটুকু শান্তি নেই একথা সকলে জানে, তাই বোধ হয় কেউ শব জ্বালাতে কোনও বাধা উপস্থিত করতে সাহসী হয়নি, নইলে নিশ্চয় বলত মড়া ছুঁলে অগ্নিদেবতা অপবিত্র হয়ে যাবে। স্পন্দিয়ার ব্যক্তি হিসেবে খারাপ ছিলেন না। নেশার ঘোরে তিনি বার বার নাচতে হুকুম দিয়েছিলেন বলেই না এই ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটল। একথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন আর শোকাভিভূত হচ্ছেন। রাত্রে বর্দক জ্ঞান হারাতেই স্পন্দিয়ারের নেশা ছুটে যায়। তিনি নিজে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং রাজ্যের সমস্ত বড় বড় বৈদ্যকে আনিয়ে বর্দকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু বৈদ্যরা এসে পৌঁছুবার আগেই বর্দকের হৃদয়ের গতি চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। স্পন্দিয়ার এমনভাবে শিশুর মত জীবনে কখনও অশ্রুপাত করেননি। তিনি ভাবলেন বেঁচে থাকতে বর্দকের জন্য কিছুই করতে পারলাম না, অতএব তার মৃত্যুকে যতটা সম্ভব

সম্মান করা উচিত। তাই তিনি নিজের সামনে বহুমূল্য শব মঞ্জিকার উপর বর্দকের দেহ রেখে নতুন বস্ত্র দিয়ে ঢেকে পাঠিয়ে দিলেন সসম্মানে। এর চেয়ে বেশী তার পক্ষে করা অসম্ভব। কারণ তিনি সর্বোচ্চ জাতির একজন গণমান্য বিস্পোহ্ন (সামন্ত), এক লোলী বালিকার সঙ্গে মৃত্যুর পরও এতখানি ঘনিষ্ঠতা দেখানো কুল-ধর্ম ও দেশ-ধর্মের বিরোধী। শবক্রিয়ার সকল ব্যয় ছাড়াও স্পন্দিয়ার বর্দকের পরিবারের জন্য মাসীর হাতে এক হাজার সুবর্ণ দীনার দিলেন। এই দীনারের বিনিময়ে কমপক্ষে চার হাজার ধেনু গাই ক্রয় করা যায়। ধন হিসেবে লোলীদের কাছে প্রচুর কিন্তু বর্দকের আজ আর এই ধনে কিছু এসে যায় না।

নতুন শ্মশানে চিতা রচনা করে বর্দককে শুইয়ে দেওয়া হল। শেষবার বর্দকের বোন এসে ওর মুখের ঢাকা খুলে দেয়, আবার কান্নার রোল ওঠে সকলের মধ্যে। বর্দক যেন এখনও ঘুমিয়ে আছে, এখনও ওর মুখের হাসি হাসি ভাবটা মিশিয়ে যায়নি। মুখ ঢেকে এবার চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। আগুনের শিখার মধ্যে মাঝে মাঝে ওর দেহটা যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। সকলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ উঁচু চিতামঞ্চ জ্বলে অঙ্গারে পরিণত হয়ে মাটির সঙ্গে না মিশে গেছে।

বর্দকের মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশী শোক পেয়েছে তার প্রণয়ী 'দেবর', তরুণ। সেদিন ঠাট্টা করেই বলেছিল, বর্দক আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। রাত্রে যখন বর্দক ফিরে এল না তখন তরুণ মনে করেছিল, এই ত সকাল হয়েছে এবার ফিরে আসবে। সকালে বর্দক ফিরে এল, দেখে তার যেন বিশ্বাস হতে চায় না। ঐ মধুর কণ্ঠ চিরকালের মত নীরব হয়ে গেল, বর্দক আর তাকে ডাকবে না কখনও এ যেন অবিশ্বাস্য। লোক যখন বর্দকের দেহকে ঘেরা থেকে নিয়ে যাবার কথা বলাবলি করছে, তখন তরুণ বার বার বলতে চেয়েছে, ওগো এত তাড়াতাড়ি ওকে দূর করে দিও না। কিন্তু বলতে গিয়ে যেন

ওর ভাষা মূক হয়ে গেছে। তারপর যখন জ্বালাবার কথা হল, তখন তরুণ মনে মনে একটু খুশী হয়, যাক শ্মশান পর্যন্ত বর্দককে কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারবে, এমনি করে যদি ওর অন্তিম স্নেহ দেখাতে পারে, তাহলেও ওর মনে অনেকটা শান্তি পাবে।

গোলাপ ফুলে কাঁটা থাকে, কিন্তু বর্দক কাঁটাহীন গোলাপ ছিল, মাত্র পাঁচ ছয় সপ্তাহের পরিচয়, এর মধ্যে কতখানি সমীপ হয়েছিল ওর। বর্দকের সঙ্গে তরুণের এতখানি ঘনিষ্ঠতার কথা ঘেরার সকলে জানত এবং তারা খুশী হয়েছিল তাদের অপূর্ব মিলনে। বর্দকের দিদি সর্বদাই যেন স্বপ্ন দেখত, তরুণ আমাদের হয়ে চিরকাল বর্দকের কাছে থাকবে, কত সুখী হবে ওরা। কিন্তু আজ? আজ সেই তরুণের কাঁধে বর্দকের শ্মশান-যাত্রা তার হৃদয়কে ভেঙে চূর্ণ করে দেয়। তরুণের চোখে সকলের মত অশ্রু না থাকলেও তার মনের অবস্থা বর্দকের সকল আত্মীয়েরা অনুভব করতে পারে। সন্ধ্যা পর্যন্ত কারও সঙ্গে কথা বলেনি, বলাও অসম্ভব ছিল ওর পক্ষে। স্বরযন্ত্র, অশ্রুযন্ত্র ও ক্রন্দনযন্ত্র যেন এক হয়ে মিশে গেছে, এই বুঝি সকলে একসঙ্গে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে।

সন্ধ্যার পর দুই সাথী হাটতে হাটতে খালধার থেকে কিছুদূরে পাহাড়ী টিলার উপর গিয়ে বসে। অর্ধেক রাত পর্যন্ত চাঁদনী, এমন কিছু তাড়াতাড়িও নেই আজ। অন্য সাথী নীরবতা ভঙ্গ করে বললে, —মিত্র! যদিও এ সময় তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা, বর্দকের সঙ্গে তোমার তেমন সম্বন্ধ ছিল না যা সান্ত্বনায় শান্ত হতে পারে, তা আমি জানি। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। আমি অনুভব করছি যে তোমাদের প্রেম কতখানি মহান, মূল্যবান। আজ তা অমূল্য হয়ে রইল তোমার জীবনে।

—সবই বুঝি মিত্র, কিন্তু কেন জানিনা আমার ধৈর্যের বাঁধ যেন আর বাধা মানছে না। আমি চীৎকার করে কাঁদতে পারছিনা, তাই আরও অসহ্য লাগছে। বর্দকের ভালবাসা আমার জীবনের সবচেয়ে

মধুর স্মৃতি যা আমি বোধ হয় মৃত্যুর পরও ভুলতে পারবো না। জানিনা সৃষ্টিকর্তার এ কোন রহস্য। জল, বায়ু, মাটি ও অগ্নি, এদের সংমিশ্রনেই মানুষের সৃষ্টি। এদের যে কোনও একটির অভাবে মানুষের মৃত্যু। এদের মধ্যে মানুষের বিলীনতা। তবুও তার মধ্যে কি এমন রহস্য আছে যা মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে। সকল প্রাণীতেই ত এই সকলের মিশ্রণ রয়েছে। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও প্রেম আছে, কিন্তু মানুষের প্রেম ভিন্ন। মানুষের প্রেম একব্যক্তি, এক হৃদয়ে বা এক ক্ষণ পর্যন্তই সীমিত থাকে, তার প্রেম শুধু নিজ বাতাবরনেই নয়, তার সাথী এবং ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদের পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে।

—হ্যাঁ ভাই, প্রেম মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং জীবনের মধুরতম রস। এর অস্তিত্ব যেমন জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দদানকারী, তেমনি এর বিলুপ্তিও জীবনের সবচেয়ে দুঃখদায়ী।

—দার্শনিকরা এই প্রেমের অনেক দোষগুণ বিচার করেছেন। বিরাগী যারা তারা প্রেম থেকে সাবধান হবার অনেক শিক্ষাও দিয়েছেন। আমার মনে হয় সে সব বিচারধারা একাঙ্গী।

—এমনও তো হতে পারে, সেই প্রেমের সবটাই গুণে পূর্ণ দেখাটাই একাঙ্গীতা।

—তাই বলে যা চিরস্থায়ী নয় তাকে সর্ব দোষযুক্ত বলে ভাবতে হবে এ যুক্তিও আমার কাছে উচিত বলে মনে হয় না। আমার মনে হয়, নিজের কাছে যা চিরকাল থাকবে, যা সদাস্থায়ী, অন্তিমকালে কখনও আনন্দদায়ক থাকে না চেতার উদ্বোধনের জন্য নবীনতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। কোনও রমণীয় স্থানে যখন প্রথমবার আমরা যাই, তখন সে স্থানকে কতই না আকর্ষক মনে হয়। পক্ষীদের মধুর কূজনই নয় ছোট ছোট কীট পতঙ্গের শব্দটুকুও মনের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে। কিন্তু সেই দৃশ্য পুরোনো হয়ে গেলে সেই আনন্দ সেই কৌতূহলও আপনা থেকেই লুপ্ত হয়ে যায়। বিশ্বে

কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তাই ত চির নবীনতার পথ খোলা সদা-সর্বদা।

—আর সেই নবীনতা শুধু সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করবার জন্যেই জন্ম নেয়, এই বলতে চাইছ ?

—মিত্র! এখন আমার মন উদ্বেগপূর্ণ। তর্কসঙ্গত সকল আলোচনা হয়ত করতে পারব না। তবে চির নবীনতাকেই আমি সৌন্দর্যের কারণ বলে মনে করি, তাই বলে চিরন্তন স্মৃতিকে আমি কম মূল্যবান মনে করি না। যদিও এরা পরস্পরবিরোধী। মধুর স্মৃতি হয়ত প্রথম নিয়মের অপবাদ। চিরনবীন আনন্দ প্রেম থেকেই জন্ম নেয়। চিরন্তন মধুর স্মৃতি আনন্দও দেয় আবার মনে বিষণ্ণতাও আনে, তা যদি না থাকে তাহলে কোনও পুলকের মধ্যে মধুর স্মৃতি নামে কোনও বস্তুই থাকে না। আমার মনে হয় তাহলে মানুষ নিজেকে শুধু অপরের বোঝা করেই রাখে।

—তাহলে তুমি বলতে চাও যে চিরস্মৃতি আর চিরনবীনতা মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রেত ভাবে জড়িত ? তাহলে স্মৃতি কোনও সাকার পদার্থ না হয়েও কখনও কখনও মানুষের জীবনে দুঃসহ হয়ে ওঠে কেন ?

—সকলের জীবনেই দুঃসহ এবং সুসহ দুটিই থাকবে এইটাই চিরন্তন সত্য। দুঃসহ ঘটনা অথবা দুঃখের অস্তিত্ব প্রত্যেকের জীবনেই অল্পবিস্তর থাকা চাই, দুঃখের স্বাদ যে জানে না, তার কাছে সুখের কোনও মূল্য নেই। প্রখর রৌদ্রতাপ থেকে এসেই মানুষ ছায়ার সন্ধান করে। তখন সেই শীতল ছায়াই তার কাছে সবচেয়ে সুখদায়ক। বরফের দিনে কেউ শীতল ছায়ার খোঁজ করে না। আমাদের দার্শনিকরা বলেন, ভোগ দুঃখ-সম্পৃক্ত। এমন কোনও ভোগই নেই যার মধ্যে লেশমাত্র দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব সকল ভোগই তেমনই ত্যাজ্য যেমন বিষ-সম্পৃক্ত মধুরতম ভোজন।

—এ ত ভীষণ রকম একাঙ্গীতা। বাস্তবিকতার অপলাপ, মিত্র।

—যার যেমন বিচার। আমি চিরনবীনতার পক্ষপাতী। চির-নবীনতা আমাকে একস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে নয়, চলতে চলতে জীবনের সব কাজ করতে নির্দেশ করে। দুনিয়ার সব কিছুই চলছে, অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। শুধু চলছে কেন, যেন দৌড়ে চলেছে। ভাবতে পারো কালের গতির তেজ কত ?

—কালের গতি সত্যিই অগম্য বলে মনে হয়। নিজের জীবনের বিগত পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের দিকে তাকিয়ে দেখ এই দৌড় কত বেগবতী দৌড়। এই রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে যেমন পিছনের দৃশ্যাবলী আমাদের চোখে ধূমিল হতে হতে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায়, আমাদের জীবনে সময়ের দৌড়ের প্রভাবও তেমনি দেখতে পাই।

—কিন্তু এটাকে কালের দৌড় বলা যায় কি ? বরং বলতে পারা যায় পৃথিবীর দৌড়, পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর দৌড়। একেই আমরা কালের দৌড় নাম দিয়েছি। যে গতিবেগে পৃথিবী ছুটছে সেই বেগের কাছে ব্যক্তি পিছনে পড়ে থাকছে। এই পিছনে পড়ছে তার দুর্বলতার জন্য। সবল যারা তারা গতির তালে তাল রেখে ঠিক ছুটছে। তাই বলে যারা পিছনে পড়ে থাকছে, তাদের জন্য দুনিয়া শূন্য হয়ে যাচ্ছে না। তাদের জন্যে এই স্মৃতিই সান্ত্বনা দেয়, আবার স্মৃতিই তাদের অধীর করে তোলে। চিরনবীনতাই চিরন্তন মধুর স্মৃতির জন্ম দেয়। তাই বলে যারা পিছনে পড়ে থাকে তাদের শোভা পায় না যারা এগিয়ে চলেছে তাদের প্রোৎসাহন না দেওয়া।

—তোমার কল্পনার দর্শন আমি বুঝিও না অথবা আমার কাছে আকর্ষক বলেও মনে হয় না।

—কেন ? যাকে তুমি কল্পনার দর্শন বলছ। তাকে সাকার দর্শনের রূপেও দেখতে পারো। যেগুলিকে আমরা নিরাকার রূপে গণনা করছি, সেগুলিকে তুমি পাথরের নুড়ি বা কড়ি দিয়ে গুণে দেখ। তাহলে সাকারের মধ্যে যে দার্শনিক কল্পনা আমরা করছি তাকেও

আর আলাদা করে ভাবতে পারবে না। আজ বর্দক তার সাকার রূপ ছেড়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে, তেমনি যারা কোটি কোটি বা তার বহুগুণে বেশী সংখ্যায় আগে বিলীন হয়েছে এবং পরে যারা বিলীন হতে থাকবে। কিন্তু বিলীন হয়ে যাওয়া বর্দক আমার জীবনে শুধু ছিল না এখনও রয়েছে আর চিরকাল থাকবে। এ কথা ঠিক যে স্মৃতি সেই ব্যক্তি বিশেষের জীবনভর বেঁচে থাকে শুধু। তার মৃত্যুর পরও তার স্মৃতি আবার বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেই ব্যক্তির জীবনেই তার আবশ্যকতাও রয়েছে বা থাকে। কিন্তু আমরা আজ যে কারণগুলির জন্য বর্দকের অভাবের ব্যাখ্যা করছি, সেই কারণগুলি কি এতই মহত্ত্বপূর্ণ যে, অন্যান্য বিষয়গুলিকে অবহেলা করা যায়?

—এই ত বন্ধু এতক্ষণে আমার বোধগম্য হবার মত কথাই বলেছ। আমিও ঠিক তাই বলতে চেয়েছিলাম। বর্দককে কেন প্রস্ফুটিত হবার আগেই ঝরে যেতে হল। কেন? কেন? যদি রগার বিস্পোছ্য এবং তার বিষমতাপূর্ণ সমাজে না হয়ে দিহবগানে বর্দককে থাকতে হত। তাহলে কি ঐ গোলাপের কুঁড়িকে এমনি নির্দয়ভাবে ফোটবার আগেই ধরাশায়ী হতে হত?

—না, তাহলে এমন কখনই হত না। আজ সমগ্র রগা'র নরনারীদের সব কিছু বিস্পোছ্যের হাতে, তার উপর অবশ্য জামাস্প আছে, কিন্তু রগা'র ভার বিস্পোছ্যের হাতেই ন্যস্ত। প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা তার হাতে বিনা পরিশ্রমে প্রচুর অর্থ জমা করে দিয়েছে। যার জন্যে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক মানুষ তাদের জীবনের ক্ষুদ্রতম আবশ্যকগুলি থেকেও বঞ্চিত রয়ে গেছে। অথচ এই বঞ্চিতেরাই তাদের নিজেদের পরিশ্রম লব্ধকে সেখানে দয়ারূপে ভিক্ষা পেতে চাইছে এবং তার জন্য তারা ওর সকল হুকুম মানতে বাধ্য। এই বাধ্যতার পরিণাম এমনি করেই ভীষণ রূপ ধারণ করে যা আজ আমরা চোখের সামনে এবং নিজেদের জীবনেও অনুভব করলাম।

—সেই জন্যেই মিত্র, আমাদের উচিত ঐ সব দার্শনিক তত্ত্বের

গোলক ধাঁধায় না পড়ে নিজেদের সমস্যার সমাধানের সাকার রূপ ও সাকার পরিস্থিতি দেখা ও উপায় বার করা। যাতে এমনি ঘটনা এবং তার কারণগুলি দুঃসহ স্মৃতি না হতে পারে।

—ওঃ অন্দর্জগর। রাত্রি অধিক হয়ে আসে, একটু পরেই চাঁদ অস্তে যাবে, অন্ধকার নেমে আসবে পৃথিবীর বুকে। তাই ওরাও দুজন নীরবে উঠে দাড়ায় টিলার উপর থেকে তাঁবুতে ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

॥ মানুষ এবং মনুষ্যত্ব ॥

লোলীদের দল আবার পূর্বদিকে রওয়ানা হয়। রগা নগরীতে এসেছিল এরা কত আশা নিয়ে হাসিমুখে। কিন্তু যাবার সময় চলেছে সকলে অশ্রু নিয়ে। এখানে ওরা যেন ওদের নয়নের মণি ফেলে চলেছে। তাই যায় আর পিছন ফিরে তাকায়।

আজই ওরা পর্বতমালার মেরুদণ্ড পার হবে। দুপুর হয়ে আসতে বিশ্রাম বা ভোজনের জন্য পাহাড়ী পথের একজায়গায় কিছুক্ষণের জন্য থামে। পাশেই দেবদারুর ঘন জঙ্গল। কাঠের অভাব হবে না এখানে। তরুণ, মিত্র দুজন রুটি ও জলের কুঁজো নিয়ে খানিকটা দল থেকে সরে গিয়ে একটা গাছতলায় বসে। এ জায়গাটি ওদের বড্ড ভাল লাগছে। ইরানে এমন জায়গা খুব কমই আছে যেখানে প্রাকৃতিকরূপে বৃক্ষ বনস্পতিতে এমনভাবে ঢাকা। প্রথম তরুণ এই ভেবে প্রশ্ন করে সাথীকে,—এটাও ত ইরানের এক অংশ, তবুও সেখানে এমন প্রাকৃতিক শোভা ত দেখা যায় না। ওখানকার পাহাড়গুলি অমন ন্যাড়া কেন? অপর সাথী কিছুদূরে ঝরণার পাশের জায়গা দেখিয়ে বলে।

—কেন তা বুঝতে পারছ না? ঐ দিকে তাকিয়ে দেখ যেখানে মানুষ এসে বিশ্রাম করে, তাদের পশুরা বিশ্রাম করে বা সেখান দিয়ে যাতায়াত করে। সেই সব জায়গাগুলি বৃক্ষশূন্য হয়ে গেছে। ঐ কাটা গাছগুলির গোড়া দেখে বুঝতে পারছ না জঙ্গলের সীমা ঐ পর্যন্ত ছিল?

—তাহলে মানুষেই জঙ্গলের সীমাকে সঙ্কুচিত করে? অন্য সাথী দাঁত দিয়ে এক টুকরো রুটি কেটে নিয়ে বলে,—মানুষ এবং তাদের

সহচর খুরধারী পশু। মানুষ বৃক্ষ কেটে নষ্ট করে আর গাধা, ঘোড়া, গরু, বাছুর প্রভৃতি পশুদের খুরের আঘাতে ঐ সকল ভূমিতে নতুন অঙ্কুরগুলি নষ্ট হয়ে যায়। আমি শুনেছি গাছ বেশী থাকলে পাহাড় ঠাণ্ডা থাকে আর সেখানে ঝরণার সৃষ্টি হয়। এমন অনেক শুকনো ঝরণা আমি দেখেছি।

—ও, *আজই সকালে কিছুদূর আসার পর আমরা দেখেছি* রাস্তার পাশে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট কূপ এবং তার গায়ে জল পড়বার গোমুখ রয়েছে। আমি তাই ভাবছিলাম এখানে বহুদূর পর্যন্ত জলের কোনও চিহ্নই নেই অথচ শুধু শুধু কেন এই জলধারণ করবার কূপ এবং গোমুখ।

—হ্যাঁ। মানুষ গাছ কেটে নষ্ট করে আর পশুদের দ্বারা অজান্তে নতুন গাছের অঙ্কুর নষ্ট করায়। তাই কুপিত প্রকৃতি তাকে কাঠ ও জল থেকে বঞ্চিত করে থাকে। শুধু তাই নয় জমির উর্বরতা থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। কারণ গাছ না থাকার জন্য পাতা ঝরে না। ঘাস, ছোট ঝোপ ঝাড় থাকে না। আর সেইগুলি পচে গিয়েই ত সার হয় এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

—উঃ মানুষ কতদিন থেকে এই কাণ্ড করে আসছে?

—যেদিন থেকে মানুষের ইতিহাস শুরু হয়েছে। আমার মনে হয় তখন থেকেই মানুষ এমনি অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে আসছে।

—তাহলে তুমি বলতে চাও যে আগেকার যুগের মানুষ এ যুগের মানুষের চেয়ে ভালো ছিল?

—সে কথার কোনও প্রমাণ আমার কাছে নেই। তবে বুদ্ধের একটি কথা আমার কাছে বেশ যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়।

—তাই তোমাদের বুদ্ধ মহান ও দূরদর্শী পুরুষ ছিলেন। তোমার কাছে যতটুকু শুনেছি তাতে আমার মনে হয় তাঁর প্রতিভার তুলনা হয় না।

—তা বলতে পারো। দোষের মধ্যে শুধু এইটুকু ছিল যে তিনি

তাঁর সময়ের অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া শুদ্ধ আদর্শবাদীর বদলে তিনি ছিলেন ব্যবহার-বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ। এই ব্যবহারিকতাই তাঁর কল্পনার উপর কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, বুদ্ধ বলেছিলেন, সর্বপ্রথম মানুষের কারও ভিন্ন সম্পত্তি বলে কিছুই ছিল না। জঙ্গলে অন্ন এবং ফল প্রাকৃতিক নিয়মেই হত। লোকেরা মিলেমিশে সেগুলি সংগ্রহ করে আনতো এবং মিলেমিশেই গ্রহণ করতো। তার বহুদিন পর কোনও একজনের মাথায় স্বার্থের ভূত চাপল। তখন থেকে সে নিজেই নিজের জন্য ফল সঞ্চয় করতে আরম্ভ করল। সঞ্চিত খাদ্য দেখে আর একজন জঙ্গলে গিয়ে পরিশ্রম করে আনবার পরিবর্তে রাত্রির অন্ধকারে সেই সঞ্চিত ফল থেকে চুরি করে এনে খেতে লাগল। এমনি করে চুরি করতে শিখল মানুষ। এদের দেখাদেখি অন্যেরাও নিজ নিজ পরিশ্রমের ফল জমা করতে লাগল আর তা থেকে চুরি করে নেবার জন্যও কিছু লোক তৈরী হল। ক্রমশ চুরি বৃদ্ধি হতে লাগল এবং দুই দলে মারামারি শুরু হল। মারামারি হাঙ্গামা শেষ হতে তার বিচার করবার জন্য পাঁচজন মুখ্য বা বিচারককে দুই দল থেকে সাব্যস্ত করা হল। কিন্তু এই বিচারক শুধু বিচার করতে গেলে তাদেরও পেট ভরে না, ঝগড়ার সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে থাকে। তখন সকলে বিচার করে তাদের মধ্যে একজন শক্তিমান ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করল, স্থায়ীভাবে বিচারক বা পঞ্চ বলে স্বীকৃত করল। এই ব্যক্তির খাওয়া-পরার সকল ভার গ্রহণ করে অন্যান্য সকলে। তাদের রোজগার বা পরিশ্রমের এক অংশ ঐ ব্যক্তিকে দিতে আরম্ভ করল। এই হল প্রথম রাজা যার প্রাদুর্ভাব এই বৈযক্তিক স্বার্থান্ধতার কারণ। বুদ্ধের এই ছোট্ট অথচ সরল যুক্তির মধ্যে খানিকটা সত্যের গন্ধ আমি অনুভব করি।

—সত্যের গন্ধ কেন, আমার মনে হয় এইটা সবই সত্যি। আমাদের ইরানে প্রথম কোনও আর্যরাজা ছিল না। মদ্রবাসীরাই

দেবককে প্রথম রাজা বলে স্বীকার করে। ইরানীদের সেই সর্বপ্রথম রাজা। তার রাজধানী ছিল হখমত্‌ন অর্থাৎ হমদান, আমরা দেখে এসেছি। দেবকের কয়েকজন বংশধর রাজত্ব করবার পর তাদের কাছ থেকে পারস বংশ রাজত্ব কেড়ে নেয়। তাদের মধ্যে কুরু (কোরোশ) এবং দারয়ব (দারযোশ) এর মত বলশালী রাজা ছিল।···দেবকের ইতিহাস থেকেই আমরা জানতে পারি তার আগে কোনও রাজা ছিল না। জন বিশেষ কাজের জন্য তাকে নির্বাচিত করেছিল।

—তারপর রাজা নির্বাচন হবার পরেই মানুষে মানুষে ভেদ ভাব এবং বিষমতার বিষ ছড়িয়ে পড়ল। দেবকের পর বারো তের'শ বৎসরের বেশী হয়নি, আজ আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তাদের চরম পতিত অবস্থা। যদিও স্বার্থান্ধতার দুষ্পরিণাম সকলকেই ভোগ করতে হয়। তবুও সকলেই এর জন্য দায়ী নয়। লাভবান হয় খুব কম সংখ্যক মানুষ আর এই কম সংখ্যাই সমস্ত দেশটাকে পতিত করে রেখেছে। সমস্ত দেশের সকল প্রকার দুঃখ কষ্টের মূল কারণ। এখনও দিহবগানকে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে সুখ-শান্তির রাস্তা এ নয়, সেখানকারই প্রচলিত নিয়মই শান্তির পথ।

—অর্থাৎ মানুষ নিজের, ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে সমষ্টির হিতের কথাই চিন্তা করবে এবং তাতেই নিজের সুখ মনে করবে।

—হ্যাঁ, তার প্রমাণ সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ। সকলের স্বার্থের কথা যদি তারা ভাবত, তাহলে আজ ঐ পাহাড়গুলি বনস্পতিহীন হত না। এখান দিয়ে যত যাত্রী গেছে, তারা প্রত্যেকে ভেবেছে আমি ত পার হয়ে গেলাম, আর কেই বা আসবে এখানে। আমার ত নগদ নগদ সুবিধা হল, তারপর এ জঙ্গলের বা ভূমির যা খুশী তাই হোক গে। অন্য মানুষ যা পারে তাই করুক।

—শুধু যাত্রীদের কথা কেন বলছ মিত্র! মানুষ তার ভবিষ্যতের

নিজের সন্তানের হিতের কথাও চিন্তা করে না। নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যেই ধন সংগ্রহ করা আবশ্যক মনে করে। তারপর মৃত্যুদিনের কোন নিশ্চয়তা না থাকার জন্য কিছু ধন লুকিয়ে রাখে এবং তার মৃত্যুর পর তার সন্তানেরা সেই ধন পেয়ে থাকে। নইলে অনেকেরই সন্তান নিঃস্ব হয়ে থাকতো।

—তাহলেও মানব সমাজের এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। বিনা পরিশ্রমে ধন প্রাপ্ত মানুষরাই পৃথিবীতে দুঃখের বীজ বপন করছে।

—তাহলে দেখ জঙ্গলের ঐ শতাধিক কাটা গাছের গোড়া দেখে অনুমান করা যায় নিচের দিক থেকে এমনি করে জঙ্গল নষ্ট হয়ে আসতে আসতে এতদূর এসেছে। এরপর মানুষ যদি অদূরদর্শিতা স্বার্থান্ধতার বশবর্তী হয়ে এমনি করে কাটাতে থাকে, তাহলে কোন এক সময় দেখতে পাবে এই বিরাট পর্বত তেমনি হয়ে আছে যেমন ইরানের আশে পাশের বিরাট পর্বতমালা হয়ে আছে।

ভোজন পর্ব সমাপ্ত করে আবার যাত্রা শুরু হয়। যুবক দুজন এখনও বসে গল্প করছে।

—তাহলে মানুষ কি শুধু প্রাকৃতিক সম্পত্তির সংহার করেই আসছে?

—হ্যাঁ, মানুষ সংহার করতে পারে যেমন তেমনি জন্মও দিতে পারে। মানুষের মধ্যে এই দুটি গুণই সমভাবে বিরাজিত। মানুষের মস্তিষ্কে আর মাটির গর্ভে যে কি আছে তা বলা কঠিন। দেখছ না মানুষ লোহা বা অন্যান্য ধাতুর খনি আবিষ্কারের জন্য বড় বড় পাহাড় খুঁড়ে পাতাল পর্যন্ত ধাওয়া করে তাদের বার করে। এসব হয়ত তোমার পছন্দ হবে না, কিন্তু এই সব দেখে আমার মনে হয় মানুষই জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা (বগ)। বাকী অনেক দেবতা বা এক দেবাদিদেব (বগান-বগ) সব মিথ্যে কল্পনা।

—মিত্র! সত্যিই কি এই বগান-বগ (দেবাদিদেব)-এর উপর তোমার কোনও বিশ্বাস হয় না?

—যদি ঐ বগান-বগ না হত তা'হলে মানুষের কাজ আরও সোজা হতে পারত। মানতেই যদি হয়, তা'হলে বলতে হবে যে ঐ ভগবানই পৃথিবীর কোণে কোণে অন্যায় অত্যাচার ও খুন সঙ্ঘর্ষ দিয়ে ভর্তি করে রেখেছে আর মানুষ সেই সব কম করবার জন্য দিনরাত মাথা ঘামাচ্ছে।

—এ কথায় আমি তোমার সঙ্গে সহমত হতে পারলাম না।

—আমারও সেজন্যে বিশেষ আগ্রহ নেই।

—যাই বলো সৃষ্টির প্রথমে যদি কোন মহান শক্তি বা মহান দেবতা না হতেন, তাহলে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব হত?

—এর জবাবে আমি শুধু বলতে চাই যে পৃথিবী অন্যায়ে ভরা। এর অধিকাংশ মানুষকে দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে শুধু ছটফট করে মরবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব এমনি ক্রূর পৃথিবীর সৃষ্টি যিনিই করুন না কেন তাকে আমি ক্রূর ব্যক্তি বলতে পারি বড় জোর, ভগবান নয়। বরং শয়তানএর কথা মনুষ্যমাত্রে বিশ্বাস করাতে পারো, কিন্তু তা জেনে মানুষের লাভ কি? তাছাড়া প্রত্যেক বস্তুর জন্মদাতা এক, এটাও মিথ্যা ধারণা।

—অর্থাৎ বিনা কারণেই বস্তু সকল জন্ম নেয়, এই ধারণা সত্য?

—আগে আমার ব্যক্তব্য শেষ করতে দাও। কারণকে ত আমি অস্বীকার করতে পারি না। পৃথিবীতে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বস্তুটিও এক কারণে সৃষ্টি হয়নি। অনেকগুলি কারণ মিলিত হয়ে একটি কাজের সৃষ্টি হয়। তাহলেই দেখ, অনেক কারণকে যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে এক কারণ বগ বা ভগবানের মহত্ত্ব কম হয়ে যায়।

—কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস মানুষকে শান্তি দেয়।

—হ্যাঁ নির্বল হৃদয়ের অবলম্বন, তাই দুর্বল হৃদয়ধারী মানুষের মন থেকে ভগবানের বিশ্বাস ত্যাগ করানো সবচেয়ে কঠিন কাজ। যেমন কঠিন সত্যিকার হাতি বিশ্বাসে ক্রীড়ারত শিশুর হাত থেকে খেলনা ছিনিয়ে নেওয়া।

—তাহলে তুমি আমাদের শিশু বলে মনে করো? দ্বিতীয় তরুণ মুচকি হাসে।

—অন্তত এই বিষয়ে। ভগবানের বিশ্বাস মানুষকে শুধু অপর বৃক্ষে আশ্রয়কারী পরগাছার মত পরাশ্রয়ী করে রাখতে পারে। আমার জীবনে আমি কখনও শুনিনি বা দেখিনি যে মানুষের একটাও সমস্যার সমাধান ভগবান করে দিয়েছেন। মানুষ অন্ধের মত এক দিক লক্ষ্য করে ছুটে চলে এবং কখনও জ্ঞানে বা কখনও অজ্ঞানে সেই পথে অপরের জন্য কাঁটা ছড়িয়ে যায়। তারপর কোনও একসময় তার যখন জ্ঞান হয় তখন সে সেই কাঁটা আবার সরাতে চেষ্টা করে। তাই বংশ পরম্পরায় ছড়ানো কাঁটা তুলে শেষ করতে কমপক্ষে দু-চার পুরুষ-এর দরকার হয়, দু-চারজন মানুষের সাধ্য কি।

—হ্যাঁ, এটা দেখা যায় যে মানুষ যখন ভীষণ কোনও বিপদে পড়ে তখন সেই বিপদ থেকে বাঁচবার জন্যে যদি আবশ্যক মনে করে তাহলে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে সেই কাজে লেগে যায়।

—শতাব্দী যাবত বোনা কাঁটা আজ অন্দর্জগর এবং তাঁর শিষ্যেরা তুলতে চেষ্টা করছে। একথা জোর করে আমি বলতে চাই না যে একাজে তাঁর সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ হবেই, যদি অসফলও হয়, তবুও তাদের চেষ্টা অকারণ লুপ্ত হবে না। যে আগুন জ্বলেছে সে আগুন নেভাবার নয়। এক পুরুষে না হয় দুই তিন চার পুরুষ অথবা দুই চার শতাব্দীর পর কখনও এমন সময় নিশ্চয় আসবে তখন মানুষ তার নিজের ঘরের আবর্জনা পরিষ্কার করে মানুষের থাকবার উপযুক্ত ঘর তৈরি করবে।

—তাহলে তুমি বলতে চাও যে আমাদের নিজ সমস্যা স্বর্গীয় শক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়?

—অবশ্য যদি সমস্যার সমাধান করতে না চাও এবং তাকে আরও ভারী করে তুলতে চাও তাহলে আকাশের দিকে মুখ করে

চুপ করে বসে থাকো। যদি তোমাদের কৃষাণরা আকাশের দিকে মুখ করে বসে থাকতো, তাহলে কখনই অমন সুন্দর মেওয়া আপেল প্রভৃতির বাগান তৈরি করতে পারতো না।' কতখানি পরিশ্রম করে কত কষ্ট করে দূর দূর থেকে তারা ফোঁটা ফোঁটা জল এনে ঐ বাগানে নিয়ে ঢেলেছে। কিছু দূরে দূরে কূয়ো খুঁড়ে, একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে দিয়ে কতদূর থেকে জলধারাকে নিয়ে এসেছে। ভূমির উপর দিয়ে জলস্রোতকে আনতে গেলে শুকনো জমি এবং সূর্যের তাপ তাদের অত কষ্টের জল প্রায় অর্ধেক শুকিয়ে দিত। সেই জন্যেই ত অত কষ্ট করে মাটির নিচে দিয়ে জলের স্রোতকে এনেছে। এখানে বুঝে দেখ তাদের সমস্যার সমাধান তারা নিজেরাই করে নিয়েছে। তাছাড়াও সেই জল তুলে আনবার সুবিধার জন্য মালার আকারে ঘড়াগুলো চাকার সঙ্গে বেঁধে অল্প সময়ে অধিক জল তুলে ক্ষেতের কাজে লাগায়। আমার ত মনে হয় মানুষের মস্তিষ্কের শক্তির প্রয়োগ সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে।

—এই সত্যকে কজনই বা বিশ্বাস করে ?

—বুঝতে বা বিশ্বাস করতে অনেকেই পারে, যদি তাদের ঠিক বোঝানো যায়। আমাদের এই লোলীরা কি বোঝে ? ওদের পিতা পিতামহ যা করে এসেছে, এই শীতে রোমকদের রাজ্যে আছি ত সামনের শীতে হুনদের রাজ্যে যেতে হবে। এমনি করে ক্ষুধিত থেকে, অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করে কোনপ্রকারে দিন কাটিয়ে দেওয়া।

—কিন্তু আমাদের মধ্যে এরা খুব ভালো ব্যবহার করেছে।

—তা কেন করবে না। অজ্ঞান বা অপরিচয়ের অর্থ এ নয় যে মানুষ সকল মানবগুণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এরা আমাদের সঙ্গে কত না আত্মীয়ের মত ব্যবহার করেছে, যদিও এরা আমাদের পরিচয় জানে না। অন্দর্জগরের উপর ওদের ভীষণ ভক্তি কারণ তিনি ওদেরই মত অধিক পদদলিত জাতিদের সমানতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমরাও তাঁর শিষ্য এইটুকুই এরা জানে।

তাতে এরা কত আত্মীয় সুলভ ব্যবহার করছে অথচ ওরা এও জানে যে অন্দর্জগর এবং তার শিষ্যদের সহায়তা করা অমার্জনীয় অপরাধ।

—এবার আমরা আমাদের পৃথক সীমানার কাছে এসে গেছি মিত্র। সেখান থেকে ওদের এবং আমাদের রাস্তা ভিন্নমুখী হবে।

—হ্যাঁ, বোধহয় আগামীকালই আমরা পীরোজপুর পৌঁছব। সেখান থেকে ওরা উত্তর দিকে আর আমরা পূবদিকে যাত্রা করবো। উদাসভাবে অন্য সাথী বললো।

—কে জানে এদের সঙ্গে জীবনে আর কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হবে কি না। এরা আমাদের সঙ্গে যা ব্যবহার করল এ জীবনেও শোধ হবে না।

—সহৃদয়তার ঋণ কখনই শোধ হয় না বা করা যায় না। যেমন তুমি বলেছিলে, মানুষ হল বয়ে যাওয়া প্রবাহের এক অঙ্গ।

সমস্ত উপকৃত এবং উপকারকর্তা নৌকা ও নদীর মত সংযোগ লাভ করেই আবার আলাদা হয়ে যায়। তারপর ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

—তবুও যারা কিছু মানবতার পাঠ পড়েছে, তারা ঋণ শোধ করবার কথা কখনই ভুলতে পারে না। সে ভাবে না যে তাকে এক ব্যক্তি উপকার করেছে। সে ভাবে ব্যক্তি নিমিত্ত মাত্র, তাকে সেই সমাজ উপকার করেছে। হয়ত সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত ঋণ শোধ করা সকল সময় সম্ভব হয় না, কিন্তু সমস্ত সমাজ ত রয়েছে।

—তাছাড়া কে বলতে পারে যেমন পথ চলতে একবার এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তেমনি আবারও ত কখনও হতে পারে?

—মানুষ বেদ্ (একপ্রকার গাছ)-এর সবুজ ডাল যেন। একটু ঠাণ্ডা আর নরম মাটি পেলেই শিকড় বিস্তার করতে আরম্ভ করে। আমরা যখন এদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম তখন শুধু অপরিচিতই ছিলাম না, এদের সমাজ, চাল-চলন, রীতি, রেওয়াজ প্রভৃতি সব

কিছুই অপরিচিত ছিল আমাদের কাছে। তারপর কত অল্প সময়ে আমরা এদের কত আপন হয়ে গেছি বল ত? এই ত মাত্র এক মাসের পরিচয়, অথচ আজ ভাবতেও পারছি না যে আগামী কাল বা পরশু বিদায়ের সময় কোন ভাষায় এদের অশ্রুকে সান্ত্বনা দেব?

—বিশেষ করে বর্দকের বোন ও মাসীর চোখের জলকে ততখানি সহজে থামাতে পারবে না।

—বেচারা বর্দক! আজ যদি সে আমাদের সঙ্গে থাকতো, তাহলে বিদায় নেওয়া সত্যিই প্রায় অসম্ভব হত। সেই জন্যেই ত বলছিলাম, মানুষ সকল জায়গায় তার শিকড় বিস্তার করতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। লোকে বলে ভগবান মানুষকে সাহায্য করেন, কিন্তু আমার মতে তার উল্টো। অর্থাৎ ভগবানের বদলে মানুষই মানুষকে সহায়তা করে আসছে চিরকাল।

ভাষা না জানলেও শুধু চেহারা দেখেই মানুষ বিদেশী অতিথির সাহায্যের জন্যে সহৃদয়তাপূর্ণ হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি একেবারে শূন্য হাতেই অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি। অমূল্য পণ্য ও রত্নদ্রব্যাদি পূর্ণ জাহাজ ডুবির মানুষ এমন এক জায়গায় গিয়ে আশ্রয় পেল, যেখানে তার শরীরের অবস্থা পৃথিবীতে প্রথম মাটি স্পর্শের দিনের মত। ভাষার এক বর্ণও না জানা সত্ত্বেও সেখানকার লোক তাকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে। অতএব মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি স্বাভাবিক।

—হ্যাঁ, সেই গুণ এই লোলীদের মধ্যেও আমরা আশাতীত ভাবে দেখেছি এবং উপলব্ধি করেছি।

—কারণ এরাও সর্বদা নতুন নতুন দেশ ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকে।

দুপুরের চড়াই-এর পর সন্ধ্যার কিছু আগে ওদের দল পাহাড় থেকে নিচের দিকে নামতে শুরু করে। এদিকে পাহাড় খুব শীঘ্র

জঙ্গলহীন হয়ে যায়। এর পরেই শুষ্ক ভূমি, শুকনো পাহাড় আর কাঁচা মাটির গোল গোল ঢিবির মত মানুষের ঘর দেখা যেতে থাকে। সামনে কিছুদূরেই লোকালয়। এবার বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই আলোচনা বন্ধ করে আশ্রয়ের কথা চিন্তা করতে করতে এগিয়ে চলে ওরা।

ঊনবিংশ অধ্যায়

॥ তিন রাজকুমার ॥

যাত্রীদল দিহমগান এলাকার এক অংশে এসে সেদিন আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানকার সদর দিহমগান বা দমগান সাজানো গোছানো উন্নত নগরী। নগরীর নাম থেকে বোঝা যায় যে এখানে মগ (পারসী পুরোহিত) দের বাসস্থান ছিল কোনও সময়। এখান থেকে ছুটি রাস্তা ছুদিকে চলে গেছে। একটি গেছে উত্তর দিকে গুরগান-এর দিকে, অন্যটি পূর্বদিকে অবহরশহর বা খুরাসান পর্যন্ত।

পরদিন তিনজন অশ্বারোহী দিহমগান থেকে বাইরে আসতে একজন ইহুদীর সঙ্গে দেখা হয়। ওদের পোষাক ছিল সোগ্দ দেশীয়। জ্যেষ্ঠ সাথীর দাড়ী লাল, চুল কিছু সাদা হয়েছে, নীল চোখের তারা। বাকী ছুজন বয়সে তরুণ, সোগ্দী বেশ। সঙ্গে ওদের চমৎকার তিনটি ঘোড়া। ওদের মালপত্র এবং কাফিলা (যাত্রীদল) আগেই রওয়ানা হয়েছে। এরা আরাম করে পিছনে পিছনে চলেছে। ইহুদী লোকটির সঙ্গে সামান্য ছু-চার কথা শেষ করে তিনজন আবার চলতে থাকে। ছুপুর হতে এখনও দেরি আছে তবুও বেলা বেশ হয়েছে। সময়টা ছিল শীতের। তাই অন্যান্য পোষাকের উপর আর এক প্রস্থ চামড়ার পোষাক পরেছে সকলে, যদিও এই চামড়ার পোষাক সাধারণ চামড়া নয়।

দিহমগানের এলাকাগুলিও ইরানের অন্যান্য প্রদেশের মত শুষ্ক। প্রাণী বা মানুষের জন্যে না আছে কোথাও জলের ব্যবস্থা, না গাছ বা ঘাষের শ্যামলিমা। সে জন্যে এদিকের গ্রামগুলিও বহু দূরে দূরে। যে গ্রামগুলি দেখা যায় সেগুলিও এই রাস্তার কল্যাণে। অবহরশহর বা কাছাকাছি রাস্তাগুলি সবই ব্যাপারিক পথের উপর।

ব্যবসায়ীদের সর্বদাই আনাগোনা এই সকল পথে তাই এই গ্রামগুলি সজীব। দিহমগান (দমগান) বা অন্যান্য গ্রামেও মেওয়া বা অন্যান্য ফলের বাগান দেখা যায়। কিন্তু সেগুলি যে মানুষের কঠোর তপস্যার ফল তা দেখলেই বোঝা যায়।

গ্রাম বহুদূরে পিছনে ফেলে পাশাপাশি চলেছে তিনজন অশ্বারোহী। রাস্তায় আর কোনও লোক দেখা যায় না। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে চলেছে ওরা। ওদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বললো,—কি আশ্চর্য লাগছে। কেমন সংযোগবশত আমরা তিনজন রাজপুত্র আজ সোগ্দী ব্যাপারীর বেশে একত্রিত হয়েছি? সময় চিরকাল একরকম থাকে না। রথের চাকা কখনও উপরে উঠছে, কখনও নিচেয়। কিন্তু সব কিছু মেনে নিলেও এই শূন্য পাহাড়ের মধ্যে তিনজন রাজকুমারের মিলন বিচিত্র সংযোগ বলতেই হবে। অতঃপর দ্বিতীয় সাথী উত্তর দেয়।

—হ্যাঁ তাতে সন্দেহ নেই। এখন কথা হল, আমার সাথীর জীবন কাহিনী শোনা হয়ে গেছে। আমার কথাও আপনি জানেন, এবার আমার ইচ্ছা যে আপনার কথা শুনি। আপনি কুশান বংশীয় রাজকুমার, এ পর্যন্ত আমরা জানি।

—হ্যাঁ, কুশান অর্থাৎ কুশ-এর বংশ, ব্যক্তিদের মত রাজবংশেরও উদয় ও অস্ত হয়ে থাকে, এবং একই বার হয়। আমাদের বংশ প্রায় পাঁচশ বৎসর রাজত্ব করেছে। রাজ্যও সাধারণ ছিল না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ আমাদের জনের হাতে ছিল। কপিশা (কাবুল) বাহ্লিক (বলখ), সোগ্দ থেকে পশ্চিমী সমুদ্র (কাস্পিয়ন) পর্যন্ত কুশানদের পতাকা উড়ত। কুশান রাজলক্ষ্মীকে দেখে সমগ্র পৃথিবীর হিংসা হত তখন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী সদা চঞ্চলা। আমাদের বংশও অনেক ভাঙাগড়ার সম্মুখীন হয়েছে। কনিষ্ক এবং হুবিষ্ক'এর বিশাল রাজ্যও একসময় সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করল। মাত্র পঞ্চাশ বৎসর আগেও কপিশা (কাবুল) এবং পশ্চিমোত্তর ভাগ আমাদের শাসনেই ছিল।

—ব্যক্তির মত রাজবংশেও যৌবন, বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু আছে। বলল তৃতীয় তরুণ।

—এতে বিচিত্রতার কি আছে? বংশের স্থাপনা এমন ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব হয়ে থাকে যার মধ্যে বীরত্ব ও যোগ্য শাসকের গুণ থাকে। সেই ব্যক্তি পুরানো রাজবংশের দুর্বলতার সুযোগই শুধু গ্রহণ করে না, নিজের বীরত্বের গুণে স্বয়ং ছত্রধারণও করে থাকে। তার পুত্রদের মধ্যে কেউ যদি রাজ্য স্থাপন কার্যে কোনও অংশ গ্রহণ না করে থাকে তাহলে নিশ্চয় তার মধ্যেও উচিত সকল গুণের আংশিক অভাব থাকবে। যোগ্য শাসক সর্বদাই যোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতে শাসনভার দিতে চায়, কিন্তু এমন খুব কমই দেখা যায় যে যোগ্য পিতার পুত্রও যোগ্য হয়েছে। এরই পরিণাম, নতুন রাজবংশের বৈভব দুই চার পুরুষের বেশী থাকে না। সিংহাসনের অধিকারী অধিকতর বিলাসী হয় এবং সৈনিক ও শাসকের গুণরহিত হয়ে থাকে। এমন রাজবংশ ততদিনই টিকে থাকতে পারে, যতদিন তার শত্রু দুর্বল থাকে।

—পার্থিয়দের অবস্থাই এ কথার যোগ্য উদাহরণ। বললো তৃতীয় ব্যক্তি। যদিও কুশানদের চেয়ে কম সময় তারা শাসন করেছে, তবুও আমি তাদের শক্তিশালী বলবো।

—পার্থিয়রা কুশানদের পূর্বেই রাজত্ব স্থাপন করেছিল। বললো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। আমার মনে হয় কুশানদের চেয়ে কম সময় তারা রাজত্ব করেনি। বহুদিন পর্যন্ত তারা একে অপরের সমকক্ষ ছিল। পার্থিয় ও কুশানদের মধ্যে কখনও কখনও যুদ্ধও হত। কিন্তু এরা দুজনেই বিশাল শকবংশের সম্বন্ধিত ভাই ভাই ছিল বলে আভ্যন্তরীন গোলযোগ কমই হত।

—তার একটা কারণ, পশ্চিমের রোমকদের ভয় ছিল, তাই পার্থিয়রা কুশানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শক্তিক্ষয় করতে চাইত না। আমার মনে হয় তাদের উত্তরাধিকারী সাসানীরা কুশানদের

সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদ করে উচিত কাজ করেনি, মন্তব্য করে তৃতীয় পুরুষ।

—ঠিক। সাসানীদের সঙ্গে যুদ্ধে নির্বল হবার পরই কেদারী হুনদের কাছে কুশানদের প্রথম পরাজয়। সাসানীরা হয়ত তখন একথা চিন্তা করেনি। তাই এখন শুধু সে কথা উপলব্ধিই করছে না, তার পরিণাম ফলও ভুগছে। কেদারীদের হাতে একজন শাহনশাহ মারা পড়েছে, এবং ক্রমশঃ তাদের শক্তিবৃদ্ধিও হচ্ছে। কি জানি সাসানীদের উপর এবার কোন বিপদ এসে পড়ে।

—ভবিষ্যতে কি হবে তা জানি না। বললো দ্বিতীয় পুরুষ। তবে এখন ত আমরা বড় বড় আশা নিয়ে কেদারীয়দের কাছেই চলেছি, এবং আশা করি সেখান থেকে হতাশ হয়ে ফিরতে হবে না আমাকে।

—হতাশ হবার ত কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন খাকান-এর নিমন্ত্রণ পেয়ে চলেছি।

—আমার একটা প্রশ্ন মনে জাগছে, বললো দ্বিতীয় পুরুষ। আপনি কেদারী খাকান-এর এতখানি অনুরক্ত হলেন কি করে বা অতখানি বিশ্বাস করলেন কি করে?

—অনুরক্ত হবার কথা নয়, তবে আমি হেফতালীদের বিরোধী নই। হ্যাঁ, বিরোধিতা করতাম যদি আমার মনে হত যে কুশান রাজলক্ষ্মীকে আবার হারানো আসনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় এবং শুধু সামন্ত হিসেবে আরও কিছুকাল ভোগ করা যায়, অতএব……

—যেমন পুরানো পার্থিয়দের সোরন-পল্লব এখন সাসানীদের সবচেয়ে বড় সম্মানিত সামন্ত হিসেবে ভোগ করছেন? তারও পদ খুব উঁচু এবং সাসানীদের সঙ্গে শালা-ভগ্নীপতি সম্বন্ধ থেকে আসছে চিরদিন।

—নতুন রাজবংশ অন্য রাজবংশের মুকুট এবং সিংহাসন ছিনিয়ে

নেয় সত্যি। কিন্তু তাদের অবশেষ লুপ্ত করতে চায় না। বলে দ্বিতীয় অশ্বারোহী।

—তার আবশ্যক হয় না। বেশী হলে আগের বংশের শেষ পুরুষের সন্তানদের কাউকে নষ্ট করা হয়। একেবারে লুপ্ত হতেও পারে না। কারণ অনেকদিন যাবত রাজ্যশাসন করা রাজবংশও বিস্তৃত হয়ে থাকে, তাদের সমূলে বিনষ্ট করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া পদচ্যুত রাজবংশের লোককে কৃপাপাত্র হিসেবে কিছুটা সম্মান দিলে তারা অধিক বিশ্বাসের পাত্র হয়ে থাকে।

—বাস্তবে কিন্তু আমার মনে হয় দেশের সকল ধন ঐশ্বর্য কিছু সংখ্যক সীমিত বংশধরেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে থাকে। তারা কখনও কখনও নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য আপোসে ঝগড়া দ্বন্দ্ব করে কিন্তু যখনই তাদের সকলের মিলিত স্বার্থের উপর আক্রমণ হয়, তখন আবার তারা মিলিত হয়ে যায়। সেই জন্যে বিজেতা পুরনো বংশের একেবারে বিলুপ্তি চায় না। বরং তাকে সম্মান দিয়ে থাকে। যে বংশ একবার রাজ্যভোগ করেছে সে বংশকে আবার রাজ্যারোহণ করতে দেখা যায় না।

—আপনারা জানেন যে কেদারী রাজা আমাকে ভয় করে না বা তার কোনও কারণও নেই। বললো জ্যেষ্ঠ পুরুষ। সে আমারও ভগ্নীপতি। যদিও রাজাদের মধ্যে ভগ্নীপতি বা জামাই প্রভৃতি সম্বন্ধের ফলে ঝগড়া দ্বন্দ্ব বন্ধ হয় না তবুও নিভে যাওয়া কুশান বংশের অবশিষ্ট আমি।

—তা সামন্তের স্থানে এই ব্যবসাবৃত্তি কেমন করে পছন্দ করলেন আপনি?

—অর্থাৎ:কুশান কুমারের পক্ষে এ শোভা পায় না বলতে চাইছ? এটা অবশ্য সত্যি কথা, একজন সামন্ত হিসেবে আমি আমার ভূমিতে থাকতে পারতাম, কিন্তু আমার দেশভ্রমণ করবার খুব সখ। একথা সকলেই জানে আমার বংশ সর্বদা বৌদ্ধধর্মী ছিল।

রাজকুমারদের মধ্যে অনেকে ভিক্ষু হয়ে গেছে। তারা ধর্ম প্রচারের জন্যে দূর দূর দেশে যাত্রা করেছে। আমিও ভিক্ষু ছিলাম।

আমার যখন জন্ম হয়, তখন কুশান বংশের সূর্য অস্ত গেছে। যদি তা নাও হত, তাহলে শাহনশাহের পুত্র হয়েও কয়েকজনের পরে আমার পালা আসা সম্ভব হত। অতএব দেশভ্রমণের আনন্দ পাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। পূবদিকে চীন দেশ দেখে এলাম। চীনের এখন আর সে শক্তি নেই যা আগে ছিল। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে এখন অনেক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। তবুও চীনকে সমৃদ্ধ দেশ বলা যায়। বিশেষ করে চীনের রেশম ত পৃথিবী বিখ্যাত এবং সেখানকার কারিগরও অদ্বিতীয়।

—চীনের রাস্তা কি এখানকার মতই ?

—হ্যাঁ এমনি ভূমি। কখনও কখনও একেবারে বালুময় ভূমিও দেখা যায়, আর জঙ্গলেপূর্ণ পাহাড়ী অঞ্চলও আছে। মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

—কোন জাতি আপনার সবচেয়ে বেশী পছন্দ হয়েছিল ?

—পছন্দ হওয়ার অর্থ এ নয় যে অন্যদের অপছন্দ করেছি। সকল জাতিদের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেষ্ঠ গুণাবলী হয়ে থাকে, দোষও আছে। তবে তাদের মধ্যে তুখার (তুষার) জাতিকে বেশী ভাল লেগেছিল আমার।

—তুখার কি বক্ষুতটের ভূমি ?

—না, এ নাম আমাদের কুশানদের কাছ থেকে পাওয়া। তুখার বহু পুরানো জাতি। মূলতঃ আমরা অর্থাৎ কুশানেরাও সেই তুখার জাতি থেকে এসেছি।

—মূলতঃ তুখার ?

—হ্যাঁ, তুখারদের একটা নগরীর নাম আজও কুশান (কুচান) রয়েছে।

—তাহলে কুশান ঐ কুচান থেকেই এসেছে ?

—এ কথা অবশ্য নিশ্চয় করে আমি বলতে পারি না। আমাদের পূর্বপুরুষ কুচান থেকে আরও এক মাসের রাস্তা পিছনে থাকতো। অবশ্য কুচানদেরও আদিভূমি ছিল সেইটা। সেই সকল এলাকায় আজও আমাদের বংশধর কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে আজ আর প্রভুতা নেই। ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশু পালনকারী হিসেবেই বাস করে তারা। কোনও এক সময়ে সেইখানেই আমাদের কুশদের সঙ্গে হুনদের যুদ্ধ হয়েছিল।

—কতদিন আগে? প্রশ্ন করে দ্বিতীয় অশ্বারোহী।

—তা প্রায় সাতশ বৎসর হয়েছে। কিন্তু সেই হুন কেদারী হুন নয়। বস্তুতঃ কেদারী হুনদের হুন বা শ্বেতহুন নাম জোর করে দিয়েছে, ওরা এই নাম পছন্দ করে না। হুনদের শাসিত দেশ থেকে এসেছে বলে ওদের হুন বলা হয়, কিন্তু বস্তুতঃ ওরা এবং আমরা খুব নিকট সম্বন্ধীয় জাতি।

—আর তুখার? প্রশ্ন করে তৃতীয় ব্যক্তি।

—তুখার তোমাদের দূর সম্বন্ধী। আমাদের পুরোনো ভাষা এখনও কুচান ভাষায় বলা হয়ে থাকে। আমরা কুশানরা এই দেশে এসে নিজেদের ভাষা ভুলে গিয়ে সোগদী বা হিন্দী ভাষা শিখেছি।

—তাহলে তুখারী ভাষাও নিশ্চয় বদলে গেছে কিছু।

—তা ত বটেই। তাই বলে একেবারে কোনও শব্দ পাওয়া যায় না তা নয়। হিন্দী এবং ইরানী ভাষায় ক্ষীর (দুগ্ধ) বলে, কিন্তু তুখারীরা এখনও "মল্ক" অথবা "মল্কবের" বলে। তেমনি হিন্দবাসীরা যাকে হাতী বলে ইরানীরা তাকে "ফীল" বলে, কিন্তু তুখারীরা বলবে "ক্লোন"।

—তুখারদের দেশে অনেকদিন ছিলেন বোধ হচ্ছে? বললে দ্বিতীয় অশ্বারোহী।

—হ্যাঁ অনেকদিন ছিলাম। জায়গাটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। যখন জানতে পারলাম কুশানদের বংশ এখানে রয়েছে

এবং কুশানদের ভাষা এখনও সুরক্ষিত রয়েছে এখানে, তখন একটু স্নেহ হওয়া অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্নেহের কারণ আমার পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করো না। তুখারদের স্বভাব বড়ই মধুর। ওদের রূপ যেমন সুন্দর, ওদের স্বভাবও তেমনি সুন্দর।

—তুখার জাতি কি মদ্রদের চেয়েও অধিক সুন্দর? প্রশ্ন করে তৃতীয় ব্যক্তি।

—আমি বলতে পারি তুখারদের ভূমি সৌন্দর্যের খনি। অমন সুন্দর নরনারী আর কোথাও দেখা যায় না। তবে আমার চোখে যা সুন্দর তা তোমার চোখেও সুন্দর হবে এমন কোনও যুক্তি নেই।

—তা কেন হবে? যা সুন্দর তা সমগ্র পৃথিবীর জন্যে সুন্দর।

—না সৌন্দর্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির মাপদণ্ড ভিন্ন হয়ে থাকে। কুচান ও মদ্রদের রূপের প্রশংসা করতে আমি চিন্তাই করি না। কিন্তু চীনবাসীরা তুখারদের সম্বন্ধে বলে, ওদের লম্বা চওড়া চেহারা আছে বটে কিন্তু লাল বর্ণের চুল আর নীল চোখ যেন বাঁদরের মত মনে হয়। ওদের লম্বা নাক ত ওদের সকল সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দিয়েছে।

—তাহলে আমাদের নিজস্ব সৌন্দর্যের মাপদণ্ড বদলাতে হবে? বললো দ্বিতীয় ব্যক্তি। তবে কেবল চীনদের সম্বন্ধে। আমার মনে হয় আপনার মুখে শোনা সুন্দর তুখারদের সৌন্দর্যের বিচারে আমাদের মতভেদ হবে না। কিন্তু আপনার কথায় মনে হচ্ছে যেন ওরা পৃথিবীর মাটিতে স্বর্গের দেবতা।

—আমি ওদের মধ্যে কয়েক বৎসর ছিলাম। প্রথমে ভিক্ষু, তারপর গৃহীর বেশে। এখনও যখন তাদের স্নেহের কথা স্মরণ হয়, মনে হয় আমি কেন চলে এলাম। আগন্তুকদের জন্য তাদের অপার স্নেহ, করুণা। যদিও উত্তরের হুন এবং পূর্বের চীনদের সঙ্গে তাদের কয়েকবার ঝগড়া হওয়ার ফলে তাদের সম্বন্ধে তুখারদের ধারণা অন্য-রকম। নিজ স্বতন্ত্রতার জন্য এমনি কয়েকবার যুদ্ধও করতে হয়েছে।

—তুখারদের কি তেমন জনবল আছে যে চীনের মত এবং হুনদের মত প্রবল শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে ?

—তাদের দৈনন্দিন জীবন দেখলে ধারণা করা কঠিন যে এরা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারে। বস্তুতঃ ওদের জনসংখ্যা বেশী নয়, তাই ওদের সংখ্যার চেয়ে বেশী সৈনিক দ্বারা আক্রান্ত হয়েই কয়েকবার আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু যেই শত্রুর শক্তি একটু কমতে দেখেছে অমনি তারা আবার স্বতন্ত্র হয়ে গেছে।

—তাদের দৈনিক জীবন কি রকম ?

—দৈনন্দিন জীবনে তুখার বড়ই সুখজীবী। তারা আগামী কালের চিন্তা করে না। খাওয়া এবং খাওয়ানো তাদের ব্যসন বলা যায়। দিনের তৃতীয় প্রহর হতে হতেই নৃত্য-গীতের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। লাল দ্রাক্ষী মদিরার কুতুপ সাজানো হতে থাকে। ওদের স্ত্রীরা স্বতন্ত্র। তারা নিজেদের পুরুষের চেয়ে ছোট মনে করে না। সঙ্গীত ও নৃত্যের কাছে তুখারদের সামনে চীনরা চিরকাল নত। সত্যিই আজ এখানে এসে মাঝে মাঝে মনে হয় এই মাটির পৃথিবীতে তুখাররা মানুষের রূপে বগ (দেবতা) ও বগিনী (দেবী) বাস করছে।

—তারা কোন ধর্মকে মানে ? প্রশ্ন করে দ্বিতীয় পুরুষ।

—কেবল বৌদ্ধ ধর্মকে। সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর সঙ্ঘারাম আছে! তার মধ্যে এমন সুন্দর সুন্দর চিত্র ও মূর্তি আছে যার শিল্পকৌশল দেখে আজকের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়। শোভা-যাত্রার সময়ে ত পুরো সপ্তাহটা সকল কাজ-কর্ম ছেড়ে সব নরনারী তথাগতের রথযাত্রা পালন কল্লে। নৃত্য, গীত, নাটকাভিনয়ে কাটিয়ে দেয়। বিত্থায়ও তারা পিছনে পড়ে নেই। অনেক বিদ্বান রয়েছে তাদের মধ্যে। বস্তুতঃ চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের এতখানি প্রচার-এর পিছনে এই তুখারদের সবচেয়ে বেশী হাত রয়েছে।

—কিন্তু তুখারদের যে রূপের কথা আপনি বর্ণনা করলেন,

তাহলে তাদের জন্য ত ভিক্ষুদের চীবর রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় পুরুষ হেসে ফেলেন এই কথা বলতে। প্রথম পুরুষও হেসে বলে,

—তোমার কথাই ঠিক, তার প্রমাণ আমি। তবুও সেখানে অনেক ভিক্ষু আছে। তারা কেমন করে সেই অপ্সরাদের থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে তা বলা কঠিন। তুখারদের সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলতে চাই, একদিকে যেমন তারা জীবনকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে এবং তার প্রতিটি মূহূর্তের মূল্য আদায় করে নেয়, ভোগ করে, তেমনি তথাগতের মত পরলোকবাদী ধর্মের উপরও তাদের অপার আস্থা রয়েছে তাদের উৎসব দেখলেই সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আমি কোথা থেকে আজ কোথায় চলে এসেছি।

—মর্ত্যলোক ছেড়ে দেবলোকে গেছিলেন। অবশ্য দেবলোক এমন কিছু খারাপ নয়।

—না না, খারাপ হবে কেন, আমার কাছে সে ত এক অতি মধুর বস্তু। নিজের বন্ধু-বান্ধবকে দেখবার জন্য কুচান থেকে বাহ্লীক-এর দিকে এলাম আর এসেই বোন এবং ভগ্নীপতির স্নেহের কাছে আটকে পড়লাম। আমার এই ব্যাপারী জীবন বেছে নেবার বিশেষ উদ্দেশ্য হল কখনও কখনও কুচানে যাওয়ার সুযোগের জন্য।

—তা কুচানের কোনও অপ্সরা নিশ্চয় আপনার ঘরে আছে?

—এই ত মুশকিল। কুচানের কন্যা বাইরে যেতে চায় না। নিজের দেশের প্রতি তাদের ভীষণ প্রেম ও অভিমান। তাই অন্য দেশকে তারা অবহেলনার চোখে দেখে।

—তথাগতের দেশ ভারতবর্ষকেও? দ্বিতীয় অশ্বারোহী অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

—সে কথা বলা কঠিন। তথাগতের উপর তাদের অপার ভক্তি, অতএব তাঁর দেশকে কখনই ঘৃণার চোখে দেখতে পারে না। তবুও আমার মনে হয় ভারতে এসেও থাকতে চাইবে না তারা।

তিনজন অশ্বারোহী কথায় কথায় এমন তন্ময় হয়ে ছিল যে আবহাওয়ার কথা কারও মনেই ছিল না। এমন সময় উত্তর দিক থেকে জোরে জোরে হাওয়া বইতে শুরু করল। হাওয়ার দাপটে ধুলো, কাঁকর উড়তে থাকে, ঘোড়ার কান খাড়া হয়ে যায়। এ অবস্থায় কোথাও উপযুক্ত আশ্রয় পাওয়া কঠিন। অগত্যা আলোচনা এইখানেই থেমে যায় এবং ঘোড়ার গতি বাড়াতে মন দেয়।

ত্রিংশ অধ্যায়

।। আতিথ্য ।।

সোদগী সওদাগর আজ অবহরশহর (খুরাসান)-এর প্রমুখ নগর নেশাপোর এ প্রবেশ করে। নেশাপোর শহর শাপোর প্রথম (খৃঃ ২০ শে মার্চ ২৪২-৭২) দ্বারা নির্মিত ভব্য নগর। নগরের চারিদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। চারদিকে চারটি প্রধান প্রবেশদ্বার রয়েছে। নগরটি চারকোণ সংযুক্ত। এখানকার সব রাস্তাগুলি নগরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একে অন্যকে সমকোণে কেটে সোজা চলে গেছে। কোন এক সময় শাহনশাহ শাপোর একটি সুন্দর নগর স্বপ্ন দেখেছিলেন, নেশাপোর সেই স্বপ্নের সাকার রূপ। চীন ও ভারত যাবার প্রধান বণিক পথের উপর হলেও এই নগর নিজস্ব বিশেষ মহত্ত্ব রাখে। কলা-কৌশলেও এর বিশেষ স্থান ছিল। কিন্তু হেফতালদের আক্রমণের ভয় এখানে সর্বদাই।

নগরের ভিতরে প্রবেশ করতে কোনই অসুবিধা হয়নি। প্রধান ব্যাপারী আগে থেকেই এখানকার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় রাখে। তাছাড়া ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে বার বার আসা যাওয়া করবার সময় বিশেষ বিশেষ ভেট এবং বখশিশ প্রভৃতির গুণে নেশাপোরের উঁচু নীচু সকল কর্মচারীদের কাছে তার বিশেষ মান ছিল। নেশাপোর-এর ব্যাপারী যখন হেফতালদের ভূমিতে ব্যবসা করতে যায় তখন তারাও এমনি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। ষোলটি চৌরাস্তা সম্বলিত এই বিশাল নগরী নির্মাণ করতে ১ম শাপোর সেলুকস দ্বারা নির্মিত তস্পোন নগর নির্মাণের সমতূল্য ব্যয় করেছিল। আজও তার সৃষ্টি নগরীর বাইরের ও ভিতরের সাজাবার জিনিষপত্র সেখানে মজুদ

রয়েছে। তম্পোন নগরী ছিল সাতটি বিভিন্ন নগরীর সমষ্টি। তিগ্রার উভয় তটে এই সাত ভাগ সম্পন্ন নগরী ভাগ করা। কিন্তু নেশাপোর একটা মাঠের উপর বিছানো কালীন-এর মত দেখতে। যদিও অবহরশহরের কনারঙ্গ পাশের "তুস" নগর-দুর্গে বাস করেন, কিন্তু এতে নেশাপোর-এর সমৃদ্ধির কোনও ক্ষতি হয়নি। সোগ্দী বণিকও কনারঙ্গ গজনস্পদাত-এর থেকে অন্তত দুই যোজন দূরে থাকতে পারলেই সন্তুষ্ট।

যাত্রীদল পিছনে ধীরে ধীরে আসছে। অশ্বারোহী তিনজনেই নগরের মধ্যে এক সামন্তের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হয়। তার চির পরিচিত সোগ্দী বণিক ও তার সাথীদের আনন্দিত হয়ে স্বাগত জানায় এবং তার প্রাসাদের সবচেয়ে সুন্দর ঘরে ওদের থাকবার ব্যবস্থা করে। জ্যেষ্ঠ ব্যাপারী তার দুজন সাথীর সঙ্গে সামন্তের পরিচয় করিয়ে দেয় তারাও সোগ্দী রাজবংশীয় বলে। বিশেষ করে দ্বিতীয় তরুণকে খুব বড় এবং প্রাচীন সামন্ত বংশের জ্যেষ্ঠ কুমার বলে পরিচয় দেয়। আরও বলে ওরা ব্যবসা করতে নয়, ভ্রমণ করতে এসেছে এখানে। ওদের বিশ্রামের পরই যাত্রীদল এসে পৌছয়। সামন্তের প্রাসাদের সামনে বিরাট আঙ্গিনায় শত শত মালবহনকারী পশুদের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে রাখা হতে লাগল। নগর হিসেবে নেশাপোর বেশ বড়, তাই কোনও প্রাণীরই থাকা বা খাওয়ার অসুবিধা হবার কথা নয়। যাত্রীদের সর্দার এখানে এক সপ্তাহ থাকবার ব্যবস্থা করে দুজন চাকরকে আগামী গন্তব্যস্থলে সংবাদ দেবার জন্য পাঠিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় তরুণ অর্থাৎ এখানে প্রতিষ্ঠিত রাজকুমারের এই সামন্তের বাড়ীটি খুবই পছন্দ হয়েছে। সামন্তের বিশেষ প্রয়োজনে নগরের বাইরে যাওয়ার দরকার হয়ে পড়ায় নিজ কন্যা নবানদুখ্‌তকে অতিথিদের সেবার ভার দিয়ে গেলেন। রাজকুমার এবং নবানদুখ্‌ত দুজনেই সুন্দর এবং তরুণ। সেজন্য রাজকুমারের সেবার জন্য কেবল

পিতার আজ্ঞাই কর্তব্য ছিল না। শীতের আরম্ভিক ঠাণ্ডায় আরক্ত নবানতুখ্‌ত-এর কপালে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে রাজকুমার অধিক সময় তার চুম্বন থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে পারে না। প্রথম চুম্বনে রাজকুমার লক্ষ্য করে নবানতুখ্‌ত-এর সলাজ চোখ দুটি আবেশে বন্ধ হয়ে যায় এবং চেহারায় রক্তিমাভা ফুটে ওঠে। অর্থাৎ কুমারী অন্যায় মনে করেনি। নবানতুখ্‌তও শুধু চাকর-চাকরানী দিয়ে কুমারের সেবা করিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারত না। সে নিজেই এসে উপস্থিত হত। প্রথমদিন মোট তিনবার আসা-যাওয়া করেছে। কিন্তু তার পরদিন থেকে প্রায় সময় নানাপ্রকার ছল-ছুতো করে কুমারের কাছে চলে আসতো।

নবানতুখ্‌ত নগরের এক বড় সামন্তের চতুর কন্যা। পিতার কাছে প্রশংসা শুনেই সে বুঝতে পেরেছিল, যাকে হৃদয়দান করতে মন চাইছে সে ব্যক্তি তার সর্বথা উপযুক্ত। কুমার কেবল রূপ-যৌবন-সম্পন্ন পুরুষ নয়, সে এক বৈভবশালী কুলের উত্তরাধিকারী। দ্বিতীয় দিন কুমার যখন ওর হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়, তখনও নবানতুখ্‌ত বাধা দেয়নি, শুধু লজ্জায় তার দৃষ্টি নিচের দিকে নেমে এসেছিল। সন্ধ্যা হয় হয় তারা দুজন প্রণয়সূত্রে বাঁধা পড়ে। সায়ংকালে একই চষকের উদুম্বরী মদিরা দুজনে পান করে প্রণয়ের পুষ্টিসাধন করে। তৃতীয় দিন আর বাড়ীর লোককে লুকিয়ে রাজকুমারের কাছে আসার প্রয়োজন নেই। মাতা অনেক কিছুই জেনে ফেলেছেন ইতিমধ্যে এবং তাঁর কাছ থেকে কোনও আপত্তি না ওঠায় নবানতুখ্‌ত আরও নিঃসঙ্কোচে আসতে লাগল। এমন কি নিজের দাসদাসীদের সামনেও কুমারের সঙ্গে একাসনে বসতে লাগল। কুমার যদিও তরুণীদের সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞাত নয়, কিন্তু নেশাপোর-এর এই সরল হৃদয় কন্যাকে তার ভীষণ ভালো লাগল, এর কথায় কুমার ভালোবেসেছে। এখন সে নিজের সাথীদের সঙ্গেও না দেখা করে সর্বদাই ঘরে থাকতে লাগল। চিন্তার যদি কিছু থাকে ত রাজকুমার

এই চিন্তা করছিল যে জ্যেষ্ঠ সদাগর কেন অন্তত তুই এক মাস এখানে থাকবার ব্যবস্থা আগে থেকে করল না।

কুমারের এই গুপ্ত কাহিনী অবশ্য জ্যেষ্ঠ সাথীর কাছে গোপন ছিল না আর তৃতীয় সাথীও কুমারের অভিন্নহৃদয় ছিলই। তাকে আরও কয়েকদিন নেশাপোরে থাকবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করে কুমার, কিন্তু জ্যেষ্ঠ রাজী হল না।

সীমান্ত এখান থেকে খুব বেশী দূর নয়, সেখানে ইতিমধ্যে হয়ত বহুলোক স্বাগত জানাবার জন্য এসে অপেক্ষা করছে। তাছাড়া এখানে পড়শী রাজ্যের সদাগরকে বেশীদিন থাকতে দেখে হয়ত কনারঙ্গের সন্দেহ দৃষ্টি পড়তে পারে।

দেখতে দেখতে সাত সাতটা দিন এমনভাবে কেটে গেল, যেন বিশ্বাস হতে চায় না। মনে হয় সাতটি মুহূর্ত বুঝি সবে হয়েছে।

রাত্রে ঘুমোবার আগে কুমার যখন দিনের সকল ঘটনাবলির কথা চিন্তা করত, তখন মনে হত এত সব ঘটনা এক তুদিনে হওয়া অসম্ভব। দিনের বেশীর ভাগ সময় নবানতুখ্‌ত-এর সঙ্গে তন্ময় হয়ে থেকেছে। তুজনের কারও খেয়াল নেই কখন দিন শেষ হয়েছে আর রাত্রি কতখানি হয়েছে। তুজনেই প্রার্থনা করেছে আগামীকাল দিনটা যেন আরও লম্বা হয়।

নবানতুখ্‌ত তার যথাসর্বস্ব বিনাসর্তে কুমারের হাতে সমর্পণ করেছে। কিন্তু সে নারী। নারীর বল আর অধিকার সীমাবদ্ধ। যখন সে হৃদয়দান করেছিল, তখন এত সব কথা চিন্তা করে দেখেনি। দেখবার যেমন অবসর ছিল না তেমন সে সময় চিন্তা করাও যায় না। কুমারের রূপ ও স্বভাবে নবানতুখ্‌ত মুগ্ধ হয়েছিল এই পর্যন্তই সে জানে। কিন্তু যখন চার দিন শেষ হয়ে গেল তখন মনে হতে লাগল, কুমার আর মাত্র তিন দিনের অতিথি। চারদিন কেটে গেছে, সন্দেহ নেই, এই চার দিনই নবানতুখ্‌ত-এর জীবনে চরম মধুর দিন। এই চারটি দিনের একটি মুহূর্তকে সে ব্যর্থ হতে দেয়নি। এত

আনন্দের মাঝে ওদের মনেও হয়নি যে এই ঘরটির বাইরে পৃথিবী বলে কোনও বস্তু আছে। তৃতীয় দিন কেটে যাবার পর ওর হৃদয় যেন বিচলিত হয়ে ওঠে। তবুও মুখে কোনও ভাষা প্রকাশ পায়নি। মাঝে মাঝে ওর সুন্দর আরক্ত মুখাকাশে যেন এক টুকরো কালো মেঘ উঁকি মেরে যায়। কুমারের দৃষ্টি এড়ায় না কিছুই। আদর করে আরও কাছে এনে নবানতুখ্‌ত-এর কাঁধের উপর হাত রেখে কুমার বলে—প্রিয়ে, আজ তোমার মুখে চিন্তার ছায়া দেখছি কেন? নবানতুখ্‌ত-এর চেহারা যেন আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। মাথা নিচু হয়ে আসে, চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। পাতলা ঠোঁট দুটি একটু কেঁপে ওঠে যেন, হৃদয়ের গতি বেড়ে যায় দ্বিগুণ। মুখে তার ভাষা সরে না। কুমার সব বোঝে। সেও আর ধৈর্য রাখতে পারে না। তাকে বুকের মাঝে চেপে ধরে আবেগ-ভরে। কুমার বলে, প্রিয়ে, তুমি হয়ত জানো যে আমাদের মিলনের দিন অর্ধেক শেষ হয়েছে। আর তিনদিন পরে আমরা একজনের থেকে একজন দূরে চলে যাব। এই কথায় নবানতুখ্‌ত আর ধৈর্য ধরতে পারে না। চোখের জল নেমে আসে যেন শ্রাবণের ধারায়। কুমারের হাতের উপর টপটপ করে পড়তে থাকে নবানতুখ্‌ত-এর উষ্ণ অশ্রুধারা। কুমার আবার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে,—তুমি কাঁদছ কেন প্রিয়া? কান্নার কোনও প্রয়োজনই নেই। তুমি ভুলেও মনে করো না যে আমি সাতদিনের অতিথির মত তোমার সঙ্গে প্রেম করেছি। তোমার আমার এই প্রেমকে তুমি অতখানি হাল্কা মনে করো না। আমি তোমাকে ছেড়ে জীবিত থাকতে পারবো না। কেঁদো না আমাকে বোঝবার চেষ্টা করো।

নবানতুখ্‌ত এই কদিন কুমারের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলে এসেছে। কিন্তু আজ যেন সব ভাষা হারিয়ে গেছে। হয়ত মনের মধ্যে ওর এত কথা জমা হয়ে আছে এবং এখুনি সেই সবগুলি একসঙ্গে

ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওর উন্নত বক্ষ যেন ফুলে ফুলে উঠছে, কিন্তু ভাষা বাদ সেধেছে, তবুও কম্পিত স্বরে বললো, পরদেশীর প্রেম। কত নারী এমনি প্রেম থেকে সাবধান হবার জন্যে কতই না গীত রচনা করে গেছে।

—তুমিও কি আমার ভালোবাসাকে ততটুকু মূল্য দিতে চাও? আমি বিদেশীদের মত তোমাকে চাইনি, প্রিয়তমা! যদি আমাকে বিশ্বাস হয়, তাহলে বিশ্বাস করো যে আমি আজীবনের জন্যেই তোমার হাত নিজের হাতে নিয়েছি।

—কিন্তু তিন দিন পরেই ত তুমি চলে যাবে। তার পর আবার যদি কেউ তোমাকে আপন করে নেয়? কুমার হেসে ওঠে এবার।

—আমার হৃদয়টা খুলে তোমার সামনে দেখাতে পারলে আমি নিশ্চয় দেখাতাম। কথা শেষ হতে কুমারের মুখভাব মলিন হয়ে যায়। নবানত্থুখ্ত কুমারের চোখের উপর চোখ রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তার চোখের তারার মাঝে বহুদূর পর্যন্ত তাকিয়ে কি যেন দেখে আর ধীরে ধীরে তার মনে হয় কুমারের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করে সে যেন তার প্রিয়তমের প্রতি অন্যায় করেছে। কুমারের চোখের ঐ দৃষ্টিতে ক্ষণিকপ্রীতির ভাব ত নেই। নবানত্থুখ্ত এই প্রথমবার নিজের হাত দিয়ে কুমারের কপালে, মুখে ও মাথার উপর আলতো স্পর্শ করে বললো,—

—না প্রিয়তম! আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি না। হয়ত অবিশ্বাস এবং বিয়োগ, এর পার্থক্য আমি বুঝতে পারিনি। আমি কিশোরী, অতখানি বোঝবার বয়সও হয়নি। আমাকে ক্ষমা করো। আমি শুধু এইটুকু জানি যে তোমার বিয়োগব্যথা আমি সইতে পারবো না। যতবার সেই ভবিষ্যতের দিনগুলির কথা মনে পড়ছে, ততবার আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না। কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারছি না। আমি, আমি…, বলতে বলতে নবানত্থুখ্ত-এর

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, কী যেন বলতে চায়, কিন্তু পারে না। কুমার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের আঙুল থেকে একটা অঙ্গুরী খুলে নবানত্থুখ্‌ত-এর হাতে দিয়ে বললো,—এই নাও প্রিয়তমা। এই আংটিকে আমার বাইরের আঙুলের মুদ্রিকা বলে মনে করো না। এর পদ্মরাগকে আমার হৃদয়ের অংশ বলে মনে করো। এই দিয়েই আমি তোমাকে বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, জীবন থাকতে আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় তুমি। নবানত্থুখ্‌ত-এর মুখ থেকে ক্রমশ চিন্তার ছায়া সরে যায়। এক অনাবিল আনন্দে ভরে ওঠে মুখমণ্ডল, যেমন ঘন বাদলামেঘের মোটা আস্তরণ ভেদ করে সূর্যের প্রথম আলো প্রতিফলিত হয় পৃথিবীর বুকে। কুমার ও নবানত্থুখ্‌ত-এর প্রসন্ন বদন দেখে আনন্দিত হয়ে ওকে গাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে ধীরে ধীরে স্নেহচুম্বন এঁকে দেয় মুখে ও কপালে।

—তাহলে আমার উপর আমার প্রিয়ার বিশ্বাস হয়েছে? কিন্তু একটু আগের তোমার মন ও মুখের সেই অন্ধকার রহস্যের কথা কি আমি জানতে পারি?

—অল্পবয়স্কা কিশোরীর স্বভাবসুলভ মূর্খতা বলতে পারো। কথা শেষ করে নবানত্থুখ্‌ত লজ্জায় কুমারের বুকের মাঝে মুখ লুকোয়।

—হোক সে মূর্খতা, আমার কাছে তাই ভালো। তবুও তুমি বলো কি বলতে চাইছিলে? অবশ্য যদি আমাকে জানবার অধিকারী মনে করো।

নবানত্থুখ্‌ত এবার তার গোপন কথা আর গোপন রাখতে পারে না। কুমারের হাত দুটি নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে মৃদু মৃদু চাপ দিয়ে যেন বলবার জন্যে শক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে, অতঃপর সলাজ দৃষ্টিতে কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো,

—অবুঝের মনোবিকার হয়ত, শুনে তুমি হাসবে।

—না সত্যিই আমি খুব সুখী হব।

—ভাবছিলাম, ভগবান মজ্‌দা যদি আমাদের এই প্রণয়ের ফলদান করতেন…বলতে বলতে আবার থেমে যায় নবানত্থুখ্‌ত। কুমার নিজের দুই হাতের মাঝে ওর মুখখানা আলতোভাবে চেপে মুখের কাছে নিয়ে এসে বলে,—

—ফল! মজ্‌দা যদি আমাদের প্রণয়ের ফল দেন? ওহো চমৎকার! কী ভীষণ আনন্দের কথা! প্রিয়তমা! সত্যিই যদি আমাদের সন্তান হয়, তবে সে তোমারই তপস্যার ফল। যদি পুত্র হয় তাহলে আমার সব কিছুই তার হবে প্রতিশ্রুতি দিলাম, আর যদি কন্যা হয় তাহলে সে আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় হবে।

কুমারের কথা শুনে নবানত্থুখ্‌ত-এর হৃদয়ের অন্তঃস্থল অবধি এক অভাবনীয় আনন্দে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। কুমারকে তার অপার অনুকম্পা ও বিশ্বাসের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজতে থাকে। কিন্তু ভাষা যেন আনন্দের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। অতঃপর হতাশ হয়ে কুমারের বুকের মাঝে মুখ লুকোয়। কুমার নীরবে ওর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে বিনিয়ে দিতে থাকে। ভাষার আর যেন প্রয়োজন নেই। উভয়ের বুকের স্পন্দন যেন তাদের শব্দের মাধ্যমে সব প্রকাশ করে দিয়েছে। ওরা অনুভব করে প্রেমের সীমা বাণীর সীমা থেকে অনেকদূর।

অষ্টম দিনের সূর্যোদয়ের অনেক আগে সোগ্দী ব্যাপারীদের কাফিলা (যাত্রীদল) রওয়ানা হয়ে যায়। শুধু ব্যাপারী তিনজন তাদের কয়েকজন পরিচারকের সঙ্গে কিছুক্ষণ পর যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সামন্ত অতিথিদের সমস্ত ভার নিজ কন্যার উপর অর্পণ করে বিশেষ কোন কাজে বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অতিথিরা এদের ব্যবহারে এত সন্তুষ্ট হয়েছিল যে যাত্রার দিন গৃহস্বামী উপস্থিত না থাকায় কোনওপ্রকার ভ্রম হয়নি।

আজকের এই দিন নবানত্থুখ্‌ত-এর কাছে সবচেয়ে দুঃসহ দিন। গতরাত্রে সারারাত কুমারের শয্যায় নিদ্রাহীন যাপন করেছে। যতক্ষণ ওর চোখ খোলা ছিল, ততক্ষণ চোখের জল এতটুকু শুকোয় নি। ভোরবেলা উঠে পরিচারকদের আদেশ দিয়ে প্রাতরাশ এবং অন্যান্য ভেট দ্রব্যাদি গোছগাছ করতে লেগে যায়। অতঃপর কুমারের সামনে এসে দাঁড়ায়। অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সংযত রাখতে, কিন্তু কুমারের চোখে চোখ পড়তে আর সামলাতে পারে না, ওর এত-টুকু শক্তি আর অবশিষ্ট নেই যে কুমারকে বিদায় জানাতে প্রাসাদ দ্বারে এসে দাঁড়ায়। কুমারেরও ভাষা নেই যেন। সে বুঝতে পারে নবানত্থুখ্‌ত-এর মনের অবস্থা। অতঃপর নবানত্থুখ্‌তকে বার বার বিদায় চুম্বন ও আলিঙ্গন দিয়ে বাইরে অপেক্ষমান সাথীদের কাছে চলে আসে।

সোগদী অতিথিরা বিদায় নিয়েছে। হয়ত এতক্ষণ তারা অবহর-শহর থেকে যোজন-দেড় যোজন দূরে চলে গেছে। কিন্তু নবানত্থুখ্‌ত এখনও কুমারের শয্যার উপর পড়ে পড়ে উপধানে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। ক্রমশঃ দুপুর হয়ে আসে, বেলা গড়িয়ে যায়, তবুও তার কান্না থামে না। ওর সখী ও দাসীরা বার বার চেষ্টা করে হার মেনেছে। সন্ধ্যার সময়ে মা এসে দাঁড়ালেন কন্যার শিয়রে। ধীরে ধীরে কন্যার মুখখানি তুলে নিজের বুকের মাঝে স্নেহভরে চেপে ধরেন। মায়ের স্নেহে যেন খানিকটা সান্ত্বনা পায় কন্যা, ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করে মা বললেন,—

—ত্থুখ্‌ত! তুমি অস্থানে হৃদয়দান করোনি। আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চয় ঐ তরুণের মধ্যে কোনও বিশেষতা দেখেছ। নবানত্থুখ্‌ত চোখ মুছে কিছু বলবার জন্যে এবার চোখ খুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে,—

—হ্যাঁ মা! আমার প্রিয়তম সত্যিই আমাকে মনেপ্রাণে ভালবাসে। সে আমাকে ভুলতে পারে না, কখনই নয়।

এই দেখ। নবানতুখ্‌ত কুমারের দেওয়া অভিজ্ঞান অঙ্গুরী দেখায় মাকে।

একে একে মায়ের কাছে সকল কথা প্রকাশ করে নবানতুখ্‌ত। নিজের ঘরে কুমার যে পায়জামা পরে পরে থাকতো তা লাল রংয়ের জরবফত (সুবর্ণপট)-এর তৈরী।

সামন্ত ঘরে ফিরতে মা সকল কথা প্রকাশ করে এবং সকলের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, কুমার নিশ্চয় কোনও শাহী রাজকুমার হবে।

একবিংশ অধ্যায়

।। সীমান্ত ।।

তিন অশ্বারোহী সদাগর নিজ যাত্রীদলসহ এক পাহাড়ী রাস্তা ধরে ইরানী সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। এখানকার পাহাড় গুলিও নগ্ন, কিন্তু খুব কাছাকাছি। দুপুর বেলা ওরা পাহাড়ের উপর দিকের পথে উঠছিল। সাথী তিনজন এতক্ষণ সম্পূর্ণ মৌন ধারণ করেছিল। তিনজনকে দেখে মনে হয় কয়েক যুগ বোধ হয় এরা মুখ খোলেনি। পাহাড়ী সীমান্ত-ঘাঁটি আরও কিছু দূর আগে। এখান থেকেই দেখা যায় উঁচু প্রাচীরের মধ্যে মাটির তৈরী কাঁচা ঘর-বাড়ী। এমন সময় একজন অশ্বারোহী সেবক অপর দিক থেকে এসে সংবাদ দেয়।

সীমাপাল আজ এখানেই আছেন। তেমন ভিড় নেই, অতএব পার হতে দেরি হবে না। ক্রমশ সীমাপাল-এর শিবিরে এসে পৌঁছয়। প্রত্যেকের হৃদয়ের গতি যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। সীমাপাল জ্যেষ্ঠ সোগ্দী বণিকের সুপরিচিত। সোগ্দী বণিকের সেবকের কাছে সংবাদ পেয়ে তিনি তাদের বসবার বন্দোবস্ত করে সেখানে ফল, মদিরা প্রভৃতির যোগাড় করে রেখেছেন, সীমাপাল খুব সম্মানের সঙ্গে জ্যেষ্ঠ বণিকের সঙ্গে মিলিত হলেন। অতঃপর নিজ সাথীদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন জ্যেষ্ঠ বণিক।

এখানে বসে জ্যেষ্ঠ বণিক চষকের পর চষক ভরে সীমাপাল-এর সঙ্গে কথাবার্তায় এমন লীন হয়ে আছে যে তাকে দেখলে মনে হয় না আজ এখান থেকে যাওয়ার জন্যে তার কোনও তাড়া আছে। কিন্তু অন্য দুজন সাথীর কাছে এক একটি মুহূর্ত যেন এক এক বৎসর বলে মনে হতে থাকে।

সীমান্তপাল-এর লোক যাত্রীদলের পণ্যদ্রব্য সব সাধারণভাবে খুলে পরীক্ষা করে দেখছে। স্বামীর এত ঘনিষ্ঠ পরিচিত বণিকের পণ্যদ্রব্যাদি এমন করে পরীক্ষা করবার দরকার কি ? তাছাড়া ওদের ভেট-পারিতোষিক ত আগেই পেয়ে গেছে। তবুও পরীক্ষা হল। সেবক এসে সূচনা দেয় সীমান্ত পরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। সীমান্ত-পাল যদিও এত শীগগীর ওদের ছেড়ে দিতে রাজী হয় না, তবুও অতিথিদের অত্যন্ত আগ্রহকে অস্বীকার করতে পারে না।

যাত্রীদল কিছুদূরে চলে যেতে তিনসাথী সীমান্তপালের কাছে বিদায় নিয়ে আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথে ইরানের সীমানার বাইরে হেফতালী সীমানার দিকে রওয়ানা হয়। খানিক চড়াই-এর পথ যাওয়ার পর পিছন দিকে ফিরে একবার তাকিয়ে দেখে। পর্বতময় ইরানের ভূমি ক্রমশ যেন পিছনে সরে যেতে থাকে।

আরও কিছুদূর গেলে উঁচু পাহাড়ী পথ নিচের দিকে নেমে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা পাহাড়ের নিচেয় ইরান সীমানার বাইরে এসে পৌঁছয়। এমন সময় হেফতাল সীমাপালকে অদূরে দাঁড়ানো দেখা যায়। কাছে আসতেই সীমাপাল দুই হাত বুকে রেখে ভূমি পর্যন্ত মাথা নত করে দ্বিতীয় বণিককে অভিবাদন করে এবং সকলের সঙ্গে নিচের দিকে চলতে থাকে।

এখান থেকে এক যোজনের কিছু বেশী রাস্তা চলবার পর একটি জলাশয়ের তীরে অনেকগুলি তাঁবু দেখা যায়। যাত্রীরা সেখানে উপস্থিত হতে তাঁবুর সামনের অপেক্ষমান একদল হেফতাল (কেদারী) সেনা রাজবেশে ভূষিত এক তরুণ সেনানায়কের নেতৃত্বে এগিয়ে আসে।

কাছাকাছি এসে প্রথমেই সেনানায়ক ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে আসে, এদিকে দ্বিতীয় অশ্বারোহীও একলাফে মাটিতে নেমে আসে। অতঃপর দুজনে ছুটতে ছুটতে এসে একে অপরকে

আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে। এমনি অনেকক্ষণ কেটে যায়। দ্বিতীয় আগন্তুক হাত ছাড়িয়ে প্রশ্ন করে,

—ওহো, যুবরাজ মিহিরকুল! তুমি কত বড় হয়ে গেছ?

—হ্যাঁ শাহনশাহ কবাত। কতদিন পর আমরা মিলিত হলাম, আজ আমার আনন্দের সীমা নেই।

—শাহনশাহ নই, এখন আমরা দুজনে বাল্যমিত্র মিহির এবং কবাত। তোমাকে কাছে পেয়ে আমার সকল চিন্তা-ভাবনা এবং পথক্লেশ দূর হয়ে গেছে। এমনি কথা বলতে বলতে দুই তরুণ অদূরে এক লাল মখমলী শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করে। ঢোকবার সময় প্রহরীসকল বার বার মাথা নত করে অভিবাদন জানায়। তরুণদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। শিবিরে প্রবেশ করে কবাত তার সাথীদের সঙ্গে যুবরাজের পরিচয় করিয়ে দেয়।

জ্যেষ্ঠ বণিক প্রথমেই যুবরাজকে অতি সম্মানসূচক অভিবাদন করেছে। শিবিরের দ্বিতীয় দ্বারে এক অসাধারণ ষোড়শী সুন্দরী দাঁড়িয়ে লজ্জাভরা দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। মিহিরকুল এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে টেনে কবাতের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে,—মিত্র! এই হল রাজমহিষী ফীরোজ-দুখ্‌ত-এর কন্যা। এবার যুবরাজ কুমারীর দিকে তাকিয়ে বলে,—আরে, নিজের মামা কবাতের কাছে এত সঙ্কোচ কিসের? তরুণী কিছু বলবার আগেই কবাত তাকে টেনে কোলে বসিয়ে আদর করেন।

ইতিমধ্যে মিহিরকুল মিত্রবর্মাকে পাশের শিবিরে থাকবার ও আরামের সকল প্রকার ব্যবস্থা করে দিয়ে ফিরে আসে।

শিবিরের মধ্যে আজ মাননীয় অতিথিকে স্বাগত জ্ঞাপন করা হবে। সকল ব্যবস্থাই আগে থেকে প্রস্তুত। মিহিরকুল বললো, ওপরের সীমান্তরক্ষীরা যাতে সন্দেহ করতে না পারে তাই মাত্র এক শত অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে আমি এখানে এসেছি। অন্য সকল ব্যবস্থাই 'মর্ব' গিয়ে হবে।

এমনি সরল ও অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বাগত কবাতের খুবই ভালো লাগে। এতদিন যাবত জীবন মৃত্যুর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লুকোচুরি খেলা খেলে ওকে থাকতে হয়েছে, আজ যেন মনে হয় ওর মাথার উপর থেকে পর্বত প্রমাণ বোঝা নেমে গেছে। বাল্যমিত্র ভারত, কপিশা, বাহ্লিক, সুগ্ধ ও খারেজম-এর মহারাজাধিরাজ তোরমান-এর পুত্র যুবরাজ মিহিরকুলের সঙ্গে বহুদিন পর আজ মিলন হল। মিহিরকুলের সঙ্গে কবাতের নিজ সহোদরার কন্যাও রয়েছে। আজ পর্যন্ত তার নামই শুনেছে কবাত। দশ বৎসর বয়সে দুই সাথীর ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, আজ মনে হয় যেন সহস্র বৎসর বাদে আবার দুজনের দেখা হল। প্রথম থেকে না জানা থাকলে হয়ত একে অপরকে চিনতে পারত না। এখন ত গত সতের বৎসরের সঞ্চিত কথা বলতে হবে, কিন্তু তার জন্যে চাই প্রচুর সময়।

চীনদেশীয় রেশমী ও সুবর্ণ সুতোয় তৈরী কালীনের উপর ওদের চৌকী পড়েছে বসবার জন্যে। চোকীর উপর বেশমী দুকুল বিছানো, তার উপর সারি সারি সাজানো রয়েছে ইরান, ভারত ও সোগ্দ দেশীয় নানাপ্রকার সুস্বাদু ফল, কয়েক প্রকার রান্না করা মাংস প্রভৃতি।

রাজকন্যার সকল সঙ্কোচ ইতিমধ্যে দূর হয়েছে। অতএব প্রথমেই সে মামার সামনে আগ্রহপূর্বক সুস্বাদু সুগন্ধযুক্ত ভোজন পাত্র এগিয়ে দিয়ে বহুমূল্য রত্নজটিত চষকে লাল মদিরা ঢেলে দেয়। দুজনের মধ্যে বসে কবাত সত্যিই সব কিছু ভুলে যায়। গত বৎসরের সকল ঘটনা যেন আজ দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। আজ আর তা স্মরণ করতেও ইচ্ছা হয় না। যে সময় কবাত নিজ ভাগ্নীর কাছে তার বোনের কথা জিজ্ঞাসা করছিল, তখন হঠাৎ চোখের সামনে সম্বিক ও সিয়াবখ্‌শ-এর ছবি ভেসে ওঠে। কিছুক্ষণের জন্য চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, কিন্তু তখুনিই সে ভাব দমন করে প্রশ্ন করে, —দুখ্‌ত! বলো আমার দিদি কেমন আছে? আমার কথা মনে আছে তার?

—মা প্রায় সময়েই আপনার কথা বলেন। যেদিন তিনি সংবাদ পেলেন যে, আপনাকে অনুশ্বর্তের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তারপর কয়েকদিন তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন। পিতা অনেক বুঝিয়েছিলেন কিন্তু তার চোখের জল কখনও বন্ধ হয়নি। তারপর যখন অনুশ্বর্ত থেকে পালাবার খবর পেলেন তখন থেকে তাঁর মনে কিছুটা আশা জেগেছে এবং বড়ই উৎসুক হয়ে তাঁর ভাইয়ের আগমন প্রতাক্ষা করছেন। যদি তাঁর নিজের সুবিধা হত তাহলে তিনি রোজ একজন লোক পাঠাতেন আপনার সংবাদ নেবার জন্যে। কিন্তু পিতা বললেন, এতে বিপদের সম্ভাবনা বেশী, তাই তিনি অনেক কষ্টে তাঁর উদ্বেগ চেপে আছেন।

শাহতুখ্‌ত (রাজকন্যা)-এর মুখে এই কথা শুনতে শুনতে কবাত যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ডান হাতে মদিরার চষক তেমনি ধরা রয়েছে। রাজকন্যার রক্ত অধরের ফাঁক দিয়ে মধুর স্বরে বেরিয়ে আসা প্রতিটি কথার দিকে তার বিশেষ ধ্যান। শুনতে শুনতে বাম হাত দিয়ে রাজকন্যার মাথার উপর আদর ভরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। তুজনের মধ্যে এখন আর এতটুকু সঙ্কোচ নেই। মিহিরকুলের বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে যেন অতিথির চষক খালি হয়ে না যায়। যদিও পরিবেশনের জন্যে বুকে হাত দিয়ে কয়েকজন পরিচারিকা অপেক্ষা করছে তবুও যুবরাজ নিজের হাতে মদিরার পাত্র তুলে ওদের ঢেলে দিতে থাকে। ওদের তিনজনের অবস্থা দেখলে মনে হয় যেন এই লাল তাঁবুর বাইরে আর কোনও পৃথিবী নেই, এমন কি তাঁবুর মধ্যে বিছানো বহুমূল্য কালীন, নানাপ্রকার বহুমূল্য বস্তু সকল, খাবার, পানীয় প্রভৃতি কোনও দিকে কারও খেয়াল নেই।

এমনি কতক্ষণ সময় কেটেছে, কত চষক মদিরা শেষ হয়েছে সেদিকে কারুর খেয়াল নেই। তুজনে কেবল অতীতের স্মৃতি মন্থন করতে থাকে। কবাতের কাছে তার শেষের অনুস্মরণ বড়ই খেদপূর্ণ ছিল, তাই সে কথা চাপা রাখাই ভালো। রাজকুমারীর নিজের

পিতামাতা ও রাজধানীর অনেক কথাই ইতিমধ্যে বলা হয়ে গেছে। মিহিরকুল নিজের ভ্রমণ সম্বন্ধীয় অনেক রোচক কাহিনী শোনায়। কত কথাই না বলা হয়ে গেছে, তবুও যেন কিছুই বলা হয়নি। রাস্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে মিহিরকুল বলে,—এখান থেকে রাজধানী যেতে পথ এত খারাপ যে ভারত পৌঁছতে অত খারাপ রাস্তা চোখে পড়ে না। পাহাড়ী রাস্তা এবং সে সব পাহাড় এত বড় যে এদিকের পাহাড়গুলিকে শিশু বলে মনে হয়। অন্য কোথাও যখন হিমের নামগন্ধ পর্যন্ত থাকে না তখন সেখানে রীতিমত হিম পড়ে। কিন্তু এমনি ভয়ঙ্কর মরুভূমি সেখানে নেই। বক্ষু নদী, বাহ্লীক দেশ তারপর গন্ধমাদন (হিন্দুকুশ)-এর বিশাল পর্বতশ্রেণী পার হয়ে কপিশার দ্রাক্ষাবলয়-ভূমি, তারপর সিন্ধুনদ পর্যন্ত পৌঁছতে আরও কত ছোট ছোট পর্বতশ্রেণী রয়েছে।

—হিন্দু (সিন্ধু) মহানদ কি বক্ষু নদীর চেয়েও বড় ?

—বক্ষু তার কাছে কিছুই নয়। সিন্ধুর গম্ভীর অতল চলায়মান জলরাশি পার হয়ে গেলে ওপারে তক্ষশিলা নগরী। যেখানে আমাদের ক্ষত্রপ জাতি বাস করে। এইখানে কুশান রাজার সঙ্গে হেফতাল (কেদারী) সেনাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। আমাদের সেনা অসংখ্য হত হয়েছিল সেই যুদ্ধে। আমাদের দাদা মহারাজের আদেশে সমস্ত নগরীকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেওয়া হয়েছিল। পরে তার পাশে নতুন নগরীর পত্তন হয়েছে। কিন্তু প্রথম নগরীর মত তেমন সুন্দর এবং সমৃদ্ধিশালী নগর আর হয়নি। নিবাসী অনেক কম। তারপর পাঁচ নদী পার হয়ে মধ্যদেশ ও যমুনাতটে শকদের রাজধানী মথুরা অবস্থিত। আমাদের সেই যুদ্ধে এই নগরীরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল।

—মনে হচ্ছে কেদারী বিজেতারা সেনা সংগঠনকেই অধিক মহত্ত্ব দিয়েছে, জনরঞ্জনের দিকে একেবারেই খেয়াল করেনি।

—হ্যাঁ একথা ঠিক। সেই জন্যে আমাদের বংশকে লোকে শুধু

ভয় করে, ভালোবাসে না, আমার মনে হয় রাজার বিজয় এবং প্রজারঞ্জন উভয় ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এখন যদিও পিতা মহারাজ এইদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, কিন্তু মানুষের মনে একবার দাগ পড়লে তা মুছে ফেলতে সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। হিন্দু দেশে যোদ্ধার অভাব নেই, অথচ আশ্চর্যের কথা এত বড় বড় যোদ্ধা থাকতে তারা চার শতাব্দী যাবত কুশানদের অধীনতা স্বীকার করে রয়েছে। আমরাও অবশ্য সোগ্দ এবং বক্ষুতট থেকে গিয়ে সেখানে রাজধ্বজ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলাম।

—কেন হল তাহলে ?

—বীর হলেও হিন্দুদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বৈমনস্য রয়েছে প্রচুর। ঘরের শত্রুতার জন্যে বিদেশীকে মিত্র বলে স্বীকার করে নেবে তবুও ঘরে ঘরে বিবাদ মিটিয়ে নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে থাকবে না। পরে আবার বিদেশীদের সেখানে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। কুশান জাতি অপবাদ স্বরূপ হলেও তাদের একটা গুণ ছিল। প্রজাদের দিকে তাদের খুব খেয়াল ছিল, হিন্দু দেশে গিয়ে তারাও হিন্দী হয়ে গেছে। আমাদের রাজ্যসীমার বাইরে গুপ্ত নগরীতে একবার গিয়েছিলাম। সেখানে যখন সন্ধি স্থাপন হয়, তখন গতকালের শত্রু, রাজকুমারকেও সম্মান প্রদর্শন করা হয়। গুপ্তরাজ নিজ রাজ্যে নগর, প্রাসাদ ও দেবালয়গুলিকে বিশাল করে সৃষ্টি করেছে, সেগুলিকে সুন্দর করে গড়তে তারা অদ্বিতীয় এবং অদ্ভুত কলা-কৌশলের পরিচয় দিয়েছে। এ বিষয়ে অবশ্য কুশানরাও পিছনে পড়ে নেই। তাদের রাজধানী মথুরা আমি দেখেছি, তক্ষশীলা তথা পুরুষপুর (পেশোয়ার)-এর সঙ্ঘারামেও আমি গিয়েছি। সে সকল জায়গায় গিয়ে দেখেছি, তারা গুপ্তদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু উভয়েই কুশানদের প্রশংসা করতে পরিশ্রান্ত হয় না।

পিতামহ মহারাজ শুধু সৈনিক ছিলেন, তাই অন্যদিকে তিনি খেয়াল করেন নি, সে জন্যে কেদারী বংশের ক্ষতি হয়েছে খুব। যুদ্ধের

সময় আমার পিতাও হিন্দুদের উপর কোনও প্রকার দয়া প্রদর্শন করেনি, কিন্তু এখন তিনি কুশানদের দূরদর্শিতার কথা বুঝতে পেরেছেন। আমাদের বংশ হাজার হাজার বৌদ্ধ সঙ্ঘারামকে বড়ই ক্রূরতার সঙ্গে নষ্ট করেছে, যার ফলে বৌদ্ধরা আমাদের বংশকে খুব ঘৃণার চোখে দেখে। ভবিষ্যতে তাদের কখনও যে নিজেদের দিকে টানতে পারবো, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে ব্রাহ্মণদের আমরা বিশ্বাস স্থাপন করাতে সমর্থ হয়েছি। মিথ্র (মিহির, সূর্য) আমাদের জাতির এবং ইরানীদেরও প্রতাপী দেবতা, হিন্দুরাও সূর্য পূজা করে। পিতাশ্রী গোপগিরি (গোয়ালিয়র)-র এক পর্বতের উপর খুব সুন্দর এবং বিরাট এক সূর্যমন্দির তৈরী করে দিয়েছেন। যার মধ্যে গুপ্ত এবং কুশানদের সুন্দর পাষাণ-শিল্প, বাস্তু-শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য সুন্দর মূর্তিকলার প্রয়োগ করা হয়েছে। এখন পিতা প্রজার মনোরঞ্জনের দিকে সর্বদাই খেয়াল করেন।

এখন কবাত যদিও ইরানের সীমার বাইরে চলে এসেছে, এখানে হেফতালদের প্রতাপ এত বেশী যে জানতে পারলেও ইরানী কনারঙ্গ গজনস্পদাত এদের সীমার ভিতরে আসতে সাহস করবে না। তবুও যত শীঘ্র সম্ভব সীমান্ত ছেড়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাদের তাঁবুর কাছের ছোট ঝরণাটি কিছুদূর গিয়ে নদীর রূপ নিয়েছে। তারই কিনারে সন্ধ্যার পূর্বেই ওরা যাত্রা করে।

সেদিন তারা মরুভূমির কাছে পৌঁছুবার আগেই আবার তাঁবু ফেলে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে। পরদিনও সমস্তদিন এখানে থেকে সন্ধ্যার পূর্বেই মরুভূমিতে যাত্রা শুরু হয়। চারিদিকে শুধু বালুরাশি। কোথাও কোথাও বালু জমা হয়ে পাহাড়ের আকার ধারণ করেছে। এখানে রাস্তা নেই, তাই রাস্তা চিনে চলাও কঠিন, কিন্তু পথ প্রদর্শনকারী ওদের সঙ্গেই আছে, যারা নিজের হাতের রেখার মত এই মরুভূমির নাড়ী-নক্ষত্র সব জানে। পূর্ণিমার রাত্রি। আকাশে তারা ভর্তি। তারা দেখেই পথপ্রদর্শক

রাত্রে পথ চলে, এ অঞ্চলের আকাশে বাদলা মেঘের উদয় খুব কমই হয়, তাই তারা দেখতে অসুবিধা হয় না। মরুভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে দূর দূর থেকে ইট পাথর নিয়ে এসে মিনার তৈরী করা হয়েছে, মীনারের পাশে ঘর আছে, সেখানে যাত্রী ও সৈনিক আশ্রয় নেয়, যাত্রীকে পথের নির্দেশ করে এবং দূর দূর থেকে জরুরী সংবাদ দ্রুত রাজধানীতে পাঠাতে সাহায্য করে।

সারারাত যাত্রীদল চলতে থাকে। পরদিনও মরুভূমি শেষ হয় না কিন্তু মূর্গাব (নদী)-এর কাছে আসা গেল। এই জীবনশূন্য মরুভূমির মধ্যে কেন এই সরিতা নিজের অমূল্য জলবিন্দুকে নষ্ট করছে, এর উত্তরও পাওয়া গেল। এরই খানিকটা দূরে সুন্দর এবং বিশাল উদ্যান দেখা যায়। ক্ষেত আজকাল শূন্য এবং অধিকাংশ গাছের পাতা ঝরে গেছে বা হলুদ বরন ধারণ করে আছে। তবুও এই বিরাট মরুভূমিকে দেখলে বোঝা যায় যে ঐ পুণ্যসরিতার কৃপাগুণেই এ সম্ভব হয়েছে।

সন্ধ্যা হয় হয় ওরা মর্ব নগরীতে পৌঁছয়। গত দুদিন ওরা একটা মরুভূমি পার হয়ে এসেছে, আবার সামনে আরও বড় মরুভূমি একটা রয়েছে। এই বিরাট দুটি নিষ্প্রাণ মরুদেশের মাঝে এত বড় একটা নগর। এ না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এই বিশাল নগরী হেফ-তাল সাম্রাজ্যের প্রথম নগরী। এখানেই ইরানী শাহনশাহকে স্বাগত জানাবার জন্যে বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। যুবরাজ ও শাহনশাহ নগরীর সামনে পৌঁছতেই এক বিরাট সেনাদল এগিয়ে আসে ওদের স্বাগত জানাতে। সেনাদলের সামনে রথের সারি, পর্বতাকার হাতীর সারি, তারপর অশ্বারোহী তারপর অগুনতি পদাতিক সৈন্য। সারা শহর শাহনশাহের দর্শনের জন্যে প্রাকারের বাইরে এসে উপস্থিত হয়েছে। মোহরের মত চেহারা এদের। আজ এদের দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পর এদের মধ্যে এমন পরিবর্তন হবে যে তখনকার মানুষ জানতে পারবে না, এখানে

কখনও সোনালী কেশ-দাড়ী, সুঁচলো নাক, দীর্ঘ দেহধারী কোনও মানুষ বাস করত। যারা সোগ্দীভাষী ছিল।

নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের মধুর নির্ঘোষ সহকারে ইরানী শাহনশাহকে স্বাগত জানানো হয়। বাজনার তালে তালে এই মর্ব নগরী দুরুদুরু কাঁপতে থাকে, নগরীর রাস্তাঘাট সুগন্ধি জলে সিঞ্চিত করা হয়েছে, যাতে ধুলো না পড়ে, নগর প্রদক্ষিণ শেষ করে যুবরাজ ও শাহ দুর্গের মধ্যে এসে পৌঁছলেন এখানে ভগ্নী রানী ও রাজা তোরমান কর্তৃক প্রেরিত অনেক ভারতীয়, হুন প্রভৃতি পরিচারিকা, দাস-দাসী প্রভৃতি উপস্থিত রয়েছে।

এখন সারা মর্ব নগরী জানতে পেরেছে যে ইরানের শাহনশাহ কবাত পালিয়ে এই মর্ব নগরীতে এসে উঠছেন। দশদিন পর সারা ইরানও একথা জানতে পারবে যে কবাত ইরানের ভয়ঙ্কর শত্রুর কাছে সকুশল পৌঁছতে সমর্থ হয়েছে। এ সংবাদ নিশ্চয় ইরানের শাসকবর্গের সকলের সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত করবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দুই রাজার মিলন ॥

জনসংখ্যায় মর্ব মহানগরী হুন রাজধানীর তুলনায় বেশী। রাজধানীর রাজপ্রাসাদের চেয়ে এখানকার রাজপ্রাসাদ বিরাটত্বে বা কোন প্রকারেই ছোট নয়। এক সপ্তাহ এখানে থাকবার পর কবাতের চেহারার পরিবর্তন দেখা যায়। গত দুই বৎসরের দুশ্চিন্তা রূপ মানসিক ব্যাধি এখন দূরীভূত হয়েছে।

অষ্টম দিনে আবার ওদের যাত্রা আরম্ভ হয়। বেলা দ্বিপ্রহরের পরই মরুভূমির পথ আরম্ভ হয়। সময়টা ছিল শীতের প্রারম্ভকাল, নইলে দিনের বেলা এই মরুভূমির পথ চলা কঠিন হয়ে পড়ত। গরমের সময় প্রায়ই মরু-ঝড় হয়ে থাকে, ফলে দিনের বেলা পথ চলা একপ্রকার অসম্ভব বলা যায়।

পর পর তিন দিন বালুকা-সমুদ্রে চলবার পর এবার ওদের দল বক্ষু নদীতটে উপস্থিত হয়। মরুভূমির মধ্যে ও কয়েক স্থানে রাজকীয় বিশ্রামগারের ব্যবস্থা ছিল বলে এবার কষ্ট তেমন হয়নি।

কবাত এখন আর অজানা সোগ্দী ব্যাপারী বা তীর্থযাত্রীর বেশে নেই, সকলেই জানে তাকে ইরানের শাহনশাহ। যদিও ষড়যন্ত্রের ফলে সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু আবার সিংহাসন দখল করবে। বিশেষ করে কেদারী সম্রাট তোরমান যখন তার ভগ্নীপতি, তখন সে আশা ফলতে দেরি হবে বলেও মনে হয় না। রাস্তার মধ্যে সকল জায়গায় নানাপ্রকার আরাম-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেমন রাজা তোরমানের জন্যে হয়ে থাকে। কবাতের জন্য বাহ্লিক দেশীয় সাদা রংয়ের সুন্দর ঘোড়া পাঠিয়েছেন রাজা

তোরমান। হুনরাজের বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কবাত জাঁকজমক-পূর্ণ পোষাক পরতে অস্বীকার করে সাধারণ রাজবেশে চলে।

মর্ব নগরীতে থাকাকালে মিত্রবর্মা প্রথম দুই তিন দিন নিজের গবেষণায় ব্যস্ত ছিল। কোনও সময়ে মর্ব নগরী পার্থিয়-পহ্লবদের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। মিত্রবর্মার পূর্ব বংশধররা পহ্লব থেকে পল্লব-এ পরিবর্তিত হয়েছিলেন। সেই জন্যে মিত্রবর্মা মর্ব নগরীর সম্বন্ধে বিশেষ অর্জন করতে প্রয়াসী হয়েছে। প্রথম দু-তিন দিন কবাত বেশীর ভাগ সময় যুবরাজ মিহিরকুলের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় কাটিয়েছে, তারপর হুনরাজ প্রেরিত সুন্দরীদের সঙ্গে কাটছে। এই সময়ে মিত্রবর্মা তার নিজের গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছে নিশ্চিন্তে। তারপর মিত্রবর্মার অভাব মনে হল কবাতের মনে।

এবার যাত্রার সময় কবাতের দুই পাশে মিহিরকুল ও মিত্রবর্মা চলেছে এবং রাজকুমারীও রয়েছে কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে। পথ চলতে চলতে মরুভূমির আলোচনার মধ্যে কবাত মিত্রবর্মাকে প্রশ্ন করে,—

—মিত্র! তোমার দেশেও কি এমনি মরুভূমি আছে?

—আমাদের দেশে সকল রকম জলবায়ুসম্পন্ন ভূমি আছে। ভারতের উত্তর সীমান্তে বহুদূর পর্যন্ত হিমালয় বিস্তৃত হয়ে আছে, যার সৌন্দর্যের কাছে কোহকাফ এবং দমাবন্ত তুচ্ছ মনে হয়। এমন স্থানও আছে যেখানে চার হাত বরফ পড়ে অর্থাৎ বৎসরের কোন সময়ই সেখানে গরম অনুভব হয় না। অন্যদিকে আমার জন্মনগরী কাঞ্চী এবং তার আশপাশের অঞ্চল, যেখানকার মানুষ জানেই না যে শীত নামক বস্তু কেমন।

—সে স্থান তাহলে অনেক দক্ষিণে? বলল কবাত। আমিও শুনেছি, দক্ষিণে যত দূর যাওয়া যায়, ততই শীতের প্রাধান্য কমে যায়।

—হ্যাঁ, হিন্দু দেশের সবচেয়ে দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত।

—আমি অবন্তীপুর (উজ্জয়িনী) থেকে আর দক্ষিণে যাইনি। ওদের কথার মাঝে যুবরাজ মিহিরকুলও সম্মিলিত হয়। তাও শীতের সময়ে, সেখানে শুনেছি। এর পর গ্রীষ্মকালে ভীষণ গরম পড়ে।

—আমাদের ওখানেও গরম পড়ে যথেষ্ট, কিন্তু বৃষ্টির জন্যে সেই গরম ততখানি অসহ্য মনে হয় না, যেমন গুপ্তরাজ্যে হয়। বললো মিত্রবর্মা।

—আমাদের ভারতীয় রাজ্য সম্বন্ধেও আমি এই রকম শুনেছি। আমার পিতামহ, পিতা বা আমি গ্রীষ্মকালে সেখানে কখনও যাইনি কিন্তু শুনেছি সেখানে গরমের জন্যে আমাদের কয়েকজন মন্ত্রী এবং উচ্চ অধিকারী মারা গেছে।

—আমি মরুভূমির কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। বললো কবাত।

—হ্যাঁ, হিন্দের পশ্চিমে মরুকান্তার নামে একটা বিশাল প্রদেশ আছে। আমি সেই মরুভূমির মধ্যে বেশীদূর যাইনি, তবে সেখানেও এখানকার মত আবহাওয়া।

—সেখানে তাহলে চর্ম-অস্ত্রে (মশক) জল ভরে নিয়ে যেতে হয়?

—নিশ্চয়। জল ত সেখানে সবচেয়ে দুর্লভ বস্তু। আমাদের দেশে মরুকান্তারকে ভয়ঙ্কর বলে মনে করে সকলে। নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে লোকসমাজে। লোকে বলে সেখানে নাকি বড় বড় রাক্ষস বাস করে, যারা পশুসহ সারা যাত্রীদলকে খেয়ে ফেলে তাদের সাদা সাদা হাড়-গোড় যেখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

—হাড় ত এখানেও দেখতে পাওয়া যায়। বলে মিহিরকুল। প্রায়ই উঁচু ঢিবির উপর চুনের মত সাদা মানুষ ও পশুর হাড় ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু তার কারণ রাক্ষসদের আক্রমণ নয়। চলতে চলতে যে পশু অসমর্থ হয়ে পড়ে, তাকে সেইখানেই ত্যাগ করা হয়। জল-খাবারের অভাবে মৃত্যু ছাড়া তাদের আর কি হতে পারে?

তাছাড়া মরুভূমির মধ্যে এসে মানুষও কখনও কখনও রাস্তা ভুল করে। এই মরুভূমির কেন্দ্রস্থল থেকে যেদিকেই যাও এক মাসের আগে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অতঃপর রাস্তা ভুল করে বিপথে ঘোরাঘুরি করে সম্পূর্ণ কাফিলা (যাত্রীদল) অন্নজল অভাবে হতাশ হয়ে মারা পড়ে। তাছাড়া ডাকাতদের আক্রমণের ভয়ও আছে।

বক্ষু নদী তটে পৌঁছে মিত্রবর্মার হৃদয় এমন ভাবপূর্ণ বিহ্বল হয়ে ওঠে যে নিজের আনন্দকে অধিক সময় লুকিয়ে রাখতে পারে না। মিহিরকুল মিত্রবর্মার অবস্থা দেখে বললো,—মিত্র! বক্ষুতটে এসে নিশ্চয় তোমার দেশের গঙ্গার কথা মনে পড়ছে? গঙ্গা গুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে হলেও আমি তার তট অবধি গিয়েছি।

—হ্যাঁ যুবরাজ। গঙ্গা অথবা কাবেরী। যখন থেকে দেশ ছেড়েছি তারপর তিগ্রা এবং হুফ্রাত ছাড়া বড় নদী আর দেখিনি। কিন্তু আমাদের গঙ্গায় শুধু বর্ষার সময়ে ঘোলা জল থাকে। নয়ত তার জল অন্য সময়ে খুব পরিষ্কার। তবুও এই বিশাল স্রোতধারা আমার মনে গঙ্গাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী,
নর্মদে, সিন্ধু, কাবেরী, জলেস্মিন সন্নিধি কুরু।"

—এটা কোন্ ভাষায় কি বললে? প্রশ্ন করে কবাত।

—এটা একটা সংস্কৃত পদ্য। যাতে আমাদের দেশের অনেকগুলি নদীর নাম রয়েছে। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, এগুলি আমাদের দেশের বিশাল ও পবিত্র নদী। বর্ষার আধিক্যে এদের স্রোতধারা ভীষণ বেগবতী ও চওড়ায় এরা বিশাল। আমাদের নদীতে নৌকায় যাতায়াতের প্রচলনই সকল জায়গায়, শুধু যাতায়াত নয় ব্যবসা-বাণিজ্যেও বেশীর ভাগ বিস্তৃতি জলপথেই।

—আমাদের বক্ষু এবং উত্তরের শ্যামা (সির) নদীতেও নৌকার প্রচলন আছে।

বক্ষুনদীর উভয় তটে দুটি সুন্দর নগরী প্রতিষ্ঠিত। দুই দিকেই

বিশাল প্রাসাদ, সুন্দর উদ্যান প্রভৃতি সাজানো। এখন শুধু রাজধানী পর্যন্ত যাওয়া, রাস্তায় সকল রকমের আরামের ব্যবস্থা যখন রয়েছে, তখন অত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি? তাছাড়া দেহরক্ষী হিসেবে এক হাজার সৈন্য সঙ্গেই রয়েছে।

বক্ষু পার হয়ে সংবাদ পাওয়া গেল, কবাতের ভগ্নী মহারানী এখানকার রাজপ্রাসাদে এসে উঠেছেন ভাইকে দেখবার জন্যে। দীর্ঘ সতের বৎসর পর নিজের ভাইকে দেখার আকুল আগ্রহে বোন যদি রাজধানী থেকে ছয় দিনের পথ এগিয়ে এসে অপেক্ষা করে, তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ভাই বোনের মিলনের সে এক অপূর্ব দৃশ্য। অনেক চেষ্টা করেও কেউ আনন্দাশ্রু সম্বরণ করতে পারে না। হুনরাজ্যের সীমার মধ্যে এসে কবাতের কোনও কষ্ট হয়নি এবং রাজকুমারী তার মামার সুখ সুবিধার দিকে সর্বদা নজর রেখেছে শুনে মহারানী খুব খুশী হলেন।

এখান থেকে বক্ষু নদীর ডানদিকের তট বরাবর ওদের যাত্রা সুরু হল। এদিকেও ছোট ছোট মরুভূমি আছে। কিন্তু ওরা নদীতট দিয়ে চলছিল বলে কোনও কষ্ট অনুভব হল না। নদীর পাশে পাশে কিছু দূরে দূরে লোকালয় আছে এদিকে।

আজ দুই সপ্তাহ হল কবাত হুনরাজ্যে এসেছে। এরই মধ্যে ভগ্নীপতির সুন্দর আতিথ্যের জন্যে কবাতের মনে হতে লাগল যেন সে এখনও তম্পোনের সিংহাসনেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এবং রাজকীয় কাজের জন্যেই রাজকীয় পরিবেশে ঘোরাফেরা করছে। মহারানীকে দেখে কবাতের সম্বিকের কথা মনে পড়ে। বোনের কাছে সম্বিকের ভূয়সী প্রশংসা করে কবাত, আজ খুবই ইচ্ছা হয় যদি এসময় সম্বিক ওর সঙ্গে থাকতো তাহলে কতই না আনন্দ হত।

বক্ষুর এপার এসে এখানকার অঞ্চলকে মিত্রবর্মার আরও ভালো লাগে। এখানকার অধিবাসী, জলবায়ু প্রভৃতি যেন আপনার মনে হয়। এদিকে মাঝে মাঝে ভিক্ষু সজ্ঘারাম দেখতে পাওয়া যায়।

মিত্রবর্মা ইরানী ভাষায় আজকাল ভালো কথাবার্তা বলতে পারে। এ দিকের ভাষায় (সোগদী) যদিও কিছুটা পার্থক্য ছিল, কিন্তু বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হত না। এদিকের দু-একটা সঙ্ঘারামে মিত্রবর্মা বিশ্রাম করতে করতে চলেছে। সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে আগত অনেক বিদ্বান ভিক্ষুর সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে। বক্ষুপারের প্রথম সঙ্ঘারামে এক ভারতীয় ভিক্ষুর সঙ্গে আলাপ হয় ওর। তার সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা চলতে থাকে। এতদিন পর একজন ভারতীয় ভিক্ষুর সাক্ষাৎ পেয়ে মিত্রবর্মার মন খুশীতে ভরে ওঠে।

আরও একদিনের পথ পার হয়ে ওরা বাবকন্দে এসে পৌঁছয়। বাবকন্দ বিশাল নগর। এখানে অনেক মহা মহা ধনী সার্থবাহদের নিবাসস্থল, যাদের কারবার চীন, ভারত, রোম তথা উত্তরী সপ্তসিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের একজন সার্থবাহের বৈভবের কাছে অনেক ইরানী বা ভারতীয় সামন্তদের বৈভব কিছুই নয় বলে মনে হয়। এখানেও কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার আছে।

রাজধানী পৌঁছুবার আগের দিন ওরা বুখারা নগরীতে এসে পৌঁছয়। এই নগরের কেন্দ্রস্থলে বিশাল এক বৌদ্ধ বিহার রয়েছে, সেই জন্যই এই নগরের নাম ও বুখারা (বিহার)। এখানকার পণ্যবীথিতে ও বিহারে মিত্রবর্মা ঘুরে ঘুরে অনেক বিদেশের ও নিজ দেশের লোকের সঙ্গে আলাপ করে ও সংবাদ নেয়। মিত্রবর্মা আগে শুনেছিল হুনদের রাজা তোরমান বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড় শত্রু। কিন্তু আজকাল চোখে দেখছে যে হুনরাজ্যের ছোট ছোট নগরীতেই শুধু নয়, রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে ও নানাস্থানে বিরাট বিরাট বৌদ্ধ বিহার, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তোরমান ও মিহিরকুলের কৃপাপাত্রদের মধ্যেও অনেক বৌদ্ধ রয়েছে। মিত্রবর্মার প্রশ্নের উত্তরে মিহিরকুল বলে,—ব্যক্তিগতভাবে রাজা যে কোনও ধর্মকে মানতে

পারে কিন্তু প্রজারঞ্জনের জন্যে দেশের সকল ধর্মের প্রতি তাকে সমান সম্মান ও সহানুভূতিপূর্ণ হতে হয়।

—একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে, যুবরাজ। আপনাদের হুন বলে কেন? প্রশ্ন করে মিত্রবর্মা। তস্পোনে আমি হুনদের দেখেছি এখানকার অনেক নগরীতেও দেখেছি, কিন্তু এদের রূপ ও রঙের এত পার্থক্য কেন? তাদের মুখে নামমাত্র দাড়ী-গোঁফ থাকে, ভ্রূ এবং চোখ উপরের দিকে উঠে থাকে, গালের হাড়ও বেশী চওড়া ও উপরের দিকে উঁচু, নাক ভীষণ চ্যাপ্টা, চীনাদের মত।

—আমরা হুন নই মিত্র। উত্তর দেয় যুবরাজ। দেখতেই ত পাচ্ছ ইরানীদের চেয়েও আমরা অধিক শ্বেতাঙ্গ, এবং অধিক পিঙ্গল কেশর। আমাদের চোখ, মুখ, নাক প্রভৃতি ইরানীদের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। আমাদের বংশ আর শক-পার্থিয়দের একই বংশ ছিল। উত্তর দেশে আমাদের পূর্বপুরুষরা পশুপালন করে জীবন ব্যতীত করত। এক সময় তাদের উপর হুনদের আক্রমণ হল। অস্ত্রী, শক ও পার্থিয়রা তখন বেশ সবল ছিল, তবুও হুনদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে পশুচারণা ছেড়ে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গেল। আমাদের মত ছোট ছোট দু-একটা জনপদ হুনদের বশ্যতা স্বীকার করে সেই খানেই ঘুমন্ত জীবন যাপন করতে থাকে। তারপর হুনদের বংশ অঁবারদের অত্যাচারে তারাও পশুপালন ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল।

এখনও অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হয়নি আমাদের পূর্ব-পুরুষরা এদিকে এসেছে। সেই সময় এখানকার কুশান রাজবংশ বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের না ছিল তেমন সৈন্যবল না ছিল মনোবল। সকলেই বিলাস-ব্যসনে মত্ত। তাদের সঙ্গে আমাদের জাতির সংঘর্ষ হল। হেরে গিয়ে তারা ভারতের দিকে পালিয়ে গেল। আমাদের জাতিও তাদের পিছনে পিছনে তাড়া করল। তারপর আমাদের জাতি হুনদের রাজ্য থেকে এসেছিল বলে ওরা আমাদের হুন বলে

বদনাম করতে লাগল এমনি ক্রমশ আমাদের জাতিকে হুন গ্রহণ করতে হয়েছে।

—ভারতেও কুষানদের রাজ্য আছে। তাই মনে হয় ওরাই ভারতে এই নাম প্রচার করেছে।

—হ্যাঁ। যুদ্ধের সময় সকল ঘুমন্ত জাতিদের মত আমাদের জাতিও খুব রণকুশলী, কিন্তু হুনদের মত ক্রুরতা নেই আমাদের। অবশ্য অনেক কাল হুনদের রাজ্যে বাস করে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু হুনভাষা প্রবেশ করেছে। যেমন আমার নামের শেষ 'কুল' (জ্যুল) হুন ভাষার একটা শব্দ।

—"কুল" আমাদের ভারতীয় ভাষা। বংশকে আমরা কুল বলে থাকি।

—হ্যাঁ। হুনভাষায় "কুল" কে "কুমার" বলা হয়।

—অর্থাৎ যুবরাজের নাম মিত্র কুমার ?

—হ্যাঁ। যেখানে অনেক জাতির মিলনস্থল, সেখানে ভাষান্তর অর্থাৎ ভাষার আদান-প্রদান হওয়া এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। তাছাড়া হুনরা আমাদের দেশে চার শ্‌ বৎসর শাসন করেছে।

কবাত এতক্ষণ রাজকুমারীর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত ছিল। এমন সময় হঠাৎ মিত্রবর্মাকে প্রশ্ন করে বসে,—মিত্র! এখানে কোনটা তোমার কাছে বিশেষত্বপূর্ণ মনে হয় ?

—আমার কাছে ত এই সোগদ দেশ তুনিয়ার সকল জাতির মিলন স্থল বলে মনে হয়। এখানে যেমন সমৃদ্ধ নাগরিক রয়েছে, তেমনি ঘুমন্ত সামন্তও আছে যারা শিবিরেই বাস করে। আমার মনে হয় যুগ যুগ এমনি চলে আসছে, ভবিষ্যতেও এমনি থাকবে। যুবরাজ! এখন ত উত্তর থেকে আপনাদের বংশ সব চলে এসেছে, সেখানে কি এখনও হুনরাই বাস করছে ?

—হ্যাঁ এখনও সেখানে সেই হুন বংশ রয়েছে, কিন্তু তারা ক্রমশ বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে। "হুন" শব্দ এমন বদনাম যে তাদের পরবর্তী

বংশধরেরাও সেই নাম গ্রহণ করতে চায় না। পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত হুনবংশ বিস্তৃতি লাভ করেছে। কাস্পিয়ন (খজার) সমুদ্র থেকে কালাসাগর এবং মহানদী দুনাই (ড্যানিয়ুব)-এর উপর পর্যন্ত চলে গেছে। হুনজাতি এখন খজার, অঁবার, বুলগার প্রভৃতি কয়েকটা নামে বিখ্যাত। অঁবারদের সঙ্গে চীনবাসীও এঁটে উঠতে পারেনি। আর এদিকে ত তারা আমাদের পড়শী, অতএব সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়।

—তাহলে অঁবার জাতিও হুনদের মত খুব যোদ্ধা ?

—হুনদের মত কেন, ওরাও ত হুনদের বংশ।

—হ্যাঁ, কে বলতে পারে হেফতালদের পর ওদের পালা আসবে কি না। এই ভূমি ত সকল জাতির মিলনভূমি। তাছাড়া এখানে আর একটা বিশেষতা লক্ষ্য করবার মত। এখানকার লোক সকলে ধার্মিক পক্ষপাতমুক্ত। ইরানে আজ দেরেস্তদীনের নাম উচ্চারণ করাও বিপজ্জনক। আগেও তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হত। কিন্তু এখানে ধার্মিক সঙ্কীর্ণতার খুবই অভাব দেখতে পাচ্ছি। লোক ধর্ম থেকে বিরত নেই কেউই, কিন্তু ধার্মিক দুরাগ্রহের স্থান তাদের হৃদয়ে একেবারেই নেই।

বুখারা নগরীতে পৌঁছবার আগেই সোগদ নদীর একটা খাল পড়ে রাস্তার পাশে। মিহিরকুল না বললেও মিত্রবর্মা বুঝতে পারে যে এই সোগদ নদীর নামানুসারেই দেশের নাম হয়েছে সোগদ। ফলের বাগানে এ সময় ফল নেই কিন্তু লোকের ঘরে ঘরে নানাপ্রকার ফলের অভাব নেই। সোগদ নদীর জলের জন্যেই এখানকার ফলের মধুরতার কথা মিহিরকুল বুঝিয়ে দেয়। মিত্রবর্মা হিরাত ও মুর্গাপ নদীর শাখানদীগুলির গুণ-কাহিনী এর আগে শুনেছে। এই নদীগুলি অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে কৃষি উপযোগী ভূমিগুলির পিপাসা তৃপ্ত করে শেষে নিজেই বালুকারাশির মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। সোগদ নদীও ঝাড়ুর মত বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে শেষে বালুর মধ্যে বিনষ্ট হয়েছে।

অবশেষে সেই দিন এল, যেদিন যাত্রীদল হুন রাজধানীর এক যোজন দূরে রাজোত্থানে এসে উপস্থিত হল। রাজা তোরমান নিজের শ্যালক ইরানের শাহকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এখানে এসে প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর ঘন শ্বেতদাড়ী, স্নিগ্ধ নীল চোখ, উন্নত ললাটের কোথাও এতটুকু ক্রূরতার ছায়ামাত্র দেখা যায় না। যা এতদিন লোকের মুখে মুখে লোক কথার মধ্যে শুনে এসেছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

। তোরমান রাজধানী ।

এখানে কবাতের জন্যে বিরাট এক প্রাসাদ ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে সদা সর্বদা তার আজ্ঞা পালনের জন্যে পুরো এক পল্টন দাস দাসী, চাকর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়ে আছে। এই প্রাসাদ রাজঅন্তঃপুর থেকে বেশী দূর নয় এ সময় রাজা তোরমানের নিবাস স্কন্ধাবার (শিবির) রাজধানীর বাইরে বিশাল মাঠের মধ্যে। বস্তুতঃ এই বিস্তীর্ণ ভূমি মরুভূমিরই এক অংশ। এই স্কন্ধাবার (শিবির) মিত্রবর্মার কাছে খুবই অদ্ভুত বলে মনে হতে লাগল। নগর এবং তার পাশের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত উদ্যানভূমি কতখানি শ্যামল বা মনোহর ছিল তা এখান থেকে দেখলেই বোঝা যায়। উদ্যান এবং ক্ষেত থেকে বাইরে আসতে সামনেই বালুকারাশি। এই বালুকারাশির উপর বিরাট এক তাঁবুর নগরী। এই তাঁবুর নগরী রাজধানী থেকে বিশেষ ছোট নয়। নানা রঙের ঘোড়ার কেশ দিয়ে তৈরী, কাপড়ের তৈরী বিরাট বিরাট তাঁবু-মহল একের পর এক সাজানো। এগুলি সবই একতলা। দরবার কক্ষ হাজার থামযুক্ত টুকরো জোড়া দেওয়া এক বিশাল পটমণ্ডপ। এখানে পাঁচ হাজার লোকের বসবার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এর দরবার-কক্ষ সাজাতে তম্পোনের দরবারকক্ষের চেয়ে কম কৌশল দেখানো হয়নি। দরবার কক্ষকে বিচিত্র করতে ভারতীয়, চৈনিক, ইরানী ও সোগ্দী শিল্পিরা যে যার শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন সৃষ্টি করেছে। ছাতে রাজা তোরমান ও তাঁর পিতার বীরগাঁথা প্রভৃতি চিত্রে অঙ্কিত। পাশের থামগুলিতে সেখানে সুবর্ণ-বস্ত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে, তার উপরও অনেক হেফতাল বীরের চিত্র টাঙানো। সমগ্র দরবারকক্ষ পটভিত্তি দিয়ে ঘেরা। তার বাইরে পাশে পাশে সশস্ত্র সৈনিক

পাহারায় রত। উচ্চাধিকারীর আজ্ঞা ব্যতীত প্রবেশ করা অসম্ভব। এই দরবারকক্ষ সাজাতে তোরমান, ইরানী, কুষানী ও ভারতীয় অনেক বিধি গ্রহণ করেছেন। তোরমান অন্যান্য দেশ জয়ের সময় শুধু সকল ধনসম্পত্তির লুঠের অংশই রাজধানীতে পাঠিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। সেই সব দেশের শিল্পী, বিদ্বান ও রূপরাশিকেও এখানে এনে একত্রিত করেছেন। হেফতাল সংস্কৃতি হুনদের চেয়ে অনেকাংশে উন্নত হলেও যখন্ থেকে এরা হুনদের ছেড়ে পালিয়ে আসে তখন থেকে ঘুমন্ত জীবনকে ত্যাগ করেনি। উত্তরের ঘুমন্তদের জীবনযাত্রার গর্ব করে এরা। নগর এবং গ্রামবাসীদের এরা কাপুরুষ, প্রভৃতি বলে ঘৃণা করে। যদিও রাজা তোরমানের রাজধানী ও রাজমহল গুপ্ত বা সাসানী মহলের বৈভবের চেয়ে কম নয়, তাছাড়া অনেক সময় তার অন্যান্য পরিবার বা স্বজাতী সামন্ত এই মহলে বাস করে থাকে, তবুও তাদের যাতে কাপুরুষ বলতে না পারে সেই জন্যে এরা প্রায়ই তাঁবুতে বাস করে। তাঁবুর জীবনই এদের কাছে সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক।

তাঁবুর নগরীতে বাছা বাছা বিশ হাজার সৈন্য, রাজকর্মচারী ও দরবারী বাস করছে। তবে এদের অব্যবস্থিত রীতিতে বসানো হয়নি। আসা যাওয়ার রাস্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার সকল ব্যবস্থাই রয়েছে। তাঁবু নগরীর কেন্দ্রস্থল বরাবর সোজা চওড়া রাস্তা চলে গেছে। তার দুদিকে সারি সারি তাঁবু মহল। খানিক দূরে বেশ বড় চৌরাস্তা, এখানে নগরের ছোট ছোট দোকানদার দোকান খুলেছে। কোথাও ফলওয়ালা আপেল, ন্যাশপাতি, আঙুর, সর্দা, খুবানী, আড়ু প্রভৃতি সাজিয়ে রেখেছে। কোথাও চাল, আটা, মাখন, মধু প্রভৃতি বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়াও কয়েকটা রাস্তার দু দিকে বড় বড় দোকানের সারি। কোথাও বস্ত্র বীথি, কোথাও বা জহুরী বীথি। আবার কোথাও বা চীন, ভারত, রোম-এর ব্যাপারীরা নিজ নিজ দেশের জিনিষপত্র সাজিয়ে রেখেছে। তাছাড়া নগরীর একপ্রান্তে এমন দোকানও রয়েছে যেখানে দাস ক্রয়-বিক্রয় চলছে।

হেফতাল জীবনের একমাত্র আদর্শ হল যুদ্ধ করা। যুদ্ধ বিনা ওদের জীবন ব্যর্থ। অর্ধশতাব্দীরও বেশী হয়ে গেল ওরা বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী, তবু আজও সাধারণ হেফতাল নরনারী ঘরের বদলে তাঁবুতে থাকা বেশী পছন্দ করে, চাষ-বাসের বদলে পশুচারণ এবং যুদ্ধকেই জীবিকা হিসেবে ধরে রেখেছে। তোরমান যদি সারা বৎসর রাজমহলে বাস করতেন তাহলে তার জনের চোখে ঘৃণিত প্রতিপন্ন হতেন। তোরমান ভারতের এক তৃতীয়াংশের, মধ্যএশিয়ার অর্ধেক ও সম্পূর্ণ কপিশার (কাবুল) রাজা হওয়া সত্বেও নিজ হেফতাল জনসাধারণের কাছে সর্দারতুল্য মাত্র। হেফতাল জনের সবচেয়ে বড় বীর, বিশ্বাসী ও প্রিয় পাত্র হল তাদের জন-সর্দার। অতএব সকল জন-এর কাছে সর্দার নিজেকে হেয় করতে পারে না নিজের তুচ্ছ সুখের জন্যে। তাই এই তাঁবু নগরীর সৃষ্টি হয়েছে, এত বড় সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেও হেফতাল জন-সর্দার সাধারণ লোকের মত তাঁবুতে বাস করতে অভ্যস্ত এবং বৎসরের নিয়মিত কয়েকমাস বাস করেন।

একটা পাকা সুসজ্জিত নগরীর বিস্তৃত বর্ণনার চেয়েও অধিক বর্ণনা করতে হয় এই তাঁবু নগরীর। এখানেও ঘুমন্ত জীবনের স্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। নগরীর একপ্রান্তে ঘুমন্ত জাতির প্রিয় অশ্বমাংস প্রস্তুত হচ্ছে। বলাই বাহুল্য যে এরা কম অন্ন ও অধিক মাংস ভোজী। এদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় মাংস অশ্বমাংস। খুব যত্নের সঙ্গে একে তৈরী করা হয়। ভূমির মধ্যে বিরাট গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে কাঠ-কুটো ভর্তি করে আগুন দেওয়া হয়। আগুন জ্বলতে জ্বলতে যখন উপরের মাটি গরম হয়ে যায়, তখন আগুন ফেলে দিয়ে গোটা অশ্বকে তার মধ্যে রেখে উপরে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়। এইভাবে সমস্ত দিন লাগে মাংস তৈরী হতে। তারপর কখনও কখনও এই গর্তের উপরে পাশাপাশি গোল হয়ে বসে যায় ছুরি আর শিংএর চষক হাতে নিয়ে। এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে

যায় তাঁদের ভোজন স্ফূর্তি করতে। সকল উত্তরী জাতিদের মত হেফতাল জাতিও ঘোড়াহীন জীবন কল্পনা করতে পারে না। ঘোড়াই এদের জীবনের সব কিছু। ঘোড়া ভিন্ন এক-পা চলতে পারে না এরা, ঘোড়ার দুধ এরা দুধ দই-এর মত ব্যবহার করে, তাছাড়া এই দইকে পচিয়ে এরা একপ্রকার কুমিশ (মদিরা) তৈরী করে। এই কুমিশ মদিরা ভিন্ন এদের আতিথ্য-সংকার পূর্ণ হয় না। তোরমান সভ্য দেশের সুস্বাদু ভোজনে অভ্যস্ত হলেও কুমিশ ও অশ্বমাংস বিনা তার তৃপ্তি হয় না। অশ্বমাংস ছাড়া মেষ, ছাগলও শূকরের মাংসও খুব প্রচলিত। যদিও পবিত্র মান্য করা হত তবুও গরুর মাংসের সামান্য প্রচলন ছিল, খুবই অল্প বলা যায়।

কুষানরাই গোমাংসের প্রচলনকে কম করে দিয়েছে। শ্বেত হুনদের রাজ্য ভারতবর্ষেও বিস্তৃত রয়েছে তাই তারাও গরুর প্রতি অন্য ভাবনা পোষণ করে থাকে, অতঃপর সূর্যের বলি ভিন্ন প্রায়ই গোমাংসের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কবাত যদিও এখন পদচ্যুত, তবুও একসময় সে সাসানী বাদশাহ ছিল, তাই এখন আগের মত খোলাখুলিভাবে ঘোরাফেরা করতে পারবে না। এখনও তম্পোনের সিংহাসনে বসবার সম্ভাবনা আছে, হয়ত জামাস্প-এর অনুচর পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করতে পারে।

মিত্রবর্মার স্বচ্ছন্দ বিচরণের কোনও বাধা নেই। এখানে একজন ভারতীয় রাজকুমারের সঙ্গে মিত্রবর্মার পরিচয় হয়ে গেল, এই রাজকুমার তোরমান-এর একজন প্রতিষ্ঠিত দরবারী।

সেদিন মিত্রবর্মা তার ভারতীয় সাথীর সঙ্গে তাঁবু নগরী ভ্রমণ করছে। তোরমানের রাজধানীতে এমন অনেক জিনিষ আছে যা উঁচু প্রাচীর ও অট্টালিকার আড়ালে থেকে যায়। কিন্তু এই তাঁবু নগরীতে রাজধানীর সব কিছুই খোলাখুলিভাবে দেখবার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। দাস-দাসীদের হাটে যেতেই দালাল জুটে গেল

একদল। কেউ বলে, আসুন মহাশয়, এখানে ভারতের চমৎকার সুন্দরী দাসী আছে খুব সস্তায়, কেউ বলে আসুন দেখুন কি চমৎকার তুখার দাসী, চমৎকার এদের সৌন্দর্য, দেখলে কিনতে ইচ্ছে করে। কেউ চীনা দাসীর প্রশংসা করে। কেউ বা অঁবার জাতির ছোট চোখ ও হৃষ্টপুষ্ট শরীরধারিণী দাসীর প্রশংসা করে। ওরা ত আর দাস-দাসী কিনতে যায়নি, তাই দেখারও প্রয়োজন নেই। মহারাজ তোরমানের কৃপায় ওদের মহলে দাস-দাসীর অভাব নেই। ওরা শুধু দেখতে এসেছে। এখানে অন্যান্য নির্জীব পণ্য সামগ্রীর মত মানুষগুলিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এদের শরীরে পরিষ্কার নতুন নতুন পোষাক, মাথার চুল সুন্দরভাবে আঁচড়ানো। বয়স কম দেখাবার জন্যে কারও কারও চুলে মেহেন্দী রং লাগানো হয়েছে। এমন কি গ্রাহকের মনস্তুষ্টির জন্যে ইশারা পেয়েই তার সামনে মুচকি হাসিও হাসতে হয় এদের। মিত্রদ্বয় লক্ষ্য করছিল, সেই হাসি হাসি নয় শুধু বাধ্য হয়ে হাসার চেষ্টা করা। ভিতরে ভিতরে চিন্তা ও দুঃখে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে যেন। সমস্ত দাস-পণ্যশালা দেখবার মত শক্তি মিত্রবর্মার ছিল না। ওর মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। বন্ধুকে নিয়ে মিত্রবর্মা এখান থেকে বাইরে চলে আসে। চলতে চলতে মন হাল্কা করবার জন্যে কথা বলে মিত্রবর্মা—এরাও আমাদের মতই মানুষ। এদেরও প্রিয় দেশ, নগর, প্রিয় জাতি, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব রয়েছে। স্ব-ইচ্ছায় এরা তোরমান নগরীতে বিক্রীত হতে আসেনি। জোর করে অপহরণ করে আনা হয়েছে এদের। আজ পশুতে আর ওদের কোনও ভেদ নেই। পশুদের মত মরতে মরতেও স্বামীর আদেশ পালন করতে হবে।

আজ তোরমানের শিবিরে মধ্যাহ্ন ভোজন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। অতএব সেদিকেই পা বাড়ায় ওরা। কবাত নিজ ভাগিনেয়ীকে কাছ ছাড়া করতে পারে না, সেও সেখানে রয়েছে। তোরমান ভোজন শালায় নিজ আসনে বসে আছেন। তার পাশে অনেক অতিথিরাও

বসেছেন। এখানে যদিও বিধিপূর্বক আগুনে ঝলসানো বাছুরের মাংস এবং অশ্বিনী-ক্ষীর এবং মদিরার অভাব নেই, তবুও প্রাধান্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাগরিক খাদ্যের।

মিত্রবর্মা তোরমানের কাছাকাছি আসনে বসেছে। খেতে খেতে মিত্রবর্মা লক্ষ্য করে রাজা তোরমান-এর সামনে অন্য দেশীয় রাজকুমার অথবা সামন্তরা রীতিমত সম্মান প্রদর্শন করে নিজেকে অকিঞ্চন ভাবছে, সেখানে তারই পাশের হেফতাল যুবক তোরমানের সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করছে এবং অকপটে কথা বলতে বলতে রাজার সামনে রাখা চৌকির উপরের মাংস কেটে কেটে নিচ্ছে এবং পাশের স্বচ্ছবেশ হেফতালকে এগিয়ে দিচ্ছে। ভোজনশালায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে রাজা তোরমানের সম্বন্ধ নিজ জাতি হেফতাল-দের সঙ্গে এক রকম এবং অন্যান্যদের সঙ্গে অন্য রকম। ভোজনের প্রধান অঙ্গ হল পান করা। তোরমান নিজে যদিও ততটা পানাসক্ত নয়, তবে নিজ সর্দারগণকে আগ্রহভরে পান করাতে ব্যস্ত। এখানে বহুমূল্য চষক থাকতেও হেফতাল লোকেরা শিংএর চষকে পান করাই অধিক পছন্দ করে। আজকের ভোজ ইরানের শাহের অভিনন্দনের জন্যেই বিশেষভাবে ব্যবস্থিত। কবাত এত বেশী পান করেছে যে ভোজন শেষে নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়ানো তার পক্ষে কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। মিত্রবর্মা এবং তার ভারতীয় বন্ধু তোরমানের কাছ থেকে একটু দূরে বসেছিল বলে মাত্রাহীন পান করতে হয়নি।

সায়ংকালে ভোজনশালা থেকে বেরিয়ে আবার দুজনে নগরের দিকে চলতে থাকে। তাঁবু নগরীর পাশে সবুজ বনের পাশ দিয়ে সরু এক জলধারা বয়ে চলেছে। দুই বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় এসে বসল।

মিত্রবর্মা বলে,—দেখছ এখানে কতখানি পরস্পর বিরোধ? আমরা দাসবীথি দেখলাম, সেখানকার ভাগ্যহীন মানুষগুলোর

নতুন নতুন পোষাকের মধ্যে দেখলাম ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। আবার তোরমানের প্রাসাদে তার সৈনিক সামন্তদেরও দেখলাম। এই সব সামন্তদের বাহুবলের জোরেই ঐ মানুষগুলি দাস-দাসীর রূপে এখানে এসেছে।

—ওদিকে তোরমান নিজ সামন্তদের সঙ্গে সেবকের বদলে নিজের ভাইয়ের মত ব্যবহার করছে।

—একেবারে সমান সমান ব্যবহার। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তেমন ব্যবহার করবে না। আমরা ওর কাছে দাসদের চেয়ে একটু উপরে হলেও সিংহাসন থেকে অনেক নিচেয়।

—রাজার রাজ্যে এটুকু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক।

—রাজ্য ত রাজারই হয়। তাছাড়া ছোট বড় হবার অন্য অনেক রাস্তাই আছে।

—কিন্তু তোরমানের রাজ্যে হেফতালদের জন্যে রাজার রাজ্য নয়। তবে আমার মনে হয় মিহিরকুলের সময় খানিকটা পরিবর্তন আসবে। বর্তমানে তোরমান ও হেফতালদের সম্বন্ধ বস্তুতঃ গণরাজ্য সম্বন্ধ।

—গণরাজ্যের সম্বন্ধে শুধু পুস্তকেই পড়েছি। লিচ্ছবীদের গণরাজ্যের কথা শুনেছি মাত্র।

—যৌধেয়দের গণরাজ সম্বন্ধে শোন নি?

—শুনেছি কিছু কিছু।

—এখনও একশ বৎসর পুরো হয়নি, সে সময় প্রবল যৌধেয় গণের ধ্বজা শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কত দেশী বিদেশী রাজাদের মুখে চুন-কালি দিয়েছে তারা। শকরা যৌধেয়দের কাছে হার মেনেছে। গুপ্ত চক্রবর্তী সমুদ্রগুপ্ত তাদের বিশেষ সম্মান করতেন। কিন্তু আজ সেই যৌধেয়গণের নাম পর্যন্ত তোমার মত বহুশ্রুত ব্যক্তিও শোনে নি।

—দক্ষিণের পল্লব রাষ্ট্রে আমার জন্ম। ভারতের অন্য সকল

জায়গায় ভ্রমণ করেছি কিন্তু যমুনার পশ্চিমে নামমাত্র গিয়েছি। যৌধেয়গণের বিষয় হয়ত তুমি অধিক জেনে থাকবে। আমি নিশ্চয় শুনব তাদের কথা। তুমি ত গুপ্তবংশের রাজকুমার ?

—না ! আমার নাম বীর যৌধেয়। যদিও যৌধেয় নাম এখন আর তেমন প্রচলিত নেই। গুপ্ত বংশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। বলতে পারো সেই ঘনিষ্ঠতাই যৌধেয়দের নাম শেষ করতে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করেছে। আমি গুপ্ত দৌহিত্র। যদিও আজ গুপ্ত বংশের সে প্রতাপ নেই, তবুও তাদের পুরনো যশ এখনও চলে আসছে। সেই জন্যে আমাকে যৌধেয়-এর স্থানে গুপ্ত বলতে তোরমান প্রসন্ন হন।

—তাহলে মিত্র ! তুমি তোরমানের দরবারে কেমন করে পৌঁছুলে ?

গুপ্তরাজ্যের কিছু অংশ তোরমান জয় করে নিয়েছে। তাছাড়াও ওরা মগধ পর্যন্ত আক্রমণ করে অত্যাচার করেছে অনেক। আমার নিবাস ছিল উত্তর পঞ্চাল (রুহেলখণ্ড)। যৌধেয়দের উৎখাত করবার পর সেইখানেই আমার ঠাকুর্দার জায়গীর পেয়েছিলাম। তোরমানের কাছে আমার কোনও প্রয়োজন ছিল না, তবুও কী এক মোহের টানে চলে এসেছি। যৌধেয় ভূমির প্রেমই আমাকে তোরমানের কাছে টেনে এনেছে। যৌধেয় ভূমির সবটুকু আজ তোরমানের হাতে।

—তাহলে তুমি, মানে আপনি মনে করেন যে তোরমান যৌধেয় ভূমিকে আবার যৌধেয়গণের হাতে ছেড়ে দেবে ?

—মিত্র, আমাকে তুমিই বলো। "আপনার" চেয়ে "তুমি" শব্দ অধিক প্রিয়। তাছাড়া আমাদের বয়সেও তেমন পার্থক্য নেই।

—তাহলে বীর ! তুমি কোন স্বপ্ন দেখেছ ?

—হ্যাঁ স্বপ্ন বলতে পারো।

—আমি অন্য কিছু ভেবে স্বপ্ন বলছি না। কোনও মহান কার্যের মানসিকপূর্ব কল্পনাকে আমি স্বপ্ন বলছি। আমিও এক স্বপ্ন দ্রষ্টাকে দেখেছি তার স্বপ্ন যদি সফল হয় তাহলে এই মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসবে, কিন্তু সে অন্য সময়ে।

—হ্যাঁ, আমি স্বপ্নই দেখেছি বলতে পারো। সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে তোরমানের কাছে এসেছি।

—তোরমান যৌধেয় ভূমিকে অত সহজ মুক্তি দেবে বলে মনে হয় না। যৌধেয় ভূমি তেমন দরিদ্র ভূমি ত নয়।

—দরিদ্র বলো না মিত্র! বসুন্ধরা বলো। সেখানকার গরু ঘড়া ভর্তি করে দুধ দেয়। শস্য-শ্যামল ভূমির জন্যে সেখানকার অন্য নাম হরিতাবলী (হরিয়ানা)।

—বুঝেছি। এমন সোনার দেশ তোরমানের কাছে দান পাওয়ার আশা করো না, তা আমি বুঝি। তুমি মনে করেছ, দেখি হুনদের কাছে বিজয়লাভের কোন মন্ত্র আছে দেখে আসি। তার চেয়েও অধিক আশা, যে সময় হুনদের সিংহাসন দুর্বল হয়ে পড়বে, সেই সুযোগে তুমি যৌধেয় ভূমির জয়ধ্বজা আবার খাড়া করে দেবে। আমি চাই না জোর করে তোমার মনের গোপন রহস্যকে তোমার মুখ দিয়ে শুনতে। তবে আজ আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম মিত্র বীর! যদি সে-সময় তোমার কাছাকাছি কোথাও আমি থাকি তাহলে নিশ্চয় আমি তোমার সেবায় তোমার পাশে থাকবো।

—আমি যৌধেয়দের মুখ দিয়েও এমন উৎসাহভরা শব্দ শুনিনি মিত্র। এখন আমার হৃদয় কতখানি আনন্দিত হয়েছে তার অনুমান তুমি করতে পারো। যদিও এখন এটা আমার স্বপ্ন। কারণ তোরমানের রাজত্বে এখনও কোথাও দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছি না। ভোগের জীবন যদিও সে পছন্দ করে, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ। যতখানি ভোগ করলে শাসক বা সৈনিক জীবনে ব্যাঘাত না হয় ততটুকুই ভোগ ওরা করে। মিহিরকুলের মধ্যেও তেমন ব্যসন দেখতে পাচ্ছি না।

যা অন্যান্য সকল পতনোন্মুখ রাজকুমারদের মধ্যে দেখা যায়। কিছুটা অবশ্য ক্রোধী স্বভাব আছে, কিন্তু তার জন্যে হুনবংশের হ্রাস হওয়ার কথা চিন্তা করা যায় না।

—রাজবংশ নিজের নির্বলতা এবং শত্রুর অধিক সবলতার জন্যে নষ্ট হয়ে থাকে। এই সময়ে এর বেশী ভবিষ্যদ্বাণী করবার অধিকার আমার নেই, শুধু বলতে পারি চিরকাল এক রকম যায় না। এখন যৌধেয়দের প্রশ্ন সামনে আসেনি। কে জানে কখন তোমার স্বপ্ন সামনে আসার অবসর পাবে। ততক্ষণ আমরা উভয়েই সেই মধুর স্বপ্ন দ্রষ্টার আগুনে পা দিয়ে থাকব।

—কে সেই ধন্য ব্যক্তি? তিনিও কি কোনও ধ্বস্ত গণরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চান?

—গণরাজ্যের চেয়েও বেশী তাঁর মধুর স্বপ্ন। তিনি মানব মাত্রে সাম্য স্থাপন করতে চান। শুধু বাচিক ক্ষেত্রেই নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে।

—ও, তুমি নিশ্চয় মজদক বামদাত পুত্রের কথা বলছ? কিন্তু লোক ত শুধু গাল দেবার জন্যেই তার নাম ব্যবহার করে। তুমি নিশ্চয় তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছ?

—নিশ্চয়। শুধু কাছ থেকেই দেখিনি, আমি নিজেকেও তার মধুর স্বপ্নের ভাগীদার মনে করি। গালির পাত্র তিনি নন। তেমন মহান পুরুষ আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।

সূর্যাস্ত হয়েছে। সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নেমে আসছে। দুইজন নিজেদের আলোচনা এই পর্যন্ত শেষ করে উঠে দাঁড়ায় ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে। এখন এরা দুই মিত্র দুজনেরই খুব কাছাকাছি হয়েছে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

॥ শ্বেতা ॥

হেমন্তের মধ্যভাগ। খালের জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। কখনও কখনও কয়েকদিন পর্যন্ত জমির উপর সাদা বরফ ঢেকে থাকে।

মিত্রবর্মা এখন কবাতের প্রাসাদে থাকে না। যদিও প্রতি দুদিন ছাড়া কবাতের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতেই হয়। কবাতও এখন একলা নেই। সিয়াবখ্‌শ এসে গেছে, সেই থাকে কবাতের কাছে। মিত্রবর্মা নগরের বাইরে একটা উদ্যান ভবন নিজের জন্যে পছন্দ করে বেছে নিয়েছে। হিমঋতুর জন্যে এতদিন বাগান শুকনো কাঠের জঙ্গলের মত মনে হত। বীর যৌধেয়র পরামর্শ মতই মিত্রবর্মা এই বাড়ীটি পছন্দ করেছে। বীর যৌধেয় এরই পাশে আগে থেকেই বাস করছিল। এখন দুই বন্ধু দিনের বেশীর ভাগ সময় একত্রে বসে আলাপ-আলোচনা করবার প্রচুর অবসর পেয়েছে। মিত্রবর্মা কখনও মজদক-এর মধুর স্বপ্নের কথা আলোচনা করত, কখনও বা বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বর্ণনা করত। মিত্রবর্মা নিজেও স্বপ্নদর্শী ছিল, বীর যৌধেয়ও তাই। মিত্রবর্মা প্রয়োজনহীন মনে করে তোরমানের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে চায়নি। কিন্তু বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ না করলেও রাজা তোরমান নিয়মিতভাবে ওর সংবাদাদি নিয়ে থাকেন। নিজের বিশেষ স্নেহ স্বরূপ তোরমান একজন অপূর্ব সুন্দরী বিদেশী দাসীকে মিত্রবর্মার সেবার জন্যে নিযুক্ত করে দিয়েছেন।

এই তরুণী কোন্ দেশীয় তা জানতে মিত্রবর্মাকে গলদঘর্ম হতে হয়েছে। তরুণীর নাম সকলা (সক্লাব) যদিও শক শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধিত, কিন্তু মিত্রবর্মা যে শকজাতির সঙ্গে পরিচিত এ তরুণী

তাদের কিছুই জানে না। তরুণীকে প্রথম দিন দেখেই মিত্রবর্মা তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। চমৎকার স্বাস্থ্যসম্পন্ন লতায়িত তনু। প্রথমে পিছন থেকে তাকে দেখে মিত্রবর্মার মনে হয়েছিল যে ও শ্বেত কেশা বৃদ্ধা। বৃদ্ধাদের মতই তার কেশ শ্বেতবর্ণ কিন্তু অধিক উজ্জ্বল। চোখ দুটি যেন একজোড়া নীলপদ্ম, আরক্ত শঙ্খবর্ণ দেহের রং। প্রথমে তরুণী অত্যন্ত কুণ্ঠিতা হয়ে থাকত, বিনা প্রয়োজনে একটি কথাও বলত না। প্রভুর চোখ পড়তে ও প্রসন্নবদনা হতে চেষ্টা করত কিন্তু কতখানি সফল হত তা মিত্রবর্মা বুঝতে পারত। মিত্রবর্মা বুঝতে পারে এও যুদ্ধ অথবা দাসত্ব জর্জরিতা মানবী। ও ভাবত তরুণী বোধহয় ভিন্ন দেশ থেকে নতুন এসেছে, হয়ত এখানকার ভাষার সঙ্গে এখনও পরিচয় লাভ করতে পারেনি, তাই বুঝি ও এমনি চুপ করে থাকে। কিন্তু ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় না থাকলেও তরুণীর স্থানীয় ভাষাজ্ঞানকে একেবারে তুচ্ছ করাও যায় না। মিত্রবর্মা নিজের অন্যান্য পরিচারকদের মত এই তরুণীর সঙ্গেও খুব সহৃদয়পূর্ণ ব্যবহার করত। মিত্রবর্মা দাসপ্রথাকে খুব ঘৃণা করত বলে নিজের দাসদাসীদের সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহার করত।

কিছুদিনের মধ্যেই শ্বেতার সকল সঙ্কোচ দূর হয়ে যায়। প্রথম কয়েক মাস কোনও প্রশ্ন করত না, শুধু জবাব দিত, তারপর নিজেও মিত্রবর্মাকে প্রশ্ন করতে লাগল। শীতের সময় মিত্রবর্মার হাতে অনেক সময় থাকত। বিশেষ করে যখন বরফ পড়ত তখন বাইরে যাবার ইচ্ছা প্রায় কারোরই হয় না। নগর ও তার পাশাপাশি প্রায় সকল জায়গা মিত্রবর্মার দেখা হয়ে গেছে।

তোরমান ইতিমধ্যে একটি নতুন দরবার-কক্ষ তৈরী করেছে। একদিন বীর আর মিত্র দুজনে গিয়ে দেখেও এসেছে। তোরমান ভারতীয় চিত্রকলার উপর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। হেফতাল জাতি কুষান জাতিকে নিজেদের উত্তরাধিকারীই ভাবত না শুধু, তাদের রক্ত-সম্বন্ধীও ভাবত। ভারতীয় কলার প্রতি কুষানদের খুব

আগ্রহ ছিল বলেই বোধ হয় হেফতাল রাজাও ভারতীয় কলায় প্রভাবিত হয়েছেন।

সেদিন বাইরে বরফ পড়ছে। বড় বড় তুষারকণা হাওয়ায় উড়ে উড়ে আসছে মাটির উপর। ক্রমশঃ জমা হচ্ছে এখানে ওখানে। ঘরের এককোণে একটি স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে শ্বেতকেশা সেই দৃশ্য দেখছিল। মিত্রবর্মাও ওর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তুষারপাত দেখতে থাকে। তরুণীকে বিশেষ ধ্যানপূর্বক দেখতে দেখে মিত্রবর্মা প্রশ্ন করে,—শ্বেতা! এই হিমপাত তোমার খুব ভাল লাগে বুঝি?

—হ্যাঁ। ঐ বড় বড় তুষারের পাপড়িগুলি যখন বাতাসের বুকে সাঁতার কাটতে কাটতে মাটির বুকে নেমে আসে, তখন আমার খুব আনন্দ হয়। আমাদের দেশেও খুব বরফ পড়ে। জমাট বরফের উপর তরুণ-তরুণীরা মিলে পায়ে লম্বা লম্বা পাদত্রাণ লাগিয়ে দুখানা লাঠির সাহায্যে আমরা কত খেলতাম। খেলতে খেলতে আমাদের পোষাকের উপর হিম পড়ে জমে গিয়ে একেবারে সাদা মানুষ হয়ে যেতাম। এই খেলাকে আমরা খুব আনন্দের খেলা বলে উপভোগ করি। মিত্রবর্মা তরুণীর বিকশিত চেহারার উপর দৃষ্টি রেখে বলে,—

—আজ তোমার সেই দৃশ্য মনে পড়ছে বুঝি? তুমিও বরফের উপর খেলতে? তোমারও ঐ শ্বেতবর্ণ কেশ সাদা বরফে ঢেকে যেত?

—হ্যাঁ, সেই কথাই আজ আমার মনে পড়ছে, যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

—আর মনে নিশ্চয়ই দুঃখ অনুভব করছো, তোমার দেশে এই সময় তোমার অন্যান্য সমবয়স্ক তরুণ-তরুণীরা মনের আনন্দে খেলছে, আর তুমি কোথায় কতদূরে অপরিচিত দেশে দাসত্বের একান্ততা ভোগ করছো। মিত্রবর্মার কথায় শ্বেতার চোখ জলে ভরে আসে। অশ্রুজল লুকোতে শ্বেতা মাথা নিচু করে, কিন্তু মিত্রবর্মার চোখ

এড়ায় না ওর দু'চোখের কোণ দিয়ে দুটি মুক্তাফল টুপ টুপ করে যেন মাটির উপর ঝরে পড়ে। মিত্রবর্মা অনুনয়ের সুরে বললো,—ক্ষমা করো শ্বেতা। আমি ইচ্ছা করে তোমার মনে কষ্ট দিইনি। এই পরিবেশই আমাকে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত করেছিল।

—ক্ষমার কথা কেন বলছেন, স্বামী। আমি এমনিও একলা বসে কাঁদি। এখানে ত আপনার সমবেদনা আমার সেই খেদকে হাল্কা করতে সহায়ক হয়েছে। নিজের মাতৃভূমি এবং স্বজন ঘরে থাকতেই কত প্রিয় মনে হয়, দূরদেশে আরও যে কত প্রিয় মনে হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

—তোমার দেশ নিশ্চয় অনেকদূর ? কোনদিকে, কতদূর ?

—এখান থেকে পশ্চিমে আমার দেশ এইটুকু বলতে পারি, কতদূর তা বলতে পারবো না, কারণ আমার জন্মভূমি থেকে সোজা এখানে আসিনি।

—তবে কেমন করে এলে ?

—সে ভয়ানক ক্রূরতা, বড়ই খেদপূর্ণ। বলতে গিয়ে শ্বেতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। মিত্রবর্মা শ্বেতার চীনাংশুকের মত মসৃণ চুলের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো,—তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। এতদূর থেকে তোমাকে নিশ্চয়···, শ্বেতা মাথায় বাঁধা বস্ত্রখণ্ডের কোণ দিয়ে চোখ মুছে বললো,—

—হ্যাঁ, আজ থেকে ছয় বৎসর আগে অঁবার দস্যু আমাকে ধরে নিয়ে এসেছিল, চীন সীমান্ত থেকে শুরু করে আমাদের দেশের সীমান্ত পর্যন্ত অঁবারদের বিশাল রাজ্য বিস্তৃত। অঁবার সেনা তখন আমার দেশকে আক্রমণ করেছিল। আমার পিতা ছিলেন নিজেদের জনের সর্দার। তার নেতৃত্বে শুধু পুরুষই নয়, নারীরাও প্রাণপণে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেছে। কিন্তু অঁবার সেনা পতঙ্গের মত ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের দুর্গের পতন হয়। অনেক পুরুষ বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছিল, অনেক নারী প্রাণ হারিয়েছে

সেই যুদ্ধে। অঁবার দল আমাদের নগর লুঠ করেছে, অল্পবয়স্কা সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবতী তরুণীদের যত পেয়েছে সব বন্দী করে এনেছে। সেই অভাগিনীদের মধ্যে আমিও একজন। তারপর তারা অঁবার-খাকানের কাছে আমাকে ভেট পাঠিয়ে ছিল। সেখানে মহারানীর পরিচারিকা ছিলাম চার বৎসর। দাসীর প্রতি যেমন ব্যবহার করা হয় আমিও তেমনই ব্যবহার পেয়েছি। তারপর হেফতাল রাজাকে ভেট পাঠানো হল আমাকে। দুই বৎসর যাবত এখানে আছি। এখন আমার সৌভাগ্যের গুণে রাজা আপনার চরণে অর্পণ করেছেন। আপনার স্বভাব আমি দেখেছি। অন্যান্য পরিচারিকাদের প্রতি আপনার যেমন অকৃত্রিম সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার, আমাকে তাদের চেয়েও বেশী অনুগ্রহ করেছেন।

—তাহলে তোমার বাড়ীতে আর কেউ নেই ?

—পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন। আত্মসম্মান রক্ষা করতে মা আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। আমার তখন ১২।১৩ বৎসর বয়স। অতখানি বুঝতে বা এগুতে পারিনি। তখন যদি বুঝতে পারতাম এবং এই তুচ্ছ দেহটাকে আগুনের হাতে সঁপে দিতে পারতাম, তাহলে গত ছয় বৎসর যাবত এই দুঃসহ জ্বালা ভোগ করতে হত না। আমার জন্ম নগরে এখন কে কে আছে তা আমি জানি না। যারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল তারাও বা কোনদিকে গেছে তাও বলতে পারি না। হয়ত জীবনে তাদের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হবে না। সেই সব স্মৃতি যখন মনে পড়ে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সব দৃশ্য, তখন বুক ফেটে যায়, চোখের জলকে বাধা দেবার ক্ষমতা থাকে না।

—অঁবারদের রাজত্ব খুব বড়, নয় ?

—খুব বড়। এপার থেকে ওপার যেতে পাঁচ ছয়মাস লাগে।

—পৃথিবী বিশাল, শ্বেতা ! তোমার দেশেরও পশ্চিমে আরও কত দেশ আছে, তার পরেও বহু দূর পৃথিবীর সীমা। যে পরিস্থিতির মধ্যে তুমি রয়েছ, তাতে তোমার কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

—হ্যাঁ, যদিও বিশেষভাবে আমাকে কেউ কষ্ট দেয়নি। যখন জ্বলন্ত জন্ম-নগরী থেকে আমাকে বন্দী করে নিয়ে আসছিল, তখন আমার কান্না থামাতে না পেরে একজন সৈনিক কয়েকটা চড় মেরেছিল। কান্না অবশ্য থেমেছিল কিন্তু ফোঁপানি কম হয়নি। তাছাড়া আপনি ত জানেন দাস নিজের শরীরেরও প্রভু নয়। অঁবারদের মত জংলী জাতি আর আছে কিনা জানি না। হেফতাল জাতি রঙে-রূপে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মত। শত্রু অথবা অপরিচিতের প্রতি তারা রুক্ষ ব্যবহার করে বটে, কিন্তু একবার পরিচয় হলে এদের ব্যবহার অতি সুন্দর হয়ে থাকে। অঁবার জাতি অনাবশ্যক ক্রূর। কিন্তু হেফতালরা জেনে-শুনে ইচ্ছে করে ঘুমন্ত জীবন যাপন করে থাকে। রাজা অমন সুন্দর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ইচ্ছে করেই সময় সময় তাঁবুতে বাস করে থাকেন।

—অঁবার জাতিও ত হুন ?

—হ্যাঁ, হুনদের ক্রূরতা দিগন্ত বিখ্যাত। অঁবারদের কোনও স্থায়ী প্রাসাদ নেই। হেফতালরা ঘোড়াকে যেমন ভালোবাসে, আমাদের জনও ঘোড়া ও মানুষকে ভালোবেসে থাকে, অঁবাররাও ঘোড়াকে তাদের জীবনসাথী মনে করে। এই একটি ক্ষেত্রেই আমাদের মিল দেখা যায়। অঁবারদের অন্তঃপুরে শিষ্টাচার নেই একথা আমি বলতে চাই না। তাদের অন্তঃপুরে সভ্যদেশেরও অনেক কুমারী থাকে। হেফতাল অঁবারদের যত বর্বর বলেই মনে করুক না কেন তাদের শক্তিকে অস্বীকার করতে পারবে না। অঁবার-খাকান সমগ্র চীনকে ত নিজের অধীন মনে করে। হেফতালদেরও সেই দৃষ্টিতে দেখে। তাদের কাছে সৌন্দর্যের মাপকাঠিও অন্যরকম।

—শ্বেতা ! তুমি এই দেশে এবং আমাদের দেশে সুন্দরী বলেই খ্যাতি পাবে, কিন্তু অঁবাররা কি তোমাকেও সুন্দরী বলে মনে করে না ?

—তাদের বিচারে সুন্দরী নারী তাকে বলা হয়, যার চোখ

অর্ধমুকুলিত এবং দুইদিকের কোণ উপরের দিকে বাঁকা হয়ে উঠে গেছে। আপনি এখানেও হুন বংশের নারীকে দেখেছেন।

—অর্থাৎ নাক ছোট এবং চেপ্টা। মুখ আকারের চেয়েও বড়, গালের হাড় উঁচু এবং উপর দিকে ওঠা ইত্যাদি?

—হ্যাঁ, এদেরই তারা সুন্দরী বলে। আমাকে অবশ্য কুরূপা বলে এখানে পাঠায়নি, নিজের শ্বশুরকে বিদেশী ভেট হিসেবে পাঠিয়েছে। আমি জানি যে, এখন আমি আর পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী উভয়ই সমান পরাধীন। শুধু ছটফট করলে কোনও লাভ নেই, তবুও বিগত স্মৃতিকে ভুলতে পারি না, মনে পড়লে মনটা আনচান করে উঠবেই।

শ্বেতার চেহারা এখনও বেদনা-মলিন। মিত্রবর্মা ওর প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হতে চায়, কিন্তু ওর সকল বেদনা দূর করা তার পক্ষে অসম্ভব। ওর এ বেদনায় কোনও সান্ত্বনাই শান্তির প্রলেপ দিতে পারে না মিত্রবর্মা তা জানে।

* * * * *

কবাত শুধু তোরমানের শ্যালকই নয়, কবাতের পিতার গচ্ছিত ধনও বটে। বাল্যাবস্থায় কবাত যখন তোরমানের দরবারে ছিল তখন তোরমান নিজ পুত্র মিহিরকুলের সমান স্নেহ করতেন ওকে। এখন কবাত যদিও ইরানের শাহনশাহ হয়েছে, তবুও তোরমানের কাছে এই কয়েকমাস থাকবার পর আবার পুরোনো ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেছে। তোরমান কখনও কবাতকে ছাড়া ভোজন করেন না। বয়সে পুত্র সমান বলে তোরমান তাকে সমকক্ষ রাজার মত মানতে রাজী নন। কবাতও কখনও পুত্রের মত, আবার কখনও ধৃষ্ট মিত্রের মত ব্যবহার করে রাজার সঙ্গে। কবাতের জন্যে সকল প্রকার রাজোচিত সুখ এখানে সুলভ ছিল। অতএব শুধু তোরমানের জীবনভর নয়, যুবরাজ মিহিরকুলের সঙ্গেও অত্যধিক মিত্রতা থাকার জন্যে আজীবন রাজসুখেই এখানে থাকতে পারতো। কিন্তু কবাত সাসানী

সিংহাসনকে ভুলতে পারে না। কবাত যদিও ভুলতে পারতো, কিন্তু তাকে প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে সিয়াবখ্‌শ সর্বদাই পাশে পাশে রয়েছে। নিজ ভগ্নীপতির কাছে কবাতের শুধু এই প্রার্থনা যে, তাকে সাসানী সিংহাসন ফিরে পেতে সৈনিক সহায়তা করুক।

তোরমান সবই বোঝেন, তাই এত শীঘ্র কোন নিশ্চয় করতে পারেন না। সাসানী শক্তি তার পরিচিত। তারপর অঁবারদেরও ভয় রয়েছে। তারা যদি ঘুণাক্ষরেও হেফতালদের নির্বলতার সংবাদ পায় তাহলে অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া ভারতবর্ষে গুপ্তরাজ্য এখনও একেবারে দুর্বল হয়নি। এই সকল দিক চিন্তা করে তোরমান এই-মুহূর্তে পাকা কথা দিতে পারেন না। টাল বাহানা করে কিছু সময় কাটিয়ে দিতে চান শুধু। সেই সঙ্গে কবাতকেও সন্তুষ্ট রাখতে চান। সেই জন্যে তিনি একদিন নিজ কন্যা অর্থাৎ পীরোজতুখ্‌ত মহারানীর কন্যাকে কবাতের সঙ্গে বিবাহ দেবার প্রস্তাব করলেন। রাজার শ্যালক হওয়ার চেয়ে জামাই হওয়া অধিক ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ। কবাত নিজ সহোদরার কন্যার প্রতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ ছিল। মিত্রবর্মা ও সিয়াবখ্‌শ-এর যথেষ্ট আগ্রহ ছিলই, আর সহোদরা মহারানী ত তাহলে হাতে স্বর্গ পান।

এমনি একদিন শুভক্ষণে ভাগিনেয়ীর পাণিগ্রহণ করে কবাত তার পত্নী সংখ্যা আর একজন বৃদ্ধি করে।

শীত শেষ হয়ে গেছে। বরফ গলে জল হয়ে গেছে। শুকনো মরুভূমিও একবার সিক্ত হয়, তবে তার পিপাসা মেটে না। রাজধানী বরখ্‌শার সকল উদ্যান আবার মুকুলিত হয়ে ওঠে। শুকনো জঙ্গল আবার সবুজ বরন ধারণ করে। গাছে গাছে লাগে ফুলের মেলা। প্রকৃতি উল্লসিত হয়ে ওঠে। চারিদিকে বসন্তের সুষমা।

কবাত, সিয়াবখ্‌শ ও মিত্রবর্মা বসন্তের আনন্দময় দিনগুলি যেমন একটি একটি করে ভোগ করে, তেমনি একটি একটি করে দিন গুণতে থাকে কত মাস হল এখানে তারা এমনি সুখ ভোগ করছে।

ইরান থেকে গুপ্ত সংবাদ নিয়মিত আসতে থাকে। কবাত তোরমানের কাছে শুধু তম্পোনের সিংহাসন ফিরে পাওয়ার আব্দার করলেও সে জানে যে তম্পোনে কনারঙ্গ গজ্ঞন্স্পদাত-এর মত শক্তিশালী শত্রু সিংহাসনের সবচেয়ে দৃঢ় স্তম্ভ। তার সঙ্গে যুদ্ধ করাও নেহাত সাধারণ কথা নয়। অতএব তোরমানের ইচ্ছার দিকে তাকিয়ে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা ভিন্ন গত্যন্তরই বা কি।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

।। অভিযান-খৃঃ ৪৯৯ ।।

ক্রমশঃ কবাত অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কবাতের অসহিষ্ণুতা তোরমানের বিশেষ পছন্দ হয় না। কিন্তু তিনিও মনে মনে চান তাঁর জামাতা যত শীঘ্র সম্ভব তার ন্যায্য প্রাপ্য সাসানী সিংহাসন ফিরে পাক। তার জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, প্রস্তুতির জন্যে সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। কবাত কখনও কখনও পানগোষ্ঠীতে বসে তোরমানের কাছে একবার কথা উত্থাপন করেই চুপ করে যায়। পাশে বসে মিত্রবর্মাকে বাধ্য হয়েই তার সম্মতি দিয়ে চুপ করতে হয়। এ ছাড়া মিত্রবর্মার আর কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। তবে তোরমান-রাজধানীতে তস্পোন ফিরে পাওয়ার সবচেয়ে বেশী চিন্তা ছিল সিয়াবখ্‌শ-এর। সম্বিক সত্যি কথাই বলেছিল। সিয়াবখ্‌শ তার বয়স অনুপাতে অধিক চতুর। সৈনিক বিদ্যা এবং অস্ত্র-শস্ত্র চালাতে সে যেমন নিপুণ, তেমনি রাজনীতিতেও তার ততখানি অধিকার ছিল। তোরমান নিজেও সিয়াবখ্‌শ-এর আলোচনা, বর্ণনা ও মতামত খুব মন দিয়ে শুনতেন। সিয়াবখ্‌শ আজ যদিও তস্পোন থেকে বহুদূরে বসে আছে তবুও ইরানের প্রতি ইঞ্চি ভূমির সকল প্রকার খবর সিয়াবখ্‌শ যত বিস্তারিতভাবে জ্ঞাত, ততখানি তস্পোনের সিংহাসনের পাশে থেকে ইরান মহামন্ত্রীও জ্ঞাত নন। ধর্মের নামে ষড়যন্ত্র করে ইরানের বিরোধী দল কবাতকে সিংহাসনচ্যুত করতে সমর্থ হয়েছে বটে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তারাই স্বচক্ষে দেখেছে কবাতকে কেমন করে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন ত সমগ্র ইরানে লুটপাটের রাজত্ব চলছে। মন্ত্রী ও সেনাপতি থেকে আরম্ভ করে সাধারণ গ্রাম্য-সর্দার পর্যন্ত সকলেই জনসাধারণকে

শোষণ করছে। আবার শুরু হয়েছে দরিদ্রের উপর ধনীর অত্যাচার, আজ তাদের পাশে কেউ নেই। প্রত্যেক গ্রাম, নগর অন্ধকার। এই সকল সমাচার সিয়াবখ্‌শ-এর কাছে এসে পৌঁছুচ্ছে প্রতিদিন। সকলেই আজ কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে, কতক্ষণে জামাস্প-এর রাজত্ব ধ্বংস হবে।

ইরানের ভিতর ও বাইরের অবস্থা বিবেচনা করে সিয়াবখ্‌শ পরামর্শ দেয়, এই হল আক্রমণের উপযুক্ত সময়।

সেদিনের পানগোষ্ঠীতে কবাত অভিমান-ভরা সুরে তোরমানকে বললো,—আপনি আমার জন্যে কোনও চিন্তা করছেন না, কিন্তু আমি এমনি বসে বসে কতদিন আর রুটি ধ্বংস করব? আপনি যদি জামাস্প-এর সেনাদের ভয় পান, তাহলে আমাকে স্পষ্ট বলে দিন।

—কবাত! তুমি হয়তো মনে করছো যে আমি তোমাকে স্নেহ করি না। আমি সময়ের প্রতীক্ষা করছিলাম শুধু তোমারই মঙ্গলের জন্যে। তুমি মনে করো না যে আমি নিশ্চিন্তে বসে আছি। ইতিমধ্যে আমার সহস্র অনুচর শুধু ইরানেই নয়, হুন ও রোমকদের মধ্যেও ঘুরে ঘুরে সংবাদ আদান-প্রদান করছে।

—সে ত দুই বৎসর যাবত হচ্ছেই। ইতিমধ্যে আমাদের অনুগামীরা ক্রমশঃ হতাশ ও দুর্বল হয়ে পড়ছে। এরপর হয়ত তারা আমাকে ভুলে যাবে।

—তুমি ভুল করছো কবাত! আমি বিনা কারণে এতগুলি লোক, অর্থ আর সময়ের অপব্যবহার করিনি। আজ তুমি শুনে খুশী হবে যে, আমি ঠিক যে পরিস্থিতির জন্যে প্রতীক্ষা করছিলাম, সে সময় এসে গেছে। এই সময়ে ইরানের প্রায় সকল সেনা উত্তর পশ্চিম সীমান্তে গিয়ে সীমান্ত রক্ষায় ব্যস্ত রয়েছে। তারা ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। চারদিকের সীমান্ত এখন আক্রমণের আশঙ্কা করছে।

—তাহলে এ সংবাদও নিশ্চয় রাখেন, ইরানের মধ্যে যদিও গজনম্পদাত-এর সামনে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করবে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে বৈমনস্যতা চরমে উঠেছে। তাছাড়া তার প্রভাব বা শক্তি আগের মত এখন প্রবল নেই।

—তোমাকে বেশী বোঝাতে হবে না আশা করি। তোমার বলবার আগে থেকেই আমি প্রস্তুতি শুরু করেছি। রাজধানীতে অধিক সেনার সমাবেশ শত্রুকে নিমন্ত্রণ দেওয়ার মতই হবে। এখানেও ইরানের চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেনার সংখ্যা কত হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমি নিজেও ভেবেছি, এবং মিত্র সিয়াবখ্‌শ-এর কাছেও পরামর্শ নিয়েছি। আমি শুধু তোমাকে এইটুকু জানাতে চাই যে, সিয়াবখ্‌শ-রূপে তুমি একজন আশাতীত চতুর, কুশলী, রাজনীতিক, বিশ্বাসী ও রণনিপুণ সেনানায়ক পেয়েছ। ওর গুণের প্রশংসা করে আমি ওকে ছোট করতে চাই না। ওর প্রতি লোমকূপে সকল প্রকার বিদ্যা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ভর্তি রয়েছে। আমি আশা করি তুমি ওর যোগ্য মূল্য বুঝতে পারবে।

সিয়াবখ্‌শ-এর উপর কবাতের গর্ব ছিল। অতঃপর শ্বশুরের মুখ থেকে তার প্রশংসা শুনে আরও খুশী হয় তার।

শীতের শেষ দিকে প্রায় সময় কবাত উদাস হয়ে থাকতো। কিন্তু আজ তোরমানের মুখে সকল কথা শুনে তার আনন্দ ধরে না যেন। এতদিন পর আজ কবাতের মুখে হাসি ফোটে। কবাতের স্ত্রী ও বোন দীর্ঘ দু'বৎসর নানাপ্রকার চেষ্টা করেছে ওর মুখে হাসি দেখবার জন্যে, মদিরার নেশায় কখনও হয়ত একটু দেখানো হাসি হেসেছে, তা ছাড়া কেউ ওর প্রসন্ন মুখ দেখতে পায়নি। আজ কবাত তার শয়নকক্ষে গিয়ে তোরমান-দুহিতাকে বার বার অতৃপ্ত চুম্বন করতে থাকে। আজ তার চেহারায় মদিরার লালিমা নেই। সারা দেহ-মন অত্যন্ত প্রফুল্ল। রাজকন্যা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে,—

—দয়িত! তোমার আনন্দ দেখে আজ আমার জীবনের সব

চেয়ে আনন্দের দিন মনে হচ্ছে। যদি আপত্তি না থাকে এবং অত্যন্ত গোপন রহস্য না হয় তাহলে আমাকে বলো, আজ এতখানি প্রসন্নতার কারণ কি? কবাত আবার প্রেয়সীর মুখ-চুম্বন করে বলে, —রহস্যের কথা নিশ্চয়। কিন্তু তোমার কাছে লুকোবার প্রয়োজন নেই। তোমার পিতা আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এবার আমাদের ইরানের রাজধানীর দিকে চলতে হবে।

—প্রিয়তম! তস্পোন দেখবার জন্যে আমিও উন্মুখ হয়ে রয়েছি। আমার ভাষা নেই আজ যে তোমাকে বোঝাব আমি কতখানি খুশী হয়েছি। বলতে বলতে রাজকুমারী তার রেশমের মত কোমল অথচ তপ্ত-কাঞ্চন-তন্তুর মত উজ্জ্বল কেশরাশি আলগা করে কবাতের বুকের মাঝে যেন নিজেকে বিলীন করে দেয়।

* * *

বসন্তের প্রথম স্পর্শ লেগেছে মাটির বুকে। উদ্যানের গাছে গাছে এখনও নতুন পাতা দেখা দেয়নি, এখনও ফুলের ঘুম সম্পূর্ণ ভাঙেনি। শীত কমে গেছে অনেকটা। এই সময়ে একদিন তোরমানের সীমান্তে ডান-দিকের সেনাদল নদী পার হয়ে যাত্রা করে। তোরমান রাজ্যের সীমান্তে এসময় কনারঙ্গ গজন্স্পদাত উপস্থিত নেই। যদিও গজন্স্পদাত জানে যে তার শিকার কবাত এই দিকেই হুনরাজ্যে বাস করছে, যদিও সে জানে যে তোরমানের কন্যাকে বিবাহ করে সে সেখানে আরামে দিন কাটাতে যায়নি। সে আরও ভাল জানে যে তোরমানের মত ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী ইরানের আর কেউ নেই। তবুও পশ্চিম ও উত্তরের শত্রুদের অবহেলা করা যায় না।

গজন্স্পদাত শুধু অবহরশহর (খুরাসান)-এর কনারঙ্গ নয়। সমগ্র ইরান রাজ্যের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব তার হাতে। বর্তমান শাসক-জনমণ্ডলী এই গজন্স্পদাতের হাতের খেলার পুতুল মাত্র। ইতিমধ্যে গজন্স্পদাত তোরমানের ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী গুপ্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে গুপ্ত-সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। তাছাড়া উত্তরের শত্রু অঁবারদের

মধ্যে নানাপ্রকার গুপ্ত সম্বন্ধ স্থাপন করে তাদের সন্ত্রস্ত করে তুলতে চেষ্টা করছে। এই দুই দিক থেকে গজনম্পদাতের কাছে যে সংবাদ এসে পৌঁছেছে, তাতে তার আবশ্যকতার অধিক খুশী হয়।

তোরমান কবাতের সহায়তার জন্যে ত্রিশ হাজার সেনা দিতে স্বীকৃত হন। এই সেনা ইরান জয় করে দুই বৎসর পর্যন্ত সেখানে থেকে শান্তি স্থাপন করে তারপর দেশে ফিরবে। তাছাড়া প্রয়োজন হলে তোরমান নিজের বিপুল শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে সাহায্য করবার জন্যে স্বয়ং প্রস্তুত রইলেন। পরামর্শ হল, পূর্ব ও উত্তরের দুই দিক থেকে কনারঙ্গকে আক্রমণ করা হবে। পুব দিক থেকে আক্রমণের কেন্দ্র হবে বাহ্লিক (বলখ) এবং উত্তর দিকের মর্ব! সিয়াবখ্‌শ কেবল তোরমানের সেনার উপর ভরসা করে বসে ছিল না। সে নিজেদের বিশ্বাসী অনুগামীদের ইরানের মধ্যে এবং বাইরে প্রতি নগরীতে নগরীতে নানাপ্রকারে সবল ও সজাগ হয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। অন্দর্জগর-এর অনুগামী সকলে গোপনে গোপনে প্রস্তুত হয়েই আছে। শুধু আদেশের অপেক্ষা।

এদিকে শাসকবর্গ এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রজাদের পীড়ন করেছে যে প্রত্যেক গ্রামবাসী পর্যন্ত মনে মনে বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখছে। তারপর রাজ্যে প্রচার হয়ে গেল কবাত বিজয়ী হুন-সেনার সঙ্গে তস্পোনে ফিরে আসছে।

কবাতের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর শত্রু গজনম্পদাত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। কবাতের সুবিধা ছিল এই যে গজনম্পদাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তোরমান যত বেশী সেনা সহায়তা করতে পারে রোমকরা ততখানি পারে না। রোমকদের স্বদেশ থেকে সেনা নিয়ে সীমান্তে পৌঁছতে অনেক সময় দরকার। এখানে তোরমান স্বয়ং পিছনে পিছনে আসছেন তার দুর্জয় বাহিনী নিয়ে।

প্রথম আঘাতেই ফলাফল নির্ধারিত হল না। আক্রমণের পর আক্রমণ হতে থাকল। তোরমানের চিন্তার কারণ নেই। তার

সুদক্ষ সেনাদলে বেশীর ভাগ হেফতালী বীর, যারা দ্রুতগতি অশ্বের উপর বসে তীর চালাতে অদ্বিতীয়। এই ঘুমন্তরা একবার আদেশ পেলেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করবে, তাছাড়া উত্তর ভারতের অর্ধেক ভাগের শাসনকর্তা তোরমান সে জন্যে ভারতীয় হস্তী সেনা রয়েছে তার প্রচুর। যুবরাজ মিহিরকুল স্বয়ং সেনা সঞ্চালনের ভার গ্রহণ করেছে। প্রথম আক্রমণের সময় যুবরাজকে নিজে অস্ত্র ধরতে হয়েছে বাল্যমিত্র কবাতকে সহায়তা করতে। বীর যৌধেয়কে অন্য কেউ না বললেও সে মিত্রবর্মার উদাহরণ দেখে, তার মত মধুর স্বপ্নকে সার্থক করতে, এক হাজার যৌধেয় সেনা নিয়ে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে।

বাহ্লিক দেশের গুপ্তচরের কাছে কনারঙ্গ গজন্স্পদাত আগেই সংবাদ পেয়েছে যে হুন-সেনা প্রস্তুত হচ্ছে। পুবদিকের সৈন্য প্রস্তুতির সংবাদ খোলাখুলিভাবে সকলেই জানতো। কারণ এই দিকে বাণিজ্যপথ দ্বারা সকল সংবাদই সকল জায়গায় পৌঁছনো খুবই স্বাভাবিক। গজন্স্পদাত মনে করেছিল আক্রমণ বাহ্লিক দেশের দিক থেকেই হবে। যদিও এদিকের রাস্তা পাহাড়ী কিন্তু পশু ও মানুষের খাবার ও জলের কষ্ট তেমন নেই। উত্তর দিকে দুটো বড় বড় মরুভূমি পার হয়ে নিশ্চয় আক্রমণ করা অসম্ভব হবে। কিন্তু তার চিন্তার ফল হল ঠিক উল্টো। সংখ্যায় যদিও দুই দিকের সেনাদল প্রায় সমান সমান। কিন্তু সবচেয়ে দুর্ধর্ষ সেনা আক্রমণ করল উত্তর দিক থেকেই।

সীমান্তের কাছে সেনাদল উপস্থিত হলে কবাত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললো,—আজ সবচেয়ে আগে যে থাকবে, যার সহায়তা সব-চেয়ে বেশী পাবো। তাকে আমি অবহর শহরের কনারঙ্গ-এর পদ দিতে স্বীকৃত হলাম। যদিও কবাতের এই রকম প্রতিশ্রুতি ইরানের নিয়ম-বিরুদ্ধ। ইরান রাজ্যে সকল রাজকীয় পদ কেবলমাত্র সামন্ত বংশধরদের জন্মগত অধিকার। কনারঙ্গ-এর পদ একমাত্র

গজন্‌স্পদাতের বংশধর কেউ পাবার অধিকারী, অন্য কেউ নয়। সংযোগ বশতঃ এই যুদ্ধে আতুর-গুন্দপত নামে এক বীর সবচেয়ে অধিক বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, যে গজন্‌স্পদাতেরই এক বংশধর।

গজন্‌স্পদাত যখন জানতে পারলো যে উত্তর দিক থেকেই সবচেয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ হবে। তখন সেই দিকেই যাত্রা করলো সে। এই যুদ্ধে গজন্‌স্পদাত অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করলেও শত্রুপক্ষের বিশাল ও শক্তিশালী বাহিনীর সামনে সে যুদ্ধ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। যুদ্ধ ক্ষেত্রেই গজন্‌স্পদাতের দেহান্ত হয়। ইরানী সেনা কয়েক দিনের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বহু সংখ্যক সেনা কবাতের পক্ষে এসে যোগ দিয়ে ইরানী বাহিনীকে আরও শীঘ্র দুর্বল করতে সহায়তা করে। এই প্রথম যুদ্ধে অবহরশহর-এর সীমান্ত থেকে দিহমগান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার ভাগ্য নির্ধারিত করে দেয়। কবাত আতুর-গুন্দপতকে অবহরশহরের কনারঙ্গের পদ দিয়ে সিয়াবখ্‌শকে মহাসেনাপতির পদে ভূষিত করে।

এই বিজয় কবাতের কাছে নেহাত ছোট ঘটনা নয়। এই বিজয়ে কনারঙ্গের জমা করা সকল সৈন্য কবাতের বশ্যতা স্বীকার করে কবাতের দলভুক্ত হয়। সৈনিক সামগ্রীও পাওয়া গেল এখানে প্রচুর পরিমাণে।

কবাত প্রথম বিজয়ের পর যে রাজ-ঘোষণা প্রচার করে, তাতে দেশের সকল দাস, কর্মকার, শিল্পী, মজুর, কিষান প্রভৃতি ভীষণ খুশী হয়। সাধারণ বণিক ও স্বতন্ত্র কৃষাণ প্রভৃতি সকলে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এমনি করে দেশের প্রায় সকল জনসাধারণ কবাতের পক্ষে যোগ দেয়। এমন সময় আবার দিহমগান, অবহরশহর প্রভৃতি এলাকায় রক্তপটধারী দেরেস্তদীন পন্থী প্রকট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।

বিজয় যাত্রার পর আজ কবাত বিশ্রাম করবার জন্যে এক গ্রামে শিবির স্থাপন করতে নির্দেশ দেয়। এইখানেই প্রথম বিজয়োৎসব পালন করবার ব্যবস্থা করা হয়। পুরনো মিত্র এবং নতুন

সহায়কদের সঙ্গে কবাত দরবারে বসেছে। এ দরবার তস্পোনের দরবারের মত সকল সাসানী নিয়ম ও মর্যাদা পালন করতে সজাগ রয়েছে। বিজয়ী বাদশাহকে ঘোড়ার পিঠে আসতে দেখে লোক জয় জয়কার ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করে তোলে। সকল সৈনিক দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঢাল বিস্তার করে মাথা নিচু করে শাহকে বন্দনা করে।

কবাতের কাছে এই বিজয় অসাধারণ বিজয়লাভ। আজ শুধু গজন্স্পদাতকে পরাজিত করেনি, ইতিমধ্যে ইরান সাম্রাজ্যের তিন চতুর্থাংশ বিজয় শেষ হয়েছে। অতএব কবাতের প্রসন্ন হবারই কথা। ইরানী সেনাও এতদিন উৎসাহহীন হয়ে যুদ্ধ করছিল। কারণ তাদের মতে কবাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মানে অধর্মের যুদ্ধ। এই পরাজয়ের সংবাদ যদিও তস্পোনে পৌঁছতে কিছু দেরি হবে, তবে সংবাদ পেয়েই শত্রুদল যে রীতিমত মর্মাহত হবে তাতে সন্দেহ নেই। কবাত যদি এখন তোরমানী সেনাদের ফিরিয়েও দেয়, তাহলেও তার হাতে যা ইরানী সেনা রয়েছে, তাদের দ্বারা বাকী বিজয়টুকু অনায়াসে করতে পারে। তবুও এখন অনেক বিস্পোহ্ (সামন্ত) পথিমধ্যে কবাতকে বাধা দেবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। কিন্তু তাদের সর্দার গজন্স্পদাত-এর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তারা নিজেদের অনাথ মনে করতে লাগলো। কবাত আজকের দরবারে আনন্দ প্রকাশ করে বললো,—

আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু ধ্বংস হয়েছে। আমি আশা করতে পারিনি যে প্রথম যুদ্ধে এত শীঘ্র গজন্স্পদাত নিহত হবে।

—খ্তায় পাতেখশাহ! আমারও সেই বিশ্বাস ছিল। বললো সিয়াবখ্শ। আমি ভেবেছিলাম সীমান্ত থেকে রাজধানী পর্যন্ত অন্ততঃ পাঁচ-ছ'বার ওর সঙ্গে লড়তে হবে। কিন্তু তার অত্যাচারের জন্যে প্রথম থেকেই তার নিজের সেনাদের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রথমবারেই বিজয়লাভ করবার সেও একটা মুখ্য কারণ। মিত্রবর্মা সিয়াবখ্শকে বললো,—

—নিঃসন্দেহ আমরা অদ্ভুত সাফল্যের সঙ্গে প্রথম বিজয়লাভ করেছি কিন্তু তম্পোন এখনও দূরে। শত্রুর শক্তিকে দুর্বল ভাবা সুবিবেচনা নয়। কবাত যুবরাজ মিহিরকুলকে চুপ করে থাকতে দেখে বললো,—

—মিত্র যুবরাজ! তুমি কিছুই বলছো না কেন?

—আমি যা বলতাম আমার মিত্র দুজনেই সেই কথা বলছে। পিতা মহারাজ প্রথম যুদ্ধ পর্যন্ত আমাকে সম্মিলিত থাকতে আদেশ দিয়েছিলেন। প্রথম যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এবার আমাকে রাজধানী ফিরতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুঃখ নিয়ে ফিরতে হচ্ছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণখুলে লড়াই করতে পারলাম না।

—যুবরাজ! তুমিই ত সেনার সবচেয়ে বড় ভাগ সঞ্চালন করেছ।

—সঞ্চালনই করেছি শুধু। আমার বাহিনী যুদ্ধ আরম্ভ করবার আগেই কনারঙ্গ যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিয়ে দিল। যদিও আমার খুব ইচ্ছা তম্পোন পর্যন্ত যাই, কিন্তু পিতা মহারাজের শাসন বড় কঠোর।

—মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা উচিত নয় যুবরাজ! তাছাড়া সবচেয়ে বড় কাজ ত যুবরাজের নেতৃত্বেই সুসম্পন্ন হয়েছে। যুবরাজের অপার স্নেহ এবং সহায়তার কথা আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না।

—আমরা দুজন সেই বাল্যমিত্রই আছি এবং চিরকাল থাকব। আমাদের এই মধুর সম্পর্ককে না কেউ ভোলাতে পারবে, না আমরা ভুলতে পারবো।

অতঃপর পানগোষ্ঠী শেষ হয়। এতদিন পর আগামীকাল যুবরাজ মিহিরকুল কবাতের কাছ থেকে আবার দূরে চলে যাবে, সেজন্যে দুজনেরই মন দুঃখময় হয়ে ওঠে। কবাত মিহিরকুলের যাত্রার ব্যবস্থা করবার আদেশ করে মিহিরকুলের সঙ্গে বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে।

ষড়বিংশ অধ্যায়

॥ কুমার লাভ ॥

—ওর কি নাম রেখেছ, মা ?

—এখনও নাম রাখিনি গুরুদেব। মনে করেছি ওর পিতা এসে নিজেই নাম রাখবেন। কিন্তু আপনি ত ওর পিতারও অন্দর্জগর (গুরু), আপনিই নাম রাখুন না আপনার পছন্দমত।

বসন্তকালের গোলাপ বাগানে বসে প্রজাপতির পিছনে পিছনে ছুটে ছুটে ক্রীড়ারত গোলাপের মত একটি শিশুর দিকে তাকিয়ে তার মায়ের কাছে নাম জিজ্ঞাসা করছিলেন মজ্‌দক অন্দর্জগর। এই তিন বৎসরেই অন্দর্জগরের মাথার সকল চুল সাদা হয়ে গেছে। শিশু ছুটতে ছুটতে ওদের সামনে দিয়ে অপর দিকে চলে যায়। অন্দর্জগর হেসে বললেন,—কী সুন্দর বালক !

—তেমনি দুষ্টুও হয়েছে। মাত্র তিন বৎসর বয়স হল, এরই মধ্যে কোন কথায় যদি একবার জিদ ধরেছে ত উপায় নেই, তা করেই ছাড়বে।

—মেধাবী বালক, তাই। ওর উপযুক্ত নামও হওয়া চাই।

—আপনি কোনও নাম পছন্দ করেছেন ?

—ওর পিতাকেই নাম রাখতে দাও। শীগগীরই এখানে আসছে ওর পিতা।

—আমার বিশ্বাস আপনার দেওয়া নাম ওর পিতার অপছন্দ হবে না। এতদিন আমি আপনার সম্বন্ধে কত কথাই না শুনেছি। আমার প্রতিবেশীরা বলত, আপনি নাকি মানুষ নন। হিংস্র শ্বাপদ বলে তারা আপনাকে।

—এখন আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে ?

—এখন ত মনে হয় আমার ঐ ছোট্ট শিশুর চেয়েও কোমল আপনি। দেখুন না মাত্র দুদিনেই আপনার কোল ছাড়তে চায় না। ঐ দেখুন আবার ফুল নিয়ে আসছে আপনার জন্যে।

শিশু কয়েকটা সবুজ পাতা আর ফুল নিয়ে ছুটতে ছুটতে অন্দর্জগরের কোলে এসে তার হাতে সেগুলিকে দিয়ে হাসতে থাকে। অন্দর্জগর আদর করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে আবার এক লাফে নেমে ছুটে পালিয়ে যায়।

—কী অবুঝ, সরল আর কোমল এরা! মাটি স্পর্শের পূর্বের বর্ষা-বিন্দুর মত পবিত্র। বর্ষা-বিন্দুকে মাটিই ময়লা করে। স্বচ্ছ স্ফটিক-শিলার উপর পড়া বর্ষা-বিন্দু যেমন ময়লা হয় না, তেমনি কু-আচার কু-সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখলে এরাও মলিন হয় না।

—আপনার নামে চিরকাল নিন্দা শুনে এসেছি, এখন সামনে দেখে উল্টো মনে হচ্ছে, আর তাদের কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে। যারা দারোগার ভয়ে কালোকে সাদা বলে থাকে। কয়েকদিন আগে যারা মজ্‌দক-এর নাম শুনে থুথু ফেলত, আজ তারা মজ্‌দককে খুশী করতে জীবনের মায়া করে না।

—তার কারণ আছে কন্যা। পাশার চাল উল্টে গেছে। কবাত এবং সিয়াবখ্‌শ বিজয়ীর বেশে ইরানে প্রবেশ করেছে। তিন বৎসরের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছিল। আজ তাদের সহায়তায় কবাত আবার সিংহাসনে বসতে চলেছে।

—আমি ত মনে করেছিলাম শত্রুপক্ষ সমূলে ধ্বংস হবে। যারা একদিন আপনার অনুগামীদের নৃশংসভাবে খুন করেছে, তাদের উপর আপনার এতখানি উদারতা দেখে আমি বিস্ময় বোধ করছি।

—মানুষ ও পশুতে প্রভেদ থাকতেই হয়, কন্যা। অন্ধের মত প্রতিশোধ নেওয়া পশুর কাজ। অকারণেও উপকার করাই মানুষের কাজ। শত্রুকে শত্রুতার দ্বারা জয় করা যায় না। বদলাতে অবসর দিতে হবে, মেরে ফেলা ত সবচেয়ে সোজা কাজ। আমার দুঃখ হয়

সকল শত্রুদের বাঁচাবার জন্যে আমি সকল জায়গায় উপস্থিত হতে পারছি না। তবুও আমি এবং আমার সাথী প্রাণপণ চেষ্টা করছি যাতে পথভোলাকে উচিত রাস্তা পেতে অবসর দেওয়া হয়।

—গুরুদেব! আমি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও বয়সে আপনার কাছে নিতান্তই নাবালিকা, তবুও আমার মনে হয় সকল মানুষকে বদলানো যায় না। এমন অনেক মানুষ আছে যারা সাপের মত কুটিল ও বিষধর। তারা কখনই নিজ স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না। বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত বংশে মানব-হৃদয়ের রীতিমত অভাব হয়ে থাকে। আজ তারা ভাবছে বামদাত পুত্রের সুনজরে থাকলে কবাতের কোপাগ্নিতে জ্বলবার ভয় নেই। তাই তারা অন্দর্জগরকে ঢালের মত ব্যবহার করছে। অন্যের কথা কি বলব, আমার পিতা, যিনি সামান্য একজন গ্রাম্য সর্দার। তিনিও অন্দর্জগরকে এমন ভাবেন যে আরও কিছুদিন আগে হলে আপনার মাথা কেটে তস্পোনের দরবারে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু আজ তিনিও আপনার চরণের দাস।

—ধনের মায়া এমনিই হয়ে থাকে। স্বর্গের দূতকেও ভুলিয়ে শয়তানে পরিণত করে দেয়। সেই জন্যে আমাদের ধর্মের মহাত্মারা বলেছেন, "যতক্ষণ ধনে সাম্য না হবে, ততক্ষণ মানুষে মানুষের ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হতে পারে না"।

—তাহলে গুরুদেব কী মানুষে মানুষে সমতা স্থাপন করবার জন্যে ধনের সমতা করতে চান?

—কেন তোমাদের পরিবারে দেখতে পাও না, যতক্ষণ ধনের সমতা থাকে ততক্ষণ শান্তির সংসার। বিষমতা যেই স্পর্শ করে অমনি সোনার সংসার ভেঙে ছারখার হয়ে যায়। আবার তাকে বশে আনতে অনেক সময় লাগে।

—তাহলে যে আপনার শত্রুরা বলে দেরেস্তদীন অপরের ধন লুঠ করতে চায়, তা আপনারা কার ধন লুঠ করছেন?

—আমরা বিশ্বকে এক পরিবার করে গড়ে তুলতে চাই কন্যা। ধনে সমতা হবার ফলে কিছু লোকের কষ্ট হবে ঠিকই। সেই কষ্টকেও আমরা যতটা সম্ভব কম করতে চেষ্টা করছি। যদি অনেক জনের সুখ-হিতের জন্যে কিছু লোককে কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তাহলে তাকে সহ্য করতেই হবে ; অন্ততঃ বহুজনের মুখ চেয়ে। দেখনি সেই জন্যেই কবাত্ত সিংহাসন ছেড়ে কোথা থেকে কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—আর সেই হিন্দু তরুণ ?

—হ্যাঁ মিত্রবর্মা। সেও নিজের জন্মভূমি থেকে বহুদূরে এখানে এসে আমাদের জল-বায়ুতে নিজেকে এক করে ফেলেছে। যার হৃদয়ে মানবতার লেশমাত্র আছে, সে নিশ্চয় মানব মাত্রের হিতের জন্যে নিজে একটু-আধটু কষ্ট সহ্য করবেই।

—কিন্তু মানবের মধ্যে সর্বত্রই ধনের লোভ দেখা যায়। এইটাই মানুষের স্বভাব। একে পরিবর্তন করা তেমন সহজ নয়।

—না দুখ্‌ত। মানুষের স্বভাব তা নয়। মানুষের নিজের জীবন ধারণের সামগ্রীকেই ধন বলে। মানুষ ধন উৎপাদনের চেষ্টা করুক আর ধন অপচয়ের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুক এটা ত অন্যায় নয়। কিন্তু সুখ হল তাতে, যদি সকলে মিলে সমানভাবে সেই ধনকে ভোগ করে। যদি জীবনোপযোগী সকল ধন সুলভ হয়, তাহলে মানুষের স্বভাবে ধন-লোভ থাকতে পারে না। পথ্য খাওয়া খুবই সাধারণ কাজ। যদি স্বভাবের অন্তর্গত করতে পারো তাহলে নিয়মিত পথ্যও কঠিন নয়। কিন্তু কু-পথ্যই সকল অসুখের মূল কারণ।

—চিরদিন পথ্য গ্রহণ করাও সকলের পক্ষে সুখকর নয়।

—যদি সকলেই করে তাহলে নিশ্চয় সুখকর। মানুষ দেখাদেখি অনেক কিছু করে থাকে। আমরা যে বিশ্বভ্রাতৃভাব স্থাপন করতে চাইছি, তা একজনের আচরণে, প্রচারে হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু

আমরা যদি এমন সমাজ সৃষ্টি করে নিই, যার আচরণ স্বেচ্ছাপূর্বক হতে থাকবে, তা হলেই আমাদের পাশের সমাজ বিরোধিতা করবে না, বরং তার ভালো দিকটা বিবেচনা করে তার অনুকরণ করতে চেষ্টা করবে। যে গ্রামের সকল মানুষ দেরেস্তদীনের উপর বিশ্বাসী, সেখানে তোমার-আমার, আপন-পর ভাব থাকতে পারে না। সেই গ্রামের সন্তানরাও জন্ম থেকে যে আচরণে অভ্যস্ত হতে থাকবে, তাকেই জীবনভর আঁকড়ে ধরে থাকবে। সমতার সমাজকে তারা স্বাভাবিক মনে করবে আর বিষমতা দেখে তারাও আশ্চর্য হবে।

সত্যি সত্যিই দুদিন আগে অন্দর্জগর যখন এই গ্রামে এলেন, এবং নবানতুখ্ত যখন জানতে পারে এই পুরুষটিই শাহনশাহ কবাতের গুরু এবং এরই জন্যে সমগ্র ইরানে সাড়া পড়েছে ; এমন কি উলট-পালটও হয়ে গেল কয়েকবার। তখন, প্রথমে ওর মুখ দেখে নবানতুখ্ত ভয় পায়নি, কিন্তু এতবড় একটা মহাযজ্ঞের হোতা বলে যেন বিশ্বাস হতে চায় না ওর মনে।

অন্দর্জগর প্রথম দিনেই তার শিশু সন্তানকে যেমন আপন করে নিয়েছেন, এবং শিশুটিও যেন কত বৎসরের পরিচিত আপনার জন পেয়ে তাকে ভালোবেসেছে, বস্তুতঃ এই কারণই অন্দর্জগরকে এত শীঘ্র এত কাছে টানতে সাহায্য করেছে।

গজনস্পদাত-এর পরাজয় এবং কবাতের বিজয়-বার্তা একসপ্তাহ আগেই পেয়েছে নবানতুখ্ত। সেই বিজয়ের সংবাদ পেয়ে যেমন করে দিহবগান পর্যন্ত সমস্ত নগরী, গ্রাম প্রভৃতি জায়গার সকলে তাদের উৎপীড়ক অধিকারীদের তাড়িয়ে দিয়ে কবাতকে স্বাগত জানাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, তেমনি অবহরশহরও (নেশাপোর) শাহর আগমনকে স্বাগত জানাবার জন্যে তৈরী হয়েছে, এখানকার কনখ্তায় (গ্রামপতি) যদি কবাতকে জামাতা না মনে করতো, তাহলে তাকেও এতক্ষণ ঘর-বাড়ী ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে হত। আজ সকল

লোক জেনেছে যে গ্রামপতির ঘরে শাহনশাহ কবাতের এক স্ত্রী রয়েছে, শুধু স্ত্রী নয়, রাজপুত্রও রয়েছে।

আজ কবাতের আগমনের প্রতীক্ষা করছে সকলে। গ্রামপতির মহল যতদূর সম্ভব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। বসন্ত ঋতু উদ্যান সজ্জায় খুব সহায়তা করেছে। গাছের মাথায় মাথায় সবুজ পাতার সমারোহ, শাখায় শাখায় ফল আর ফুলের মেলা। নবানতুখ্‌ত-এর প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলি যেন কাটতে চাইছে না, তাই অন্য উপায় না দেখে অন্দর্জগরের সঙ্গে বসে গল্প করতে থাকে। সামনে শিশু সন্তান ছুটে ছুটে খেলা করছে। তারা কথায় কথায় তুজনে এমন তন্ময় হয়ে আছে যে নবানতুখ্‌ত জানতেই পারেনি যে সংবাদবাহক এসে সংবাদ দিয়ে চলে গেছে।

বাড়ীর চাকর-বাকরদের চঞ্চলতা ও সোরগোল দেখে নবাদতুখ্‌ত-এর যেন ধ্যানভঙ্গ হয়। বাজী পোড়ানোর তুমুল শব্দে নেশাপোর নগরী কেঁপে ওঠে। নগরময় হৈ হৈ কাণ্ড। শাহনশাহ নগরদ্বারে পোঁছেছেন।

গ্রামপতির মহলের চারিদিকে শত শত ইরানী ও হেফতালী অশ্বারোহী সৈনিকদের কড়া পাহারা বসেছে। মহলের উদ্যানে রাজকীয় তাঁবু খাটানো হয়েছে। পরিচারক পরিচারিকারা ত এক পল্টন জমা হয়েছে এখানে। তাদের আনাগোনায় সমস্ত মহল সরগরম। ইরানের শাহনশাহ আজ এখানে আসছেন তার প্রিয়তমা পত্নী আর পুত্রের কাছে।

আজ সেই ঘরটি শাহর কাছে ছোট মনে হয়, যে ঘরটিতে বসে তিন বৎসর আগে তরুণী সুন্দরীর সঙ্গে তিনি প্রণয়লীলা করেছিলেন। এ সময় কবাতের পাশে মিত্রবর্মা, সিয়াবখ্‌শ নবান-তুখ্‌ত ও তার পুত্র বসেছিল। চারজনের সামনে মণিজটিত চষক এবং লাল মদিরা রাখা রয়েছে। মদিরার মাধ্যমেই ওরা নিজেদের মিলনের প্রথম পর্ব উদ্‌যাপিত করেছে। রাজকুমার মায়ের কোল

ছেড়ে বাইরে যাবার জন্যে ছটফট করতে থাকে। নবানতুখ্‌ত কুমারকে কোল থেকে নামিয়ে বললো,—তোমার পিতার কাছে যাও ইনি তোমার পিতা। কিন্তু কুমার বাইরে যাবার জন্যে জিদ ধরেছে।

কবাত এই সুন্দর ফুলের মত শিশুকে দেখে ভীষণ খুশী হয়। তার মনে পুত্রস্পর্শের বাসনা উগ্র হয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে কুমারকে কাছে ডাকে, কিন্তু কুমার যায় না। সিয়াবখ্‌শ সেই দৃশ্য দেখে বললো,—কুমার এখন ফুলের বাগানে প্রজাপতি ধরতে যাবে।

—হ্যাঁ, প্রজাপতি ধরবার ভীষণ সখ ওর। বললো নবানতুখ্‌ত, ফুলের সখও আছে। কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশী বন্ধুত্ব হয়েছে ওর অন্দর্জগরের সঙ্গে।

—অন্দর্জগরের সঙ্গে? তিনজনে একসঙ্গে চমকে ওঠে। তিনজনেরই মনে পড়ে দিহবগানের স্মৃতি!

—হ্যাঁ। সত্যি তিনি মহাপুরুষ। তাঁর বাণী যেমন মধুমিশ্রিত, স্বর তেমনি কর্ণপ্রিয়, শব্দও তেমনি সুন্দর। তাঁর সঙ্গে যত বেশী মেশা যায় ততই তাকে মধুর মনে হয়।

—হুঁ, তাহলে কুমার অন্দর্জগরের কাছেই যেতে চাইছে? তবে যেতে দাও ওকে। তাঁর সৎসঙ্গে থাকলে ও যথার্থ মানব হতে পারবে। তুমি আমি ওকে তেমন করে তৈরী করতে পারবো না। কুমার অন্দর্জগরের কথা শুনেই মায়ের কোল থেকে একলাফে নিচেয় নেমে "আমি অন্দর্জগরের কাছে যাব" বলে দৌড়ে অন্দরে চলে যায়। মিত্রবর্মা কুমারের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো,—

—সৎসঙ্গের অনেক গুণ! বিশেষ করে আমাদের অন্দর্জগরের মত মহাপুরুষের সৎসঙ্গ। কিন্তু কখনও কখনও বড় সৎসঙ্গেও মানুষের স্বভাবকে বদলাতে অকৃতকার্য হ'তে দেখেছি। বুদ্ধের সৎ-সঙ্গে দেবদত্ত বহুদিন ছিল। কিছুটা অবশ্য প্রকৃতির বদল হয়েছিল, কিন্তু অবশেষে তার আসল প্রকৃতির প্রকাশ হল এবং সৎসঙ্গের

প্রভাব নষ্ট হয়ে গেল। তবে আমাদের শাহপুত্র নিশ্চয় তেমন হবে না বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

—আপনি আমাদের শাহপুত্রের কী নাম রেখেছেন? প্রশ্ন করে সিয়াবখ্‌শ। নবানহুখ্‌ত এবার লজ্জায় পড়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। অতঃপর বলে,—এখনও নাম রাখা হয়নি। অন্দর্জগরকে বলেছি তিনিই নামকরণ করলে সকলের পছন্দ হবে।

—তিনি কি নামকরণ করেছেন? সিয়াবখ্‌শ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

—হ্যাঁ, অন্দর্জগরের দেওয়া নাম আমাদের সকলের পছন্দ হবে। সম্মতিসূচক মন্তব্য করে কবাত।

—তিনি বলেছেন, ওর পিতাই ওর নাম রাখবেন। বললো নবানহুখ্‌ত।

—ঠিক। শাহনশাহেরই শাহপুত্রের নামকরণ করা উচিত। বলে মিত্রবর্মা।

—মিত্র। তুমি ত ভেদ-ভাবের সবচেয়ে বড় বিরোধী। বিশেষ করে এ বিষয়ে ত অন্দর্জগরের চেয়েও চার পা এগিয়ে আছো। তাহলে তুমি এমন আগ্রহ করছ কেন? তুমিই রাখ না কেন শাহপুত্রের একটা শুভনাম।

—আমার যে ইরানী নাম সব জানা নেই। তাহলে আমিই রাখতাম। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সিয়াবখ্‌শ বললো,—

—খুসরব (খুসরো) কেমন নাম হয়?

—খুব সুন্দর। বলো না নবানহুখ্‌ত তোমার পছন্দ হয়? বলে কবাত।

—আমার স্বামীর পছন্দই আমার পছন্দ। মাথা নিচু করে উত্তর দেয় নবানহুখ্‌ত।

—তাহলে আজ থেকে আমাদের পুত্রের নাম হল 'খুসরো খাঁ'।

* * *

শয়ন কক্ষের দুদিকের কোণে দুটি মোমবাতি জ্বলছে। তিনবৎসর পর নবানতুখ্‌ত প্রিয়তমের শয্যাপাশে বসে আশ্চর্য হয়ে দেখছিল। সেদিনের সেই বণিক-বেশী কুমার আর আজকের ইরানের শাহন-শাহকে। কবাত-এর মন অন্যান্য শাহদের মত নয়। নইলে ইরানের শাহনশাহের পক্ষে একজন সামান্য গ্রাম্য সর্দারের কন্যাকে এতখানি মহত্ত্ব দেওয়া আশ্চর্যের কথা। কিন্তু কবাত জানে যে এই মেয়েটির পিতাই নিজের জীবন বিপন্ন করে ওদের যদি সহায়তা না করত তাহলে হয়ত এত শীঘ্র ও সহজে ইরানের সিংহাসন ফিরে পাওয়া সম্ভব হত না! সিয়াবখ্‌শ কর্তৃক প্রেরিত দূত এই সর্দারের বিনা সহায়তায় সীমান্ত পার হয়ে প্রতিদিন সংবাদ আদান-প্রদান করতে কোনক্রমেই সমর্থ হত না। তাছাড়া আরও বড় কথা হল নবানতুখ্‌ত-এর গর্ভের সন্তান। যাকে একবার চোখে দেখলে চোখের আড়াল করা অসম্ভব মনে হয়। নবানতুখ্‌ত জানে যে ইরানের শাহী মহলে তার মত হাজার হাজার চেরী-রানী রয়েছে। ওর মনে এ বিশ্বাস কখনই ছিল না যে জীবনে দ্বিতীয় বার কবাতকে নিজের কাছে পাবে। কিন্তু আজ? আজ ও নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করছে। সঙ্কোচ ও লজ্জাভাব উপর থেকে চেপে রাখলেও মনে মনে নবানতুখ্‌ত ভীষণ প্রসন্ন। তবুও ভয় করতে থাকে পুত্রের সম্বন্ধে শাহর সঙ্গে যে খোলাখুলি কথা বলেছি, এতে শাহ মনঃক্ষুণ্ণ হননি ত? পালঙ্কের এক কোণে সঙ্কুচিতভাবে আনত সমস্তকে বসে থাকা নবানতুখ্‌তকে কাছে টেনে আনে কবাত।

—কি, মুখে কি তুলো দিয়েই থাকবে? ঠাট্টা করে বলে কবাত।

—না স্বামী, আমার ভয় করছে।

—ভয়? কারণ আমি তোমার স্বামী? তাছাড়াও আরও কিছু বলেই ত আমি জানি।

—সেই ত ভয়ের কারণ। রাজা এবং আগুনের বেশী কাছে থাকতে নেই শুনেছি। কবাত এবার হাসতে হাসতে নবানত্থ্‌তকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে চুম্বন এঁকে দেয় ওর কপালে মুখে।

—রানী! এখন ত আমরা তুজন শুধু কাছাকাছি নই, এক হয়ে গেছি। এখন আর ভয় করলে লাভ কি?

—শাহনশাহ'র এমন হওয়া নতুন কিছু নয়। আমি আমার স্বামীর চাকরজন হয়ে থাকতে রাজী আছি। আমার আর কিছু চাই না, কেবল আপনার শ্রীচরণের সেবিকা হয়ে থাকতে পারলেও খুশী হব।

—ছিঃ চাকরজন হয়ে থাকবে কেন প্রিয়ে? তুমি আমার বম্বিশ্ন (রানী)।

—কিন্তু শুনেছি আপনার রানী হতে হলে সামন্তকন্যার যোগ্যতা থাকা দরকার। আমি শুধুমাত্র একজন গ্রামপতির কন্যা। সে ভাগ্য আমার কি করে হবে?

—বুঝেছি। কিন্তু এই সকল নিয়মের ঊর্ধ্বে তোমার শাহনশাহ। তুমি আমার রানী এবং খুসরো আমার শাহপুত্র। বলো আমার কথায় বিশ্বাস হয় না?

—অমন কথা বলবেন না স্বামী। আমি সামান্য গ্রামীনকন্যা হয়ে যে অনুগ্রহ পেয়েছি তাতে আমার সৌভাগ্যকে যেন বিশ্বাস হয় না। আপনার চাকরজন হয়ে থাকাও গর্বের কথা।

—কিছুকালের জন্যে আমার ভাগ্যদেবতাও ঘুমিয়ে ছিল, প্রিয়া। তার জাগবার কোনও আশাই ছিল না। সিংহাসন থেকে একবার বঞ্চিত হওয়া শাহ কখনও দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসেছে বলে শুনিনি। কিন্তু হারানো সিংহাসন আবার আমি ফিরে পেতে চলেছি। আমার সবচেয়ে বড় শত্রু নিহত হয়েছে, এবার সিংহাসন আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। অর্থাৎ আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। নবানত্থ্‌ত-এর চেহারায় উদাস ভাব লক্ষ্য করে কবাত

আদর করতে করতে বলে,—বলো, যাবে ত ? বলো না। নবানতুখ্‌ত-এর মনে নানা চিন্তার উদয় হয়। শাহনশাহর পত্নী হওয়া গর্বের কথা, কিন্তু রানীদের সঙ্গে শাহদের প্রেম তিনদিনের বেশী স্থায়ী হয় না। তারপর আজন্ম অন্তঃপুরে বন্দিনী হয়ে থাকা। এ সবই তার জানা আছে। তবুও হঠাৎ 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলে সকল কথার নিশ্চয়-সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহস হয় না। নবানতুখ্‌ত একবার আঘ্রান নিয়ে ফেলে দেওয়া ফুল হয়ে থাকতে চায় না। করুণভাবে কবাতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,—

—আপনার আজ্ঞা সর্বদাই আমার শিরোধার্য। কিন্তু স্বামী, আমার মধ্যে এমন কোন গুণ দেখতে পাচ্ছি না যার জন্যে আপনার শ্রীচরণের কাছে থাকারও উপযুক্ত মনে করতে পারি। কবাত হাসতে হাসতে নবানতুখ্‌ত-এর চিবুক স্পর্শ করে বলে,—

—গুণ ? তোমার সব গুণই আছে। এই দেখ পদ্মরাগের মত তোমার রক্ত-অধর, গোলাপের মত কোমল আরক্ত কপোল, দীর্ঘায়ত ভ্রূ, মৃগনয়ন, সুন্দর চিবুক, শঙ্খাকার গ্রীবা, সুবর্ণ বর্ণ তারের মত চুল, মোহক উরোজ, ক্ষীণ কটি······

—থাক আর কবিতা বলতে হবে না। আমি জানি এ সবের কোনটিই শাহনশাহের কাছে দুর্লভ নয়। রণিবাসে আমার চেয়ে বহুগুণে সুন্দরী হাজার হাজার রানী রয়েছে আপনার। তার মধ্যে আর একটি সংখ্যা বাড়িয়ে আপনার লাভ কি ? তার চেয়ে অনুগ্রহ করে আমাকে এইখানেই থাকতে দিন। পিতার ঘরে আপনার মধুর স্মৃতি বুকে নিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব। হাসতে হাসতে গম্ভীর হয়ে যাওয়া এই তরুণীর দৃঢ় মনোবল দেখে কবাত অবাক হয়ে ভাবে, এ অন্যান্য সুন্দরীদের চেয়ে ভিন্ন স্বভাবের। অন্যান্যরা সঙ্কেত মাত্র পেয়েই নাচবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে। আর এর কাছে ভোগবিলাসে পূর্ণ সহস্র সুন্দরী নারীর অন্তঃপুরকে ঘৃণিত জীবন মনে হচ্ছে। নবানতুখ্‌ত-এর অস্পষ্ট অস্বীকার কবাতের আকর্ষণ

আরও বাড়িয়ে তোলে। অতঃপর কবাত উদাসভাবে অথচ সস্নেহে নবানত্থুখ্ত-এর কাঁধে হাত দিয়ে বলে,—

—প্রিয়া, আমি তোমাকে হাজার রানীর একজন করে রাখবার জন্যে নিয়ে যেতে চাইছি না। সামন্ত কন্যাদের চেয়ে তোমার উপর প্রেম ও সম্মান আমার হৃদয়ে শতগুণে বেশী।

—আমি তা অনুভব করি স্বামী। তবু ভাবছি আপনার সহোদরা সম্বিক ও সহোদরা পুত্রী হুনরাজকন্যা এবং আরও কত অদ্বিতীয় রূপ, কুল, গুণসম্পন্না রানী রয়েছে। আমার মত সামান্যা গ্রাম্য-বালার উপর আপনার অসামান্য কৃপা, তাও স্বীকার করছি। কিন্তু আমি আমার পিতার একমাত্র স্নেহের কন্যা, স্বভাবেও কিছুটা অনম্র। তাই ভয় লাগে আমাকে নিয়ে গেলে আমার জন্যে শুধুই আপনি কষ্ট পাবেন।

কবাত ভাবছিল এই তরুণী দেখতে যত সাদাসিধে আসলে তা নয়। আত্মগৌরবের মাত্রা এর স্বভাবে যথেষ্ট রয়েছে। কবাতের জীবনে এমন একজন নারীর বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই আবার আগ্রহ প্রকাশ করে।

—না প্রিয়ে, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। যদি তুমি আমার প্রতিশ্রুতিকে মূল্যবান মনে করো, তাহলে মনে রেখো আমি প্রতিজ্ঞা করছি, সদা সর্বদা তোমার বিশেষ স্থান থাকবে আমার হৃদয়ে, শুধু তোমার নয় তোমার পুত্রেরও বিশেষ উচ্চস্থান থাকবে ইরানের শাহমহলে ও শাহের মনে।

—আমি আপনার চরণে সর্বচেয়ে নিম্নস্থান পেয়েও সন্তুষ্ট হব স্বামী। কিন্তু আমার অস্বীকার করবার উদ্দেশ্য অন্য কারণে। আমি আপনার জীবনে নিরর্থক ভারস্বরূপ হয়ে থাকতে চাই না।

কবাত নবানত্থুখ্তকে আরও জোরে চেপে ধরে যেন মিশিয়ে ফেলে হৃদয়ের মধ্যে।

—তাহলে এই কথাই ঠিক রইল, আগামীকাল পুত্র সহ তুমি আমার সঙ্গে রাজধানীতে রওয়ানা হবে। শেষ কথা আমি শুধু বলতে চাই, আমার উপর বিশ্বাস করে তুমি প্রতারিত হবে না।

নবানত্থ্‌ত-এর দু-চোখ ছলছল করে ওঠে। কবাতের হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে ধীরে ধীরে বললো,

—স্বামীর আজ্ঞা অবহেলা করবার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি নিজের অযোগ্যতার জন্যেই সঙ্কোচ করছিলাম। আপনি যদি এই নিঃস্ব কন্যাকে ধুলো থেকে উপরে তুলতে চান, তাহলে আমি আপত্তি করবো না। আজন্ম আমার স্বামীর সেবাই আমার কাম্য।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

।। পুনঃ সিংহাসন, খৃঃ ৫০০ ।।

তিক্রা এখনও তেমনি মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে, যেমন চলে আসছে চিরকাল। তাকে দেখলে মনে হয় না তারই চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির কিছুই সে জানে। ওর কাছে হয়ত এমন ঘটনা কোনও বিশেষত্ব রাখে না। তিক্রা ভাবে, এমন কতবারই ত দেখলাম, আরও কত দেখব। সৃষ্টির আদিকাল থেকে ও এমনি রক্তে স্নান করে খুশী থাকতে অভ্যস্ত। কিন্তু তস্পোন নগরীর চোখে যেন ঘুম নেই। তার মনে কখনও বা কবাতের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়, কখনও বা হেফতাল নামক শ্বেতহুনদের ভয়। শ্বেতহুন উপনাম-ধারী এই জাতি ক্রুরতায় হুনদের চেয়ে কম নয় বলেই লোকে ওদের উপনাম দিয়েছে শ্বেতহুন। ওরা কি এবার ওদের স্বভাব-সুলভ অত্যাচার ও লুঠপাট করেই তস্পোনের উপর দয়াপ্রদর্শন করতে আসছে? সদিও কবাতের সহায়তা করতে তারা আসছে, কিন্তু কবাত ত তাদের প্রভু নয়। তস্পোনের বৈভব ওদের লুঠ করতে প্রেরণা দেবেই। মাত্র একজন হুন-এর মৃত্যুর কারণই সমগ্র তস্পোনকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এই ভয় তস্পোনের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের মনে ভীষণ চিন্তার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া যারা কবাতকে পথের ভিখারী করতে চেয়েছিল তাদের অবস্থা ত আরও সঙ্গীন। কোন মুখে তারা কবাতের সামনে দয়াভিক্ষা চাইবে? কবাতের মৃদু স্বভাব ও তার গুরু মজ্‌দকের কাছে যদিও দয়াপ্রাপ্তির আশা আছে, কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের নিশ্চিন্ত হতে দেয় না।

প্রাসাদ-দুর্গের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে। দুর্গের অভ্যন্তরভাগে যদিও মানুষ রয়েছে অনেক, তারা যাতায়াত করছে

প্রয়োজন মত, কিন্তু এখানকার গতি যেন নির্জীব। লোক ভাষার বদলে ইশারায় নিজেদের মধ্যে মনের ভাব প্রকাশ করছে। সকলেই সশঙ্কিত। প্রাণী, পশুরা সকলেই নীরব, শঙ্কিত। এমন সময় সাদা ঘোড়ার পিঠে চেপে শ্বেত বস্ত্রধারী মহাপুরোহিত কয়েকজন পরিচারকের সঙ্গে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দ্বারপালদের মধ্যে কয়েকজন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্দনা করতে বাধ্য হয়। অনেকে নিজেদের বাঁচিয়ে দূরে দূরে সরে গেছে।

কবাতকে রাজ্যচ্যুত করতে এই মহাপুরোহিতের অধিক হাত ছিল। যদিও বদনাম বেশী ছিল কনারঙ্গ গজন্স্পাদতের। "পবিত্র ধর্ম বিপদে পতিত" ঘোষণা করেছিলেন এই আতুরপত্ত মহা-পুরোহিত। ইনিই অহুর্মজদ্, অমসাস্পদ এবং ইস্তখ্রের ভগবতীর দোহাই দিয়েছিলেন এবং দেশের লোকের মনে কবাতের উপর ঘৃণাভাব জাগাতে সবচেয়ে বেশী সচেষ্ট ছিলেন। মহাপুরোহিতের শ্বেতারক্ত মুখমণ্ডল এ সময় পাণ্ডুর-বর্ণ ধারণ করেছে, তবুও গম্ভীর ভাব বজায় রেখেছেন তিনি।

দুর্গমধ্যে একটি কক্ষে শাহনশাহ জামাস্প একটি আসনে উদাস-ভাবে বসে রয়েছেন। ইরান মহামন্ত্রী প্রভৃতি অন্যান্য রাজামাত্যরা পাশে বসে উৎসুক হয়ে কার যেন আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। এমন সময়ে মহাপুরোহিত প্রবেশ করে একটি আসন গ্রহণ করেন। সাধারণ বন্দনার পর সকলে আসন গ্রহণ করতে জামাস্প মহা-পুরোহিতকে বললেন,—

—আমরা সকলে অধীরভাবে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম এই সময় যুদ্ধক্ষেত্র কোথায় তা সঠিক বলা কঠিন। গজন্স্পাদাত-এর মৃত্যুর পর আমাদের সেনাদের মন থেকে যুদ্ধের উৎসাহ চলে গেছে, মহাপুরোহিত আতুরপত অন্যমনস্কভাবে বললেন,—আমার উপর আর কি আশা থাকতে পারে? গজন্স্পাদাতের পরই কবাত ও মজদকের সবচেয়ে বেশী রোষ

আমারই উপর পড়বে। মহাসেনাপতি বোইয়া অধীরভাবে পুরোহিতের কথার মধ্যে বলে উঠলেন,—

—এ সব কথায় এখন আর কোনও লাভ নেই। আমরা সকলে "একই নৌকার যাত্রী"। এর মধ্যে কে বড় অপরাধী আর কে ছোট অপরাধী, তা মেপে দেখা নিরর্থক। উত্তরের হুন ও পশ্চিমের রোমকরা আমাদের সৈনিক শক্তিকে একটি ক্ষেত্রে যুদ্ধ করবার অবসর দেয়নি—

—এ আর এমন নতুন কথা কি? মহাসেনাপতির কথা শেষ না হতেই বললেন অন্য একজন অমাত্য। উত্তর এবং পশ্চিমের দিকে দৃষ্টি রেখেও আমরা আমাদের সৈন্যের বড় অংশকে হুন সীমায় রেখেছিলাম, গজন্স্পদাত অত সহজে পরাজয় স্বীকার করেনি। আর এখন ত কবাতের বিজয়োৎসব যাত্রা হয়ে আসছে। জামাস্প আরও অধীর হয়ে ওঠেন ক্রমশ।

—সেই বিজয় যাত্রারও শেষ হয়েছে। তম্পোন এখন তাদের কাছে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা। আমরা এই তিনটা দিন ব্যর্থ নষ্ট করেছি। এখনও আমাদের সামনে মাত্র দুটি রাস্তা খোলা আছে। হয় দেশ ছেড়ে পালানো নতুবা আত্মসমর্পণ। আমি শুধু আপনাদের মতামত জানবার জন্যে অপেক্ষা করছি। আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি উভয় মতেই রাজী আছি।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। তৃতীয় রাস্তা অর্থাৎ যুদ্ধের আশা করাও এখন মূর্খতা, মহাপুরোহিতের মুখে এই কথা শুনে সকলেই আশ্চর্য হন। ধর্মের যুদ্ধের যিনি সর্বপ্রধান হোতা, তার মুখে এ কথা কেউ আশা করেনি। আতুরপত উপস্থিত সকলের চেহারায় অবিশ্বাসের ছায়া দেখে আবার বললেন,—ভবিষ্যতের সামনে মাথা নত করাই বিবেচকের কাজ। সফলতার কোনও প্রকার আশা নেই যখন, তখন নিরপরাধ মানুষগুলির রক্তপাত করা উচিত নয়।

—আর আপনার পবিত্র ধর্ম যে মজদকীদের হাতে লুপ্ত হয়ে যাবে? ব্যঙ্গ করে বললেন মহাসেনাপতি।

—পবিত্র ধর্মের লোপ পাওয়ার ত কথাই ওঠে না। বললেন জামাস্প, এ সবই ত ধর্ম-পুরোহিতদের কূটবুদ্ধির পরিণাম। কেন, বামদাতপুত্র মজদক এবং তাদের আচার্য মানী কি স্পিতামা জর্থুস্তকে মানতেন না? তিনি কি ভগবান অহুর্মজদকে প্রার্থনা করতেন না?

—আমাদের দীন অর্থাৎ ধর্মের বিষয় অন্য সময় আলোচনা করা যাবে। বললেন মহাপুরোহিত।

—তাহলে আত্মসমর্পণ এবং পলায়ন, এর মধ্যে কোনটা গ্রহণ করলেন আপনারা? প্রশ্ন করেন জামাস্প। মহাসেনাপতি মন্তব্য করেন,—

—আমাদের শাহের পক্ষে আত্মসমর্পণ উচিত হবে না। তাতে আপনার ভয় আছে।

—সে ভয়ের জন্যে আমিই চিন্তা করব। আমি সকল অপরাধ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি।

—আমাদের শাহনশাহ রোমকদের কাছে যেতে পারেন। বললেন মহাসেনাপতি বোইয়া।

—কেন? সময়ের প্রতীক্ষার জন্যে? না, আর আমি জুয়া খেলতে প্রস্তুত নই। তার চেয়ে নিজের ভাইয়ের বন্দী হওয়া আমার সুখের কথা।

—হ্যাঁ। ভাই চোখও উপড়ে ফেলবে না অথবা বন্দীও করবে না ব্যঙ্গের সুরে বললেন মহাপুরোহিত আতুরপত।

—কারণ, তখন আপনি আপনার ভাইকে প্রাণদণ্ড দিতে অথবা অন্ধ করে দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

—সে আমাকে যা খুশি করুক, কিন্তু আমি সাসানী বংশকে নির্বল হতে সহায়তা করতে পারবো না।

—আমিও শাহনশাহের বিচারে সহমত আছি। এই বৃদ্ধ বয়সে

অপরের দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে ফেরার চেয়ে জন্মভূমি ইরানের দখ্‌মাতে শয়ন করা আমার কাছে অধিক সুখকর। পালাতে চাই না আমি। বললেন মহাপুরোহিত। জামাস্প সকলের উদ্দেশে বলেন,

—আমাকে কেবল নিজ লাভ-লোকসান দেখলেই চলবে না। এই যুদ্ধকে যে কোনও অবস্থায় আর চলতে দেওয়ার অর্থ হল হিংস্র হুনদের হাতে তস্পোনের বিধ্বংস। এই অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে যদি আমরা নিজের দেশ ও রাজধানীকে বাঁচাতে পারি, তাহলে তার চেয়ে সুকর্ম আর কিছু হতে পারে না।

হেফতাল সৈনিক ছোটখাটো শহর বা নগর লুঠ করে তৃপ্তিলাভ করতে পারছিল না। তাদের দৃষ্টি ছিল তস্পোনের উপর। যুদ্ধে যাদের আত্মীয়-স্বজন মারা পড়েছে, তারা প্রতিশোধ নেবার জন্যে অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু আজ যখন জামাস্প-এর দূত যুদ্ধ-বিরতির সংবাদ নিয়ে এল কবাতের কাছে, তখন তাদের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ ভাব দেখা গেল, কবাত একটু ভয়ও পেয়ে ছিল। হয়তো হেফতালী সৈনিকরা তার আদেশ মানবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই মুহূর্তে অন্দর্জগরের শান্তির বাণী তাদের মধ্যে যেন আগুনে জল ছিটিয়ে দিলে। তিনি বললেন,—

—শত্রুতার দ্বারা শত্রুতাকে ধ্বংস করা যায় না। বুদ্ধদেবের এই বচন অতি সত্য কথা। প্রতিশোধের চক্র যতই চালাতে থাকবে, ততই সে ঘুরতে থাকবে। তার কখনই শেষ হবে না। আমাদের উদারতা ও ক্ষমাগুণে আমরা এইখানেই সেই শত্রুতার শেষ করে দেখিয়ে দিতে চাই যে, ক্ষমার দ্বারাই মহৎ কার্য সাধিত হওয়া সম্ভব। দুষ্টের যদি স্বভাবের পরিবর্তন না করা যায়, ভবিষ্যতে তার মনে যদি ভয়ের লেশমাত্র থাকে, তাহলে আবার কখনও হয়তো সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠতে পারে। অতএব জনকল্যাণের দিকে তাকিয়ে আমাদের উচিত, শত্রুর উপর প্রীতি দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া। সাময়িক-রূপে প্রতিশোধ নেওয়া কখনই হিতকর হয় না।

শুদ্ধ রাজনৈতিক দৃষ্টি সম্পন্ন লোক অন্দর্জগরের এই বিচার ধারায় সন্তুষ্ট হতে পারে না! সিয়াবখ্‌শ দেরেস্তদীন (মানীর ধর্ম, অর্থাৎ অন্দর্জগরের অনুসৃত নীতি)-এর লক্ষ্য সামনে রেখে তার উপর ভবিষ্যতের বিপদাশঙ্কার কথা বলতে অন্দর্জগর বললেন,—আমি মনে করি না যে আমি বা তুমি অমর হয়ে থাকব। এই প্রথম পরীক্ষায় আমরা যদি সফলকাম হতে পারি, তাহলে আমাদের কর্তব্য পূর্ণ হবে। চিরকাল এমনি করে তুমি বা আমি দেরেস্তদীনকে রক্ষা করতে পারবো না। আমরা ত শুধু নিমিত্ত মাত্র, কর্তব্যের অধিকারী, এমনও ত হতে পারে তুমি ও আমি মিলে এই ভূতলে আংশিকভাবে সমতার রাজ্য স্থাপন করতে পারি, এবং আমাদের মৃত্যুর পর বিরোধী পক্ষ তাকে ধ্বংস করতেও পারে। তাহলে কি সেই সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্ত এবং উদ্দেশ্যও ধ্বংস হয়ে যাবে? আমার ধারণা অন্যরকম। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে চাই আহার, শীতের জন্যে চাই গরম পোষাক ও খাদ্য, এমনি পৃথিবীতে দুঃখকে দূর করবার জন্যে মানুষে মানুষে সমতা, ভোগের মধ্যে সমতা, কাজের মধ্যে সমতা স্থাপিত করাই একমাত্র পথ। অতি সামান্য সংখ্যক মানুষ যারা বিষমতার দ্বারা সুখী হয়ে আসছে এবং সেই অতি অল্প সংখ্যাও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারে না। বিষের ভয়ে তারা প্রতিবার অন্নের থালার দিকে সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করে থাকে, গুপ্ত আঘাতের ভয়ে অনিশ্চিত শয্যার শরণ নিতে হয় তাদের। এগুলি কি সত্যিই সুখী নিশ্চিন্ত জীবনের লক্ষণ? মানুষ যখনই ব্যাপক সুখের কথা চিন্তা করবে, তখনই সে দেখতে পাবে যে, নিজের সুখী জীবন লাভ করতে হলে তার আশপাশের সবাইকে সুখে থাকতে হবে। "আমি এবং আমার" এই আত্মনীতি ছেড়ে তখনই ভাবতে হবে, বিশ্বকে একই পরিবার করে গড়ে তুলে সর্বত্র সমতার স্থাপনই সকল রোগের, সকল অসুখের মহৌষধ। এমনও হতে পারে, ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্ন-দর্শীরা আমাদের নীতির সঙ্গে পরিচিত হল না। তবুও যা সত্য, তা ভুলে গেলেও

একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করবেই। আমাদের ছেড়ে যাওয়া উদাহরণ যদিও লুপ্ত হয়ে যায় তবুও সেই নতুন হাত, নতুন মস্তিষ্ক আবার এই কাজে আত্মনিয়োগ করবেই, এবং তারা ততদিন পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না, যতদিন পর্যন্ত সেই ভব্য প্রাসাদ নির্মাণ না হবে, যে ভব্য প্রাসাদের স্বপ্ন আমরা দেখেছি।

জামাস্প-এর আত্মসমর্পণের সংবাদ পেতেই তস্পোনবাসীর যেন দুঃস্বপ্ন ভঙ্গ হয়। হেফতাল সৈনিকদের কটা রঙের দাড়িওয়ালা মুখ দেখে জনসাধারণ যদিও ভয় পেয়েছিল, কিন্তু কোথাও শান্তিভঙ্গ হয়নি।

নিজের হাতকে শৃঙ্খলিত করে জামাস্প যখন কবাতের সামনে এসে বন্দীত্ব স্বীকার করল। কবাত এগিয়ে এসে নিজের হাতে ভাইয়ের বন্ধন খুলে দিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। লোক সাধু সাধু রবে শতমুখে কবাতের প্রশংসা করতে থাকে। কিন্তু তস্পোনবাসী জীবনে কখনও এমনভাবে আশ্চর্য হয়নি যখন তারা স্বচক্ষে দেখল যে, কবাত মহাপুরোহিত আতুরপতকেও ক্ষমা করেছে।

দ্বিতীয়বার কবাত সিংহাসনে আরূঢ় হলেন। সমগ্র ইরানে সেই সঙ্গে অখণ্ড শান্তিস্থাপন হল। বলপূর্বক স্থাপন করা শান্তি নয়। স্বেচ্ছায় আসা শান্তি। কিছু স্বার্থপরতার হানি হল, কিছু কিছু অত্যাচারীকে তাদের অত্যাচারের ক্ষেত্র ইরানের বাইরে সরিয়ে নিতে হল। কিন্তু যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল, সেই আগুন আর রক্তের বন্যা বইল না দেশের মধ্যে কোথাও।

কবাতের শাসন এবং অন্দর্জগরের মধুর স্বপ্নের স্থাপনার প্রথম পর্ব এর চেয়ে সুখদায়ক আর কি হতে পারে?

অষ্টবিংশ অধ্যায়

॥ কালোমেঘ খৃঃ ৫১৬ ॥

শরতের পাঁচ মাস পর বসন্তও গ্রীষ্মে পরিণত হতে চলেছে আঙুরলতায় তার পাতার মত সবুজ আঙুরগুচ্ছ ঝুলে রয়েছে। আপেলের শরীরে কোথাও কোথাও লাল আভা দেখা দিয়েছে। ডালে ডালে রং-বিরঙের গোলাপের মেলা বসেছে ফুলের বাগানে।

বাগানের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদীর ধারা। এখানে বসে নদীর তলদর্শী নীল জলের দিকে তাকালে ভাবুক মনে কতই না চিন্তার উদয় হয়। সন্ধ্যার কিছু আগে প্রতীচীকে অরুণ রাগে রঞ্জিত করে সূর্যের রোহিত মণ্ডল ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়, অন্য দিকে পুবের আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের আগমনের আভাস পাওয়া যায়। পাখীরা নিজ নিজ বাসায় ফিরে এসে রাত্রির মৌনতার আগে কলবর করছে।

উদ্যানের ভিতরে একটি সুন্দর ভবনের দিকে নরনারী অনেকেই যাওয়া আসা করছে। এরা সকলেই রক্তবসনা নয়। অনেক নর-নারী সাদা বা অন্য চলিত-পোষাকেও ঘোরাফেরা করছে।

উদ্যানের এক কোণে জলের দিকে সবুজ ঘাসের উপর সিয়াবখ্‌শ আর মিত্রবর্মা অনেকক্ষণ বসে আছে। সূর্যাস্তের পরেও ওদের ওঠবার যেন কোনও তাড়া নেই! কয়েক বৎসর থেকে দুজনের একসঙ্গে এতক্ষণ বসে সময় কাটাবার অবসর হয়নি। সিয়াবখ্‌শ বিগত পনের বৎসরের স্মৃতির খাতা খুলে ধরে। মিত্রবর্মা যদিও সিয়াবখ্‌শকে দোষারোপ করেছে কিন্তু সিয়াবখ্‌শ হাসতে হাসতে নিজ প্রিয় মিত্রকে বললো,—মিত্র তুমি মনে করো না যে, আমার কখনও ইচ্ছা হয়নি এমনি দুজনে বসে এক জায়গায় কিছুক্ষণ সময়

কাটাই, কিন্তু আমাদের পশ্চিম ও উত্তরের পড়শীরা সে অবসর দেয়নি।

—পশ্চিমী শত্রু ত ইরানের চিরদিনের কাঁটা হয়ে আছে।

—কাঁটা বটে, কিন্তু আমাদের পশ্চিম সীমা কোনও একসময় সবচেয়ে সুরক্ষিত সীমা ছিল। যবন ও আমাদের দেশের মাঝে বিরাট সমুদ্র ছিল তখন।

—যে সমুদ্র অলিকস্সুন্দর পার হয়েছিল ?

—হ্যাঁ, শুধু পার হয় নি। অলিকস্সুন্দর সমুদ্রের এপারের ভূ-ভাগকে জয় করে সেখানে অনেক নগর স্থাপন করেছিল, যেখানে লক্ষ লক্ষ যবন সৈনিক ও নাগরিক এসে স্থায়ী বসবাস করছে। এমনি করে আমাদের ভূমি আজ যবন ভূমিতে পরিণত হয়েছে। নইলে যবনদের উত্তরাধিকারী রোমকদের আক্রমণ করতে যেখানে দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র পার হয়ে আসতে হত, সেখানে রোমকরা আগে থেকে সমুদ্র পার হয়ে আমাদের পাশে এসে শক্ত হয়ে বসে আছে।

—স্বাভাবিক সীমা প্রতিরক্ষার জন্যেই বেশী সহায়ক হয়। ইরানের জন্যে ত ইতিহাসের বিধানই অন্যপ্রকার। কিন্তু এই বিধানকে কেবল ক্রুর বলা যায় না। স্বাভাবিক সীমা যদি অলঙ্ঘ্য হত, তাহলে এই জাতি আজ কূপমণ্ডুক হয়ে থাকতো। যুদ্ধ অথবা মৈত্রী যে কোনও উপায়ে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের পারস্পরিক সম্পর্কই মানবকে উন্নত করতে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়ে থাকে।

—কিন্তু যুদ্ধ মানুষকে নৃশংস করে তোলে। তুমি রোমক নগরী অমিদা'র যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চয় বলতে চাইছ।

—হ্যাঁ, রোমকদের উপর সেই আমাদের সবচেয়ে বড় বিজয় ছিল। তবে সে বিজয়ের জন্যে আমাদের মূল্য দিতে হয়েছিল যথেষ্ট। সে বিজয় থিওদোসিয়ার মত নয়। তিক্রার ধারার সহায়তায় একদিন এই বিশাল নগর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল, সেই সঙ্গে এখানে রোমকদের

অজেয় দুর্গ ছিল। কৈসর-এর সবচেয়ে বীর যোদ্ধাদের এখানে একত্র করা হয়েছিল। আমাদের সেনাদের এত বড় ভীষণ বাধার সম্মুখীন কোথাও হতে হয়নি। অমিদার সে যুদ্ধের কাছে গজন্‌স্পদাতের যুদ্ধ খেলা বলে মনে হয়। সেই দুর্গের দ্বার ও প্রাকারের ওপার থেকে বর্ষার ধারার মত বাণ-বর্ষণ হতো। যখন আমরা দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করলাম, তখন নিজেদের চেয়ে অধিক সংখ্যক হেফতালী সেনাদের নিয়ন্ত্রণ করা খুবই অসাধ্য সাধন ছিল। তারা রাজপথ আর গলিপথ মানুষের মৃতদেহতে ভর্তি করে ফেলেছিল। তাই দেখে বৃদ্ধ মসীহী পুরোহিত শাহনশাহের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল তাই অমিদা তোমাদের হাতে এসেছে, কিন্তু এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের আর কি প্রয়োজন? শাহনশাহ তক্ষুনি সেই অত্যাচার বন্ধ করালেন। হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষকে দাস বানিয়ে দেশত্যাগ করাতে বাধ্য করল। আমাদের সেনাপতি গুলনার এই যুদ্ধে শুধু অদ্ভুত বীরত্বই দেখায়নি, সহৃদয়তাপূর্ণ শান্তিস্থাপন করতে তার চমৎকার যোগ্যতা ছিল।

—হুঁ, অমিদা বিজয়ের পর কৈসরের সঙ্গে সাত বৎসরের সন্ধি করে ভালই করা হয়েছিল।

—আমাদের বাধ্য করেছিল তারা। রোমকরা শুধু অস্ত্র-শস্ত্রেই নয় বুদ্ধির যুদ্ধও চালিয়েছিল আমাদের বিরুদ্ধে। ওরা ভেবেছিল যদি হেফতালী প্রতিশ্রুত অর্থ না পায়, তাহলে তারা নিশ্চয় ইরানে এসে লুঠ-পাট আরম্ভ করে দেবে। সে জন্যে তারা নিজেরাও তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। ফলে রোমকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হল। তারপর অমিদা যখন বিজয় হল, তখন রোমকরা উত্তরের হুনিক যাযাবরদের উস্কানি দিয়ে দিল। অগত্যা আমরা তাড়াতাড়ি সন্ধি করতে বাধ্য হলাম। যাযাবর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং দুর্জয় শত্রু।

—তার কারণ তারা ত মানুষের দল নয়, পতঙ্গের ঝাঁক। ওদের সংহার করা খুব কঠিন।

—মানুষ সভ্য হয়ে নিজেদের জন্যে কত রকম নিয়ম সংযম করে থাকে, কিন্তু ঐ মরুভূমির যাযাবর জাতি, সে সকল নিয়ম সংযমের ধার ধারে না। উত্তরের হুনদের দমন করে আমরা মনে করেছিলাম আর কোন ভয় নেই। কিন্তু গত বৎসর (খ্রীঃ ৫৯৫) আর একদল হুন কোথা থেকে উদয় হল ভগবান জানেন। তারা উত্তরের হিমবন্ত (কোহকাফ) থেকে ভীষণ লুঠপাট, হত্যালীলা চালাতে চালাতে একেবারে তিক্রার উত্তর তট পর্যন্ত এসে হাজির হল। আসার পথে কত নগর, কত গ্রাম যে ধ্বংস করে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই।

—নিশ্চয় তারা উত্তরের কোনও অজানা স্থানে লুকনো ছিল।

—হ্যাঁ, অজ্ঞাত হলেও অন্তত এটা জানা কথা যে, উত্তরে ঘুমন্ত অসভ্য জাতি বাস করে। এদের স্বাভাবিক প্রকৃতি হল অকারণ আক্রমণ, লুঠপাট এবং পারস্পরিক যুদ্ধ। কিন্তু পরাজিত হয়ে এরা সর্বদাই দক্ষিণ দিকে পলায়ন করে থাকে।

—কেবল ইরানের সকল উত্তর সীমান্তই এদের ভয় করে, তা নয় হিন্দ দেশও এদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায় না। তাছাড়া রোমক জাতিও তাদের উত্তর সীমান্তের এই ভয়ঙ্কর জাতকে সর্বদা ভয় করে থাকে।

এমনি দুই বন্ধুর আলোচনা বহুক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে। আকাশের বুকে তখন পূর্ণচন্দ্র উদয় হয়েছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ওদের মুখে এসে পড়ে।

এমন সময় সর্বশ্বেতা সম্বিক ধীরে ধীরে ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়। একবার দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ধীর স্বরে বললো,—আমি দুই বন্ধুর নিভৃত আলোচনায় বাধা দিতে চাই না।

· মিত্রবর্মা মহারানীর দিকে তাকিয়ে বললো,—ওঃ মহারানী!

স্বাগতম! মিত্রবর্মা উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই সিয়াবখ্‌শ মাথা নিচু করে অভিবাদন করে।

—তোমাদের মহারানীর কথা ছেড়ে দাও। এখন আমি এক পূর্ব-পরিচিতা তোমাদের কাছে এসেছি।

—বেশ, এসো আমাদের পূর্বসাথী চন্দ্রিকা। এখানে এমন কোনও গোপন কথা হচ্ছে না, যা আমাদের সাথীকে লুকাতে হবে। হ্যাঁ! আমাদের মধ্যে অমিদা-বিজয়ের কথা হচ্ছিল।

—উঃ, সে এক দুঃখময় কাহিনী। অমিদা বিজয় আমাদের নগরীর যথেষ্ট পরিবর্তন করেছে।

—হুঁ! দলে দলে রোমক দাসী আমাদের নগরে এসেছিল, এবং তাদের শ্বেত-কান্তিতে আমাদের মহল সাদা হয়ে গিয়েছিল, তাই নয়? বললো মিত্রবর্মা।

—না, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। দাসত্ব মনুষ্যত্বের চরম কলঙ্ক। আমাদের অন্দর্জগর এতদিন ধরে কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রেই সেই প্রথার উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়েছেন। আমি বলছিলাম স্নানাগারগুলির কথা।

সিয়াবখ্‌শ বললো,—স্নানাগার শারীরিক স্বচ্ছতার জন্যে বিশেষ প্রয়োজন। শীতের ভয়ে আমাদের নাগরিকরা মাসের পর মাস স্নান করে না। এখন এই স্নানাগারের কল্যাণে গরম জলে স্নান করা ত সুখের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও আমাদের পুরোহিতরা একে অধর্ম বলেন।

—ধর্মের বিরুদ্ধ? বিস্মিত হয়ে তাকায় মিত্রবর্মা। হ্যাঁ, কোনও এক ধর্মে আছে শুনেছি, তারা প্রাণধারী মনে করে জলে স্নান করা পাপ মনে করে। কিন্তু কী আশ্চর্য, শারীরিক শুদ্ধতা বা স্বচ্ছন্দতাকে কেমন করে এরা ধর্মের বিরুদ্ধ ভাবে।

সম্বিক মিত্রবর্মার কথার উত্তরে বলে,—আমাদের ধর্মাচার্যরা কিন্তু জলকে প্রাণধারী বলে না। তারা বলে অগ্নির মত জলও দেবতা,

অতএব জলে স্নান করলে পাপ হবে। কবাতকে অধর্মী বলার এও একটা বড় কারণ।

—সত্যিই অদ্ভুত। গরম জলে স্নান করলে দেবতা মলিন হয়ে যাবে, আগুনে মড়া পোড়ালে দেবতা অশুদ্ধ হয়ে যাবে। এমন ধর্মের কীই বা করা যায়। বললো সিয়াবখ্‌শ।

—হ্যাঁ মিত্র। তোমার বোধহয় জানা নেই, সিয়াবখ্‌শ নিজের পত্নীকে এখানকার ধর্মের নিয়মানুযায়ী কাক-শকুনের মুখে ফেলে না দিয়ে মাটির নিচেয় কবর দিয়েছিল। অমনি আচার্যেরা গোপনে গোপনে তার বদনাম করতে আরম্ভ করলো।

—মিত্র, আমি কিন্তু হিন্দু, শক, রোমক বা তাদের পড়শী জাতিদের আগুনে শবদেহ জ্বালিয়ে দেওয়া খুবই পছন্দ করি। যদি আগুনে জ্বালালে অগ্নিদেবতা অপবিত্র হয়ে যায়, তাহলে দখ্‌মার মধ্যে মড়াকে ফেলে পচবার সুযোগ দিয়ে বায়ু দেবতাকে অপবিত্র করা হয় না? দখ্‌মার মধ্যে দিনের পর দিন একটা মড়া পচতে থাকবে আর শিয়াল, কুকুরে শকুনে তাকে টেনে ছিঁড়ে খাবে। সেই দুর্গন্ধে বায়ুদেবতার সবচেয়ে বেশী কষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু এই ধর্মাচার্যদের বোঝাবে কে?

—এরা ত বুদ্ধিকে বেচে খেয়েছে। ওদের আর বোঝাতে হবে না।

—না সখিক। ওরা বুদ্ধি বিক্রি করে খায়নি। বললো শিয়াবখ্‌শ, প্রধান পুরোহিত স্বয়ং নির্বোধ নন। তিনি অন্যদের মূর্খ করে রেখে নিজের কাজ হাসিল করতে চান। ধর্ম মানুষের পরম্পরাগত ধারণা এবং শ্রদ্ধার হাতিয়ার মাত্র। যার দ্বারা ওরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা করে আসছে চিরকাল।

—তাহলে আমরা ত তাড়াতাড়ি কোনও কাজ করিনি? বলে মিত্রবর্মা।

—সে প্রশ্ন নয় মিত্র। ধর্মাচার্য নিজ প্রভাব কমাতে চান না।

কারণ ওরা একমাত্র ধর্মের প্রভাবেই সামন্তদের মত সুখ-বিলাস ভোগ করছে। মহাপুরোহিত গুলনাজের চাল ভীষণ রহস্যপূর্ণ। অনেক জলের মাছ তিনি। নবানতুখ্‌ত-এর পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি কেমন অপলক দৃষ্টি রেখেছেন দেখছ না ?

—কারণ গুলনাজ জানে যে খুসরোর মাতা নবানতুখ্‌ত-এর প্রতি কবাতের বিশেষ পক্ষপাত আছে।

—না, আমার বিশ্বাস হয় না। সম্বিক দৃঢ়স্বরে বললো।

—তার কারণ তুমি কবাতের পত্নী নও শুধু, তার সহোদরা ভগ্নীও বটে। তুমিই অদ্ভুত সাহস দেখিয়ে কবাতকে বিস্মৃতির কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিলে।

—সে কাজে তোমারও হাত ছিল অনেকখানি।

—সে যাই হোক, সিয়াবখ্‌শ-এর সন্দেহ ভুল হতে পারে না সম্বিক। এখন পর্যন্ত কবাত হয়ত বেশিদূর যেতে পারেনি। অতএব এখন থেকেই ধর্মের পুরোহিত ও সামন্তদের কূটনীতির হাত থেকে কবাতকে সাবধান করা বিশেষ প্রয়োজন।

—আর কাবুস ? সম্বিক প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকায়।

—তার জন্যে চিন্তা করো না। অন্দর্জগরের শিক্ষা তরুণ কুমারকে সর্বগুণসম্পন্ন করে গড়ে তুলেছে। নিজের জ্যেষ্ঠ সন্তানের উপর শাহ গর্বিত। আজ সমগ্র দেশময় জলাশয়, খাল, রাজপথ, সেতু, চিকিৎসালয়, শিক্ষালয়, নতুন শহরের পত্তন প্রভৃতির কাজে শাহ সব কিছু ভুলে গেছে। আর তার কাজের ডান হাত হয়েছে তরুণ কুমার কাবুস। কিন্তু ঐ ধর্মের আচার্য নামধারী জীবেরা এখনও নিরাশ হয়নি মনে রেখো। বললো মিত্রবর্মা। সিয়াবখ্‌শ কিছু চিন্তা করে বলে,—আর যতদিন পর্যন্ত শাহ অন্দর্জগরের প্রদর্শিত পথে অচল থাকবে ততদিন কোনও ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু তবুও আমাদের সর্বদা সবদিক বিচার করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সাবধান থাকতে হবে।

উনত্রিংশ অধ্যায়

॥ অন্তিম লক্ষণ ॥

প্রধান পরামর্শদাতা ও মহাসেনাপতি সিয়াবখ্‌শ-এর ভব্য প্রাসাদ-এর বাহ্যিক আড়ম্বর, রং-রূপ সব যেমন ছিল তেমনি আছে। মহাদ্বার পথে ভিতরে যেতেই ছোট ঝাউ গাছের সারি, তার পাশে গোলাপ ও যুঁই-এর ঝাড় একের পর এক সাজানো। মাঝে মাঝে ফোয়ারা, তার পাশে আজও ময়ূর ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু চারিদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। যেন কোনও আশঙ্কিত ভয়ের ছায়া সর্বত্র নীরবতারূপে বিরাজ করছে।

বাইরে উদাসী প্রাসাদের ভিতরটা আরও অধিক উদাসী মনে হয়। অন্তঃপুরের দাস-দাসী, পরিচারক-পরিচারিকা সকলেই আছে চলাফেরা করছে, কিন্তু কেউ মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করছে না। সকলেই সকলের মনের ভাষা সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করছে! যেন নিঃশ্বাস নিতেও ভয় করছে। মহাসেনাপতির দরবারকক্ষ শূন্য পড়ে আছে। অন্তঃপুরের এক নিভৃত কক্ষে সিয়াবখ্‌শ, মিত্রবর্মা এবং প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ইশাই-মহন্ত বাজান তিনজনে গোপন বার্তালাপে ব্যস্ত। বাজান সিয়াবখ্‌শ-এর কথার উত্তরে বললেন,—আমাদের প্রভু শাহনশাহ এখনও কোনও রাস্তা বের করতে চান।

—ভেড়ার দলের উপর সবকিছু অর্পণ করে রাস্তা বের করা যায় না। সে সব কথা আর এখন নয়, তবে সিয়াবখ্‌শ-এর হৃদয়ে ভয় বলে কোন বস্তুর স্থান নেই জানবেন।

—সে কথা সমগ্র ইরান জানে সেনাপতি!

—তাহলে আসুন, আমরা প্রাণ-মন খুলে আমাদের বিচারধারা প্রকাশ করি। আলোচনা করি এবং কোনও স্থির সিদ্ধান্তে

উপনীত হই। অনিষ্টের জন্যে আমি ভয় করি না, এবং আমাকে বা মিত্রবর্মাকে দিয়ে আপনার কোনও অনিষ্ট হবে না জানবেন। যদি কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে তার জন্যে দায়ী শাহনশাহের জরাগ্রস্ত বুদ্ধি।

—আমাদের দেশেও ঐ জরাগ্রস্ত বুদ্ধি এক অনর্থ ঘটিয়েছিল। বলে মিত্রবর্মা। হয়ত তোমরা আমাদের মহাকাব্যে রামায়ণের দশরথ ও পুত্র রামচন্দ্রের কাহিনী শুনেছ। সিয়াবখ্‌শ বললো,—হ্যাঁ, সেই কথারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এখানে। যুবরাজ-শাহ কাবুস শাহনশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তার যোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করবার মত আছে কেউ?

—না, কেউ নয়।

—হ্যাঁ, একথা হয়ত বলতে পারে, সে অন্দর্জগরের অধীনে থেকে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছে, অতএব তার উপর দেরেস্তদীনের প্রভাব কিছুটা বেশি। কিন্তু এ অভিযোগ শাহনশাহ করতে পারেন না। কারণ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শাহনশাহের কাছে কে পাঠিয়েছিল?

—পিতা। বললো বাজান।

—একা পিতা নয়, তার মাতাও। যিনি শুধু শাহনশাহের পত্নী নন, সহোদরা। সাসানী সিংহাসনে কাবুসের সর্বাগ্রাধিকার। তার শিরায় শিরায় মাতা ও পিতা উভয় দিক থেকে অর্দশীর-বাবকানের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। যদিও গুরুদেবের কৃপায় রক্তের পবিত্রতা বিষয়ক প্রভৃতি সংস্কার থেকে আমি মুক্ত হতে পেরেছি। কিন্তু ধর্মাচার্য মোবিদান-মোবিদ গুলনাজের চিন্তা করা উচিত। কারণ তিনিই ত কথায় কথায় রক্তের পবিত্রতার দোহাই দিয়ে থাকেন।

—সবই ওদের ফন্দিবাজী বা কার্যোদ্ধারের দোহাই, একথা বলতে তোমাদের সামনে আজ আমার সঙ্কোচ নেই, ভাই। বললো বাজান। কথার মাঝে মিত্রবর্মা বলে ওঠে—

—হ্যাঁ। আজ মজদকীদের উপর গুলনাজের কোপদৃষ্টি আছে, কাল আপনার উপর আসবে, এতে সন্দেহের কি আছে?

—সে কথা আমি জানি। বললো বাজান। বেশ কিছুদিন থেকে অর্মনী ও ইব্রীদের মজদ্‌য়স্নী ধর্মে ফিরে আসার জন্যে চাপ দেওয়া হচ্ছে।

—কাবুস যদি কবাতের একজন সাধারণ পত্নীরও পুত্র হত, তাহলেও তার উপর আমার এতখানি সহানুভূতি থাকতো। কারণ আমি গুণকে প্রাধান্য দিই। তাছাড়া কাবুস কোন্ মাতার পুত্র?

—সম্বিক-এর। শাহের নিজের সহোদরার।

—তাহলে ভেবে দেখুন। ভাইয়ের জন্যে জীবন বিপন্ন করে সম্বিক যে কাজ করেছে, আজকের পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। স্ত্রী হয়ে সম্বিকের প্রাণোৎসর্গ ও সাহসের কাছে আমরা কিছুই নই, তোমার কি মত মিত্র?

—ঠিক তাই। বললো মিত্রবর্মা।

—আর আজ অবহরশহরের সেই স্ত্রীর জন্যে কাবুসের বলিদান হচ্ছে। এটা যদিও আমার মনের ভাব। তবে ওদের ইচ্ছার বন্যায় সিয়াবখ্‌শকে ভাসিয়ে দিতে পারবে না এটা ঠিক। রোম-এর কৈসর খুসরোকে নিজ পুত্র বলে স্বীকার করেনি এতে আমার কোনও হাত নেই, না আমি জানতাম কিছু। কিন্তু সোরন মিথ্যে করে শাহের কানে আমার নামে মন্ত্রণা দিয়েছে, যে আমিই এসব করিয়েছি।

—আমি সবই জানি ভাই। বললো বাজান। কোনও শুভকাজে অন্তর্ঘাতী কাজ করবার মানুষ সিয়াবখ্‌শ নয়, একথা সূর্যের মত সত্য। কৈসর জুস্তীনকে বারণ করেছে ইরানের মন্ত্রী প্রোক্লোস। সেই যত কু-মন্ত্রণার মূল।

—তাহলে একজন সামান্য মন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করে শাহনশাহ কৈসরের প্রত্যাখ্যানের জন্যে যদি আমাকে দোষী বলে ভাবতে পারেন, তারপরও কি করে বলছেন, শাহ অন্য রাস্তায় চলতে রাজী আছেন?

—বলছি, কারণ তিনি এখনও বীর সিয়াবখ্‌শকে ভোলেন নি। এবার সিয়াবখ্‌শ-এর মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে।

—শুধু শোবার সময়েই মনে পড়ে। তাছাড়া বাকী সমস্ত সময়ে তার মন থেকে সিয়াবখ্‌শ বিস্মৃত হয়েছে। এখন তার কেবল একটি মাত্র চিন্তা, কেমন করে জ্যেষ্ঠপুত্র কাবুস ও মধ্যমপুত্র যমকে বঞ্চিত করে কনিষ্ঠপুত্র খুসরোকে সিংহাসনে বসাতে পারেন। সেই রাস্তায় যেই বাধা দেবে, সে শাহের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে। বলতে বলতে সিয়াবখ্‌শ-এর চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করে। বাজান সিয়াবখ্‌শ-এর যুক্তিতে এমন প্রভাবিত হয়েছেন যে তার আর কিছুই বলবার মত মনে আসে না, তাই আবার তার কথার পুনরুক্তি করতে বাধ্য হন।

—তবুও শাহ কোনও রাস্তা বের করতে ইচ্ছুক।

—অসম্ভব। এই ইচ্ছা তার শক্তির বহির্ভূত। আমার নিজের জন্যে কোন অনুতাপ হয় না। মৃত্যুই জীবনের মূল্য বলে জানি। পরিতাপ শুধু এই রইল, আমরা সকলে একদিন এই মাটির বুকে যে স্বর্গের স্থাপনা করতে স্বপ্ন দেখেছিলাম, শুধু স্বপ্ন নয় তার অঙ্কুর পর্যন্ত নিজেরা সৃষ্টি করেছিলাম, আজ সেই অঙ্কুরকে আমরাই পদদলিত করতে চলেছি।

—কিন্তু সত্যের অঙ্কুর কখনই পদদলিত হয় না বন্ধু। বলে মিত্রবর্মা। একবার ভূমির মধ্যে তার শিকড় ঢুকে গেলে সে আবার একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই।

—অন্দর্জগরের সেই কথাই আমাকে আরও দৃঢ়তা প্রদান করে। মানবমাত্রেরই বন্ধুতা এবং সমতার ভাব শুধু মানবজগতেই নয় বস্তুজগতে স্থাপনাই একমাত্র সুখের পথ।

এমন সময় একদল অশ্বারোহী সৈনিক মহাদ্বার পথে প্রাসাদের এলাকায় প্রবেশ করে। পাশের জানালা পথে তাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সিয়াবখ্‌শ বাজানকে বললো,—বন্ধু বাজান! ঐ দেখুন

রাস্তা। আমাদের শাহনশাহ আমার জন্যে ঐ রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন। এর কোনও প্রয়োজনই ছিল না। আমি এই মহল ছেড়ে পালিয়েও যাচ্ছিলাম না। অথবা অন্দর্জগর আমাকে গৃহযুদ্ধ শুরু করবার জন্যে আদেশও করেন নি।

*   *   *

মহাপুরোহিত গুলনাজ আজ প্রধান ন্যায়াধীশের পদ অলঙ্কৃত করে বসেছেন ন্যায়ালয়ে। তার পাশে অন্যান্য আচার্য, সামন্ত প্রভৃতি অন্যান্য উচ্চ পদাধিকারীরা বসেছেন। বিশেষ একটি স্থানে সামন্ত সোরন উপবেশন করেছেন। এমন সময় শৃঙ্খলিত অবস্থায় সিয়াবখ্‌শকে আনা হল বিচারকের সামনে। সকলে তার দিকে তাকিয়ে দেখল। সিয়াবখশ-এর চেহারার কোথাও এতটুকু অনুতাপ, ভয় বা দয়া প্রার্থনার চিহ্নমাত্র নেই। সিয়াবখ্‌শ-এর গৌরবর্ণ ভব্য মুখে এক অদ্ভুত আভামণ্ডল পরিস্ফুট হয়ে আছে। তার সৌম্য, বিরাট চোখ দুটিতে একপ্রকার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা, ধীর পদক্ষেপ। গুলনাজ সিয়াবখ্‌শকে স্বাগত জানিয়ে আসন গ্রহণ করতে বলেন, কিন্তু তক্ষুনি মন্ত্রী মহাশয় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—পতিত ও অপরাধীকে আসন দেওয়া হবে না।

—পতিত এবং অপরাধী ? হাসতে হাসতে বললো সিয়াবখ্‌শ। গুলনাজ মহামন্ত্রীর আপত্তির কথা অগ্রাহ্য করে বললেন,—

—যাই হোক, সিয়াবখ্‌শ সামন্ত। আমাদের শাহনশাহ এখনও সিয়াবখ্‌শকে তার জন্মগত পদ থেকে চ্যুত করেন নি।

সিয়াবখ্‌শ অন্য কারো কথা বলবার অবসর না দিয়ে সেইখানেই বিছানো ফরাসের উপর বসে পড়ে।

—আমি সামন্তের পদমর্যাদা চাই না, আজ আমি আনন্দিত যে, আমি শেষ সময়ে ইরানের মহাত্মাদের সামনে একজন সাধারণ জন হিসেবে আনীত হয়েছি।

—এবং অপরাধী হিসেবেও আনা হয়েছে। গলা আরও উঁচু করে বলেন মহামন্ত্রী।

—অপরাধী? হ্যাঁ, আজ আমি আপনাদের বলতে সুযোগ পেয়েছি, কে অপরাধী।

—তুমি মজদয়স্নী ধর্মের অবহেলা করেছ। বললো মহামন্ত্রী।

—"তুই করেছিস" বলো সোরন। আজ তোমার কোনও কটূক্তি আমাকে উত্তেজিত করতে পারবে না। মজদয়স্নী ধর্মের ততখানি অবহেলা আমি করিনি, যতখানি তোমরা সকল সামন্ত, পুরোহিত ও উচ্চবর্গের লোকেরা প্রতি পদে পদে করছো।

মহামন্ত্রী আরও গরম হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গুলনাজ তাকে নিরস্ত হতে ইশারা করে বললেন,—ন্যায় এবং ব্যবস্থার অনুসরণ করাই আমাদের অর্থাৎ ইরানবাসীদের জাতীয় ধর্ম। আমাদের নিজেদের মধ্যে যদিও কোনও মতভেদ থেকে থাকে, কিন্তু এখানে আমরা ন্যায়াসনের সামনে। আমাদের কর্তব্য হল, সত্যিই ইরানের অর্তস্তারানসালার (মহা সেনাপতি) সিয়াবখ্শ ন্যায়ানুসারে অপরাধী কি না।

—কথার মাঝে কথা বলবার জন্যে ক্ষমা করবেন। আমি এখন সামন্তও নই এবং মহাসেনাপতিও নই। কৃপা করে আমাকে কেবল সিয়াবখ্শ নামে অভিহিত করলেই আমি বাধিত হব।

—আচ্ছা, সেনাপতি! আমরা জানতে চাই আপনি মজদয়স্নী ধর্মের অবহেলা করেছেন কি না। আপনি কি আপনার মৃত পত্নীকে মজদয়স্নী প্রথা অনুসারে দখ্মাতে না রেখে মাটির নিচেয় প্রোথিত করেছেন?

—আমার বাস্তবিক ইচ্ছা তা ছিল না। নম্রস্বরে জবাব দেয় সিয়াবখ্শ।

—মিথ্যাবাদী! মিথ্যা বলে প্রাণ বাঁচাতে চাও? চীৎকার

করে বলে ওঠেন মহামন্ত্রী। সিয়াবখ্‌শ নিজের মুখমুদ্রা বিকৃত না করে স্পষ্ট স্বরে বলে।

—মিথ্যা বলার অভ্যাস অন্য কারও হবে। আমাকে নিজের কথা শেষ করতে দাও। দখ্‌মায় শব রেখে পশু-পক্ষীদের দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করতে এবং সেই গলিত শবের দুর্গন্ধের সাহায্যে বায়ুকে দূষিত করা অপেক্ষা মাটির নিচেয় প্রোথিত করা উচিত মনে করেছিলাম।

—যেমন বিধর্মী ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা করে? বললো মহামন্ত্রী।

—কেননা এতে বায়ু দূষিত হয় না। কিন্তু আমি সবচেয়ে উচিত মনে করি হিন্দু এবং শকদের মত আগুনে পুড়িয়ে ফেলা।

—অর্থাৎ শবদাহ? বললেন গুলনাজ। এই প্রকারে অগ্নি-দেবতাকে অপবিত্র করাকে আপনি পাপ বলে মনে করেন না?

—অগ্নিদেবতা সকলের পাবক (পবিত্র কর্তা)। হিন্দুরা আমাদের অপেক্ষা কম ভক্তি করে না অগ্নিকে। পূজো করে তারাও। কিন্তু তারা শবকে অগ্নিতে জ্বালানো ধর্মপ্রথা বলে মানে।

—তুমি হিন্দু দেশের নও সিয়াবখ্‌শ। অথবা তুমি হিন্দু ধর্মেরও নও। কঠোর স্বরে বলেন গুলনাজ।

—কিন্তু আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন যে, মজদয়স্নী ধর্ম হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে সমীপবর্তী ধর্ম।

—হ্যাঁ, হিন্দুরা আমাদের মতই অগ্নি, বায়ু, জলকে পূজো করে। যদিও তারা তাদের অসুর না বলে দেবতা বলে, কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রভেদও রয়েছে।

—সেইজন্যেই অগ্নিকে অপবিত্র করবার প্রশ্নই আসে না।

মহামন্ত্রী এবার অধৈর্য হয়ে বলে ওঠেন।

—তুমি অপরাধ স্বীকার করছ কি না?

—আমি যাকে অন্যায় ভাবি না তাকে অপরাধ বলতে পারবো

না। আমার প্রার্থনা, আমার মৃত্যুর পর যেন আমার মৃতদেহকে আগুনে পোড়ানো হয়।

—অর্থাৎ সুযোগ পেলে তুমি শবদাহ করে অগ্নিকে অপবিত্র করবে!

—অসম্ভব! অগ্নি সকলের পাবক। তাকে অপবিত্র করবার ক্ষমতা কারো নেই।

—বেশ। তোমার কথায় প্রমাণ হল যে জর্থুস্ত্রী ধর্মের নিয়ম অবহেলা করে তুমি দখ্‌মায় শব রাখবার বিরোধী। আচ্ছা এবার বলো, তুমি মজদয়স্নী ধর্মের বাইরের ভগবান এবং তাদের নতুন নতুন প্রচারকদের পূজো করো?

—এক নয়, হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ এমন মহাত্মাদের পূজো করি আমি। যাদের মহাপুরোহিত এবং তার অনুগামীরা মানেন না। কিন্তু······

—থাক আর বলতে হবে না। বাধা দিয়ে বললেন মহামন্ত্রী। আপনারা শুনলেন ত?

—আরে শুনেই রাখো অন্তত আমি কেন বাইরের মহাপুরুষদের পূজো করি। যাদের দেওয়া অন্ন খেয়ে সকল পুরোহিত, সামন্ত আর ধনীরা মোটা হচ্ছে, তার জন্যে তাদের মুখে কৃতজ্ঞতার একটি শব্দও নেই। ইতিমধ্যে আর একজন পুরোহিত উঠে বসলেন।

—অপরাধী কৃষাণ ও মজুরদের পক্ষপাত করে।

—হ্যাঁ করি। কারণ তারাই সবচেয়ে বড় ভগবান। যাদের বিনা সহায়তায় তোমাদের সকল ভোগ, সকল শৃঙ্গার, সকল প্রাসাদ এবং সকলের ঠোঁট ও গালের লালিমা বিলুপ্ত হয়ে যায়। শোনো! এইসব লক্ষ লক্ষ ভগবানকে তোমরাই দাস ও নীচ করে রেখেছো। দীন-ধর্ম এবং দেবতাদের নামে শিষ্টাচার ও সদাচার-এর নামে তাদের পশুজীবন যাপন করাতে বাধ্য করেছো। কিন্তু কতদিন চলবে

তোমাদের এই ধাপ্পাবাজী? একদিন এর শেষ হবেই হবে। এবার গুলনাজ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বললেন,—

—বিধর্মীরা অর্থাৎ বেদীনরা যাকে ছল-কপট বলে, তাই আমাদের দেবাদিদেব অহুর্মজদার বিধান। অহুর্মজদার বেশী তুমি দীনকে জানতে পারো না। তিনি যদি উঁচু-নীচু ভেদ সৃষ্টি না করতেন, তাহলে সংসার চলতো না।

—সংসার খুব ভালোভাবে চলতো, কিন্তু অপরের লুঠ করে যে সংসার চলে থাকে, সেগুলি নিশ্চয় অচল হয়ে যেত। তবে আজ নয়তো কাল, তোমাদের সংসার ধ্বংস হবেই। হয়তো হাজার দু হাজার বৎসরও লাগবে, কিন্তু হবে নিশ্চয়। দুটি বাহু আর একটা মাথা, নিরানব্বুই জোড়া হাত আর নিরানব্বুইটা মাথাকে বেশীদিন ছল-চাতুরী করে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

—চুপ করো, বেদীন, পতিত। গর্জন করে ওঠে গুলনাজ।

—হ্যাঁ, আজ আমার বাণীকে চুপ করাবার ক্ষমতা তোমাদের আছে বটে, কিন্তু তোমরা মনে করো না, এ সিয়াবখ্শ-এর বাণী, এ মনে করো না তোমাদের মিথ্যা বগ (ভগবান)-এর বাণী। এ বাণী সেই লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি দেবতাদের বাণী যাদের তোমরা মানব থেকে পশু করে রেখেছ। আজ আমার মুখ দিয়ে যেমন করে ফুটে বেরিয়েছে, তেমনি একদিন তাদের লক্ষ-কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হবে।

—ব্যস, আর অধিক প্রয়োজন নেই। মজদয়স্নী ধর্ম অনুসারে অবুঝকে, ধর্ম বিদ্রোহীকে এক বৎসর সময় দেওয়া হচ্ছে তাকে চিন্তা করবার জন্যে। তুমি গ্রহণ করতে রাজী আছো? বললেন গুলনাজ।

—তোমাদের বঞ্চনা, অপবাদ শোনবার জন্যে আমি আর এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে চাই না। তোমাদের কাছে এমন কোনও সত্য নেই যাকে আমার সামনে রেখে এক বৎসরে আমার মতের পরিবর্তন করাতে পারো।

—শেষবার ভেবে দেখ। তোমার অপরাধের দণ্ড একমাত্র মৃত্যুদণ্ড।

—আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখিও না। যদিও জীবনকে আমি উপেক্ষা করি না। গুলনাজ! আজ তুমি তোমার জুয়াচুরিতে সফল হতে চলেছ। তবুও তুমি শেষ কথা জেনে রাখো। আজ যদি আমার বিশ্বাস থাকতো যে, আমার উদ্দেশ্যকে, আমার কর্তব্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তাহলে আমি নিশ্চয় বাঁচতাম, কিন্তু তোমার মত গুলনাজের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে নয়।

—অর্থাৎ ইরানের পবিত্র ভূমিতে তুমি অপবিত্রতা ছড়াতে? থুঃ, মহামন্ত্রী ঘৃণায় থুথু ফেললেন।

—আমি নই, সোরন। তোমার মত অহ্রিমানের (শয়তান) সন্তানরাই ইরানের পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করে রেখেছে। আমি শয়তানের শাসন দূর করে এখানে অহুর্মজ্‌দার শাসন স্থাপিত করতে চেয়েছিলাম। নরক সরিয়ে স্বর্গ আনতে চেয়েছিলাম ইরানের ভূমিতে, মুখে মুখে নয় কাজের মধ্য দিয়ে। তুমি সেই স্বর্গের একখণ্ড জমি দেখেছ নিজের চোখে। তুমিই দিহবগানের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলে একদিন, গুলনাজ, মাহপত।

—না, মিথ্যা কথা। সব মিথ্যা বলছ তুমি। বলেন মহামন্ত্রী।

—তুমি অস্বীকার করলেও, যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি আমাদের সেই গ্রাম, সেই বস্তির জীবনযাত্রাকে প্রশংসা না করে থাকতে পারে না।

—সেই গ্রামের আবার প্রশংসা? থুঃ, যেখানে নরকের কীটগুলি থাকে? যেখানকার সকল স্ত্রীরা বেশ্যা? সেখানকার সকল সন্তানই পিতৃপরিচয়হীন? থুঃ।

—ওকে যেতে দাও। বললেন গুলনাজ। মৃত্যুপথযাত্রীর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

—গুলনাজ! দেরেস্তদীন-এর উপর স্ত্রীদের বেশ্যাবৃত্তি করবার

অভিযোগের সদুত্তর অনেকবার তুমি পেয়েছ। সেখানকার একটি স্ত্রীও অর্থ, অন্ন বা বস্ত্রের বিনিময়ে শরীর দান করে না। সে কাজ করে তোমাদের অর্থাৎ সকল সামন্ত বা উচ্চবর্গের প্রতি ঘরে ঘরে।

গুলনাজ সৈনিককে আজ্ঞা দেয় বন্দীকে নিয়ে যেতে। বীর সিয়াবখ্‌শ-এর তেজোময়-বাণী তার পরেও বহুকাল ন্যায়ালয়ের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে গুঞ্জন করতো। শত্রুরাও এই নির্ভীক বীর পুরুষ সিংহের সাহসিকতার প্রশংসা করতে থাকে।

ত্রিংশ অধ্যায়

।। মধুর স্বপ্নের সমাপ্তি ।।

সময় ঃ—খ্রীঃ ৫২৯

তিক্রীর তটে আজ আবার বসন্ত ঋতু এসেছে। গাছে গাছে নবকিশলয় আর ফুলের মেলা বসেছে। হাল্কা বৃষ্টি তম্পোনকে ধুয়ে মুছে যেন আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছে। কিন্তু আজ তম্পোনে বসন্তোৎসব নয়। নতুন রংবেরং-এর পোষাকে সজ্জিত নরনারীকে উদ্যানের দিকেও যেতে দেখা যাচ্ছে না। নগরের পণ্যবীথিতে বাসন্তী সাজের ছোঁয়া লাগেনি এতটুকু। আগেকার বসন্তের মত তিক্রোর ধারা এবারও বিস্তৃত ও বেগবতী চালে মানব জগতের সুখ-দুঃখ ওঠা-নামাকে উপেক্ষা করে তার খেয়ালমত বয়ে চলেছে।

তম্পোনের এই উদাসীনতার অনেক কারণ আছে। দুই বৎসর আগে ইরান অনর্থক রোমের সঙ্গে ঝগড়া করে বসল। অর্মনী ও ইব্রী (গুর্জী) ধর্মাবলম্বীরা মজদয়স্নী ধর্ম ছেড়ে মসীহী (ইশাই) ধর্ম গ্রহণ করল তাতে কোনও প্রকার বলপ্রয়োগ হল না। দুটি দেশই সাসানী শাসনাধীন। জোর করে তাদের পৈতৃক ধর্মত্যাগ করানো অসম্ভব। উচ্চবর্গের লোকেরা জর্থুস্ত-এর উদার ধর্মকে এত সঙ্কুচিত করে ফেলেছে যে, অধিকাংশ জনতা, বিশেষত ইরানী জনতা যেন তার চাপে পড়ে দম বন্ধ হয়ে ছটফট করতে থাকে। শাসনকর্তারা জন্মগত উচ্চ-নীচ ভেদ-ভাবকে এত বাড়িয়ে দিয়েছিল, লোক পদে পদে নিজেদের বঞ্চিত ও অপমানিত মনে করতে লাগলো।

অর্মনী ও ইব্রীয়দের কাছে মসীহী ধর্ম অধিক উদার বলে মনে হল। তারা নিজর জাতি মধ্যে সমতাভাব বিস্তার করতে লাগলো। মসীহী ধর্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তারা মজদয়স্নী রীতি-রেওয়াজ ছেড়ে

দিল। ভালো-মন্দ সকল উৎসব ত্যাগ করল। শবদেহকে দখ্‌মাতে রেখে পশুপক্ষীদের দ্বারা খাওয়ানোর বদলে মাটিতে পুঁতে রাখতে আরম্ভ করল। কবাত আবার দখ্‌মার প্রচলন করতে চেয়েছিল, কিন্তু ইব্রী রাজা গুর্জীন তাঁর মসীহী বন্ধু রোমক কৈসর জুস্তীনিয়নের কাছে সাহায্য চাইলেন। ফলে ইরান ও বিজন্তিয়ন-এর মধ্যে ধর্মের জন্যে যুদ্ধ লেগে গেল। কিন্তু শীঘ্রই ইরানকে নিজ কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপ করতে হল।

দুই বৎসর পরে আজও তম্পোন সেই আঘাত ভুলতে পারেনি। কৈসর নিজের বিজয়ের গর্বে বুক ফুলিয়ে নিজেকে সারা মসীহী জগতের ত্রাণত্রাতা ধর্মরাজ বলে ঘোষণা করলেন। এই সময় সকল মসীহী জগত জুস্তীনিয়নের জয়গান করতে থাকে। বীর জুস্তিনের ভ্রাতুষ্পুত্র জুস্তীনিয়ন নিজের ধর্মপ্রাণতা বাড়িয়ে দেখবার জন্যে এই বৎসরেই বিগত সহস্র বৎসর যাবত চলে আসা নিয়ম বন্ধ করে গ্রীস (যবন) দেশের পিথাগোর, সুক্রাত, প্লাঁতো, অরিস্তাঁতিল আদি মহান দার্শনিকদের ও মনীষিদের লেখা সকল পুস্তক অধ্যয়ন নিষিদ্ধ করে দিলেন। তাদের সকল লেখা গ্রন্থ জ্বালিয়ে নষ্ট করে দিলেন। বিদ্যালয় বন্ধ করে দিলেন। ফলে দর্শনের অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা পালিয়ে ইরান ও অন্যান্য দেশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো। সমাজে সমতার প্রচারক মসীহী ধর্মের মধ্যেও আবার এমনি করে সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করলো।

অনেক যবন দার্শনিক শরণার্থী হয়ে তম্পোনে এসে পেঁাছলেন। কবাত গুন্দেশাপুরে তাদের একটি দর্শন বিদ্যালয় খোলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই বলে কবাতের আন্তরিক ইচ্ছা উদারনীতির অনুসরণ করার দিকে ছিল না। নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী রোমক কৈসরের কোপভাজন ব্যক্তিদের আশ্রয় মাত্র দেওয়া কবাতের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

বৃদ্ধ বয়সে কবাতের একই চিন্তা ছিল, কেমন করে খুসরোকে

সিংহাসনে বসাবেন। এই পথের সবচেয়ে বড় বাধার মধ্যে একজন সিয়াবখ্‌শকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র কাবুস এখনও পজশ্‌খার (তিব্রস্থান)-এর পার্বত্য প্রদেশ শাসন করছে। মধ্যমপুত্র যম খুবই বীর, বুদ্ধিমান ও জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু তার একটি চোখের জন্যে তাকে বিশেষ ভয় ছিল না। কাবুসের পক্ষ খুব দৃঢ় ও শক্তিশালী ছিল। তাদের সমর্থক মজ্‌দকী সিয়াবখ্‌শকে হত্যা করবার পরেও তারা অমিত বলশালী রয়েছে। তাই পিতার কাছে একদিন আব্দার করে খুসরো বললো,—আমার পথের বাধা কাবুস নয়, ঐ শয়তানের অনুচর মজ্‌দকীপন্থীরা। ওরা আমাকে একেবারেই দেখতে পারে না। সিয়াবখ্‌শ-এর হত্যার পর ওরা আমার ছায়াকেও ঘৃণা করে। পাপী মজ্‌দক যদিও শয়তান, কিন্তু ওরা অহিংস বলেই এখনও আমার প্রাণ বেঁচে আছে। তা না হলে ওরা জীবন বাজী রেখে খেলা করতে প্রসিদ্ধ।

কবাতের প্রশ্নের উত্তরে খুসরো গুলনাজের সম্মতি ও নীতি সামনে রেখে বললো,—

—মহাপুরোহিতের মত হল আমাদের এখন ছল ও কুটনীতির দ্বারা কাজ হাসিল করতে হবে। মজ্‌দকীরা এখনও এতখানি শক্তি রাখে যে, সামনা-সামনি ওদের প্রহার করে জয়লাভ করবার আশা কম।

কিন্তু কী সেই ছলনীতি, যে তার দ্বারা আমাদের জয়লাভের আশা করা যেতে পারে ?

—মজ্‌দকীদের শাস্ত্রার্থ করতে ডাকা হোক।

—শাস্ত্রে ওরা ভীষণ প্রবল। আমি অনেকবার দেখেছি ওদের প্রশ্নের উত্তর আমাদের পুরোহিত-আচার্য অথবা মসীহী-আচার্যরাও দিতে পারে না। ওরা ভীষণ শাস্ত্রপ্রেমী।

—সেই জন্যেই ত শাস্ত্রের নামে ওরা অনেক সংখ্যা আসবে।

—তারপর ?

—ওদের জানিয়ে দেওয়া হবে যে শাহনশাহ কবাত তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র কাবুসের হাতেই রাজ্যভার দিতে চান। তবে এই শাস্ত্রার্থে জয় পরাজয়ের উপরই সে সিদ্ধান্ত পাকা হওয়ার সুবিধা নির্ভর করছে।

—তাহলে তুমি কি সিংহাসন ছেড়ে দিতে চাও, খুসরো? না না, তা হতে পারে না।

—না পিতা। আমার গুরু গুলনাজ অতখানি মূর্খ নন। শাস্ত্রার্থ ত একটা ছলনামাত্র। এই পথে মজ্‌দকী নেতাদের নির্বিঘ্নে সংহার করবার সবচেয়ে বড় সুযোগ হবে।

কবাতের বুকের ভিতর যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। নিজের মনোভাব গোপন করতে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন—বেশ, যা ভালো বোঝ তাই করো। কবাত অনেকদূরে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে। এতদূরে, যেখান থেকে ফিরে আসা তার পক্ষে অসম্ভব।

* * * *

অন্দর্জগরের উদ্যানের শান্তি আজও তেমনি অখণ্ড। শাস্ত্রার্থের পরেই তাদের কাবুস সিংহাসন পাবে শুনে উদ্যানবাসী খুব খুশী। মজ্‌দকী বিদ্বানরা একে তাদের বামহস্তের খেলা মনে করেন। তবে এরমধ্যে কারও হৃদয় যদি শঙ্কাপূর্ণ থাকে, সে হল মিত্রবর্মা। সেদিন মিত্রবর্মা তার মতামত প্রকাশ করে অন্দর্জগরের সামনে।

—এটা একটা ভীষণ চাতুরী মনে হচ্ছে আমার কাছে।

—চাতুরী? প্রশ্ন করেন মজ্‌দক।

—হ্যাঁ।

—অর্থাৎ এই শাস্ত্রার্থের আড়ালে কোনও অশুভ ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে?

—হ্যাঁ। গুলনাজ আমাদের সর্বনাশের জন্য অনেক কু-চক্র তৈরী করে রেখেছে।

—নিশ্চয় থাকতে পারে। কিন্তু সত্যই আমাদের সাথী ও সম্বল। নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আমরা রক্তপাত করতে চাই না। মানবের

স্বাভাবিক মানবতা এবং সহৃদয়তার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। শত্রুতার দ্বারা শত্রুকে জয় করা যায় না।

—আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার মহান ব্যক্তিত্বকে আমি কায়মনোবাক্যে স্বীকার করি। কিন্তু কুটিলতা অথবা ক্রুরতাকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমার মনে হয় হেফতালী সৈনিকদের বিনা সহায়তায় আমরা কখনই এত বড় সাফল্যলাভ করতে পারতাম না।

—তুমি দূরের কথা চিন্তা করছ না মিত্র। চোখের সামনের সফলতা এবং নিষ্ফলতার দিকটাই দেখছ। তিন্-শ বৎসর আগে আমাদের গুরু মানীকে ও তার সহস্র সহস্র অনুগামীদের হত্যা করে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু বিলুপ্ত করতে পেরেছে কী?

—আমি জানি, আপনার এই বহুজনহিতায় ধর্ম লুপ্ত হতে পারে না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে কিছুদিনের জন্যে দাবিয়ে রাখা যায়।

—তুমি কি মনে কর সেই লক্ষ প্রাণের বলি বেকার হয়ে যাবে? না মিত্র। এই বলি সেই সার তৈরী করবে, যে সারকে আশ্রয় করে আবার আরও অধিক সবল অঙ্কুর জন্ম নেবে। এই বলি সাধারণ মানবকে উচ্চ মানব হবার প্রেরণা দেবে।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু আজ আপনার শিষ্য-শিষ্যাদের কি অবস্থা হবে?

—অবস্থা যেমন তাদের কাছেও লুকনো নেই, তেমনি তোমার আমার কাছেও। দেরেস্তদীন বলিদানের দীন (ধর্ম)। তুমিই ত বুদ্ধের কত জাতক কথা শুনিয়েছ। বোধিসত্ত্ব কত খুশী হতেন, যখন নিজের শরীরের বিনিময়ে তিনি কারও ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারতেন? চোখের সামনে হয়ত এই উৎসর্গকে নিরর্থক মনে হবে, কিন্তু দূর পর্যন্ত দেখলে দেখতে পাবে এর মহাফল নিশ্চিত রয়েছে।

—একথা সর্বথা নিরাশ হয়ে আত্মহত্যার মত লাগছে।

—তাহলে মহান উদ্দেশ্যের জন্যে চরম বলিদান হতে পারার আত্ম-প্রসাদের উপর তোমার বিশ্বাস নেই ? মনে মনে যদিও তুমি বিশ্বাস না রাখতে পারো, কিন্তু তোমার আচরণের ভিতর দিয়ে আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে কী করে আসছ ? আজ পর্যন্ত কোন কাজটাতে নিজের সুখের জন্যে তুমি পদে পদে তোমার জীবনকে বিপন্ন করেছ ? আমি জানি মিত্র ! আজ তুমি যা বলতে চাইছ, তা তোমার ও আমার জন্যে নয়। তোমার লক্ষ্য হল সেই লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নর-নারীদের উপর। যারা আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবার অপরাধে এই দাবাগ্নিতে জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। কিন্তু এর জন্যে করবার কিছুই নেই। বহুজন হিতের রাস্তায় ফুল বিছানো থাকে না। কাঁটা থাকে।

—সে ত প্রত্যক্ষ দেখছি।

মজ্দক মিত্রবর্মার পিঠে স্নেহপূর্ণ হাত রেখে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন,—তাহলে এও প্রত্যক্ষ মনে করো যে, এই বলিদানের ফল প্রত্যক্ষ হয়েই থাকবে। হয়ত আমাদের চোখের সামনে হবে না। কিন্তু আমাদের পরবর্তী পাঁচ-দশ-পুরুষ পরে হবেই হবে। আজ যদি আমরা এই বলি স্বীকার না করি, তাহলে দশ-বিশ কেন, শত পুরুষেও এই পশুজীবন মুক্ত হতে পারবে না।

* * *

আজও দরবার-কক্ষ জনমণ্ডলীতে পূর্ণ। সকলেই প্রতীক্ষা করছে সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শাহনশাহ কবাত চোখ ঝলসানো সিংহাসনে এসে বসলেন। দরবারে আজ সকলের বর্গানুসারে বসবার ব্যবস্থার কিছু রদ-বদল দেখা যাচ্ছে। কবাতের সামনে ডানদিকের আসনগুলিতে যথাক্রমে মহাপুরোহিত গুলনাজ, ও পুত্র বিস্মাহদাত,নেবশাপোরদাত অহুর্মজ্দ,আতুর ফরোগবগ, আতুর পত, আতুর মেহ্র, বখ্তঅফরীদ প্রভৃতি সামন্ত ও মন্ত্রীগণ বসেছেন। সেইখানেই শাহী চিকিৎসক মসীহী-কশাশ-বাজান বসেছিলেন। বাই এবং রামদাত পুত্র মজ্দক নিজ বিদ্বানমণ্ডলীর সঙ্গে অন্যপার্শ্বে

আসীন। শাহের আজ্ঞানুসারে গুলনাজ শাস্ত্রার্থ আরম্ভ করে প্রথম প্রশ্ন করেন,—

—প্রত্যেক স্ত্রীর বহু পুরুষের সঙ্গে খোলাখুলি সম্বন্ধ রাখাকে কেমন সদাচরণ বলা হয়? উত্তরে একজন মজ্‌দকী বিদ্বান বললেন,

—প্রত্যেক পুরুষের বহু স্ত্রীর সঙ্গে খোলাখুলি সম্বন্ধ রাখাই বা কেমন সদাচরণ? বিশেষত সেগুলি যখন অন্ন-বস্ত্রের বিনিময়ে হয়।

কথা শেষ হবার আগেই সকলে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল শাহর সিংহাসন শূন্য। সামনের পরদা ধীরে ধীরে এসে সিংহাসনের সামনে ঢেকে গেল। এমন সময় শত শত সৈনিক মজ্‌দক ও তার অনুগামীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের কোনও কিছু বোঝবার আগেই বন্দী করে ফেলল। দরবারের উপরিভাগে উপবিষ্ট ভদ্রজন কৌতূহলী হয়ে এই দৃশ্য দেখে আনন্দলাভ করতে লাগলেন। সিংহাসন থেকে দূরে উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। কিন্তু সেনাধ্যক্ষের গম্ভীর গর্জন তাদের এক ধমকেই শান্ত করতে সমর্থ হয়।

তারপর শুরু হয় রক্ততাণ্ডব।

নগরের পথে পথে এ সময় রক্তের নদী বয়ে চলেছে। খুসরো সকল বড় বড় মজ্‌দকী নেতাদের দরবারের মধ্যে বন্দী করেছে। শাহী সৈনিক তথা সামন্ত, পুরোহিত, মন্ত্রীবর্গ, উচ্চ বর্ণের সকলে নিজ নিজ অনুচরসহ রাজধানীতে নেতাহীন মজ্‌দকীদের নরমেধ করছেন। খুসরো আদেশ দিয়েছে নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ নির্বিচারে মজ্‌দকপন্থীদের হত্যা করো। ওদের সব কিছু লুঠ করে নাও। ওদের পুস্তকাদি ও পূজাস্থান জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও।

*　　　　*　　　　*

আজ রাজপ্রাসাদের সামনের ময়দানে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অভিনয় হতে চলেছে। সেখানে এক বীভৎস উদ্যান তৈরী করা হয়েছে, যেখানে মজ্‌দক পন্থীদের মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত মাটির মধ্যে পুঁতে রাখা হয়েছে। তাদের নিশ্চল দুটি পা পত্রশাখাহীন বৃক্ষের মত

উপরের দিকে সারি সারি সোজা হয়ে আছে। খুসরো স্বয়ং বৃদ্ধ মজ্দককে সঙ্গে করে সেখানে এনে দাঁড় করিয়ে ওদের দেখিয়ে ব'ল,—দেখ শয়তানের বংশধর। এই তোমার স্বর্গের উদ্যান। তোমার অনুগামীরা নিজের শরীর দিয়ে তৈরী করেছে।

মজ্দক একবার তাকিয়ে দেখে অবিচলিতভাবে জবাব দেন,—

—খুসরো! তুমি ঠিকই বলেছ। আমি ও আমার ভাই সকল নিজেদের শরীর ভূমিসাৎ করেই ভূমির উপর স্বর্গ তৈরী করছি। তুমি ভেবেছ, ঐ হাজার হাজার মানুষকে মাটিতে পুঁতে ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করে সেই স্বর্গের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করছ? স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছ?

—হ্যাঁ, আমি মজ্দক পাপীদের হাত থেকে ইরানের পবিত্র ভূমিকে মুক্তি দিয়েছি।

—এখন তুমি নিতান্ত শিশু, শাহপুত্র। ইরান এবং সমস্ত জগৎ সংসারের ভূমি একদিন মুক্ত হবেই। কিন্তু তাদের সেই মুক্তিদাতা তুমি নও। সেই সময়ে তোমার নামও বিস্মৃতির অন্ধকারে লীন হয়ে যাবে। যদিও কারো কখনও মনে পড়ে, সে তোমার নাম মনে আসতেই থুথু ফেলবে। ক্রোধে অন্ধ খুসরো মজ্দকের মুখের উপর থুথু ফেলে বলে,—আর এখন আমি তোর মুখে থুথু দিচ্ছি পাপী।

—এই শরীর এখন তোমার হাতে, খুসরো। ইচ্ছা করলে থুথু ফেলতে পারো, অথবা ওদের মত মাটিতে পুতে দিতে পারো। কিন্তু সত্যের আওয়াজ শুনতেই হবে।

—সত্যের আওয়াজ? বামদাত পুত্র আর সত্য? ছিঃ।

—হ্যাঁ, দুইটি একই জায়গায় অসম্ভব। কিন্তু এই যে লক্ষ জীবনের রক্ত দিয়ে তুমি নিজের হাত লাল করেছ? এর জন্যে তোমার মনে কি একটুও গ্লানি হয় না?

—সাপের বাচ্চাকে পূর্ণ সাপ হবার আগেই ধ্বংস করা উচিত।

—ওদের মধ্যে অনেকেই হয়ত সাপের বাচ্চা হত না। যে

নিরপরাধ শিশুদের তুমি হত্যা করলে, তারা তোমার কি অনিষ্ট করেছিল? তোমার মত তাদেরও অন্থুর্মজদা এই পৃথিবীর আলো বাতাসে জীবন ধারণ করবার জন্যে জন্ম দিয়েছিলেন। ক্রোধে অন্ধ হয়ে তুমি ন্যায়ের পথ চিনলে না। দয়া-মায়াকে বিসর্জন দিলে?

—কি? আমি ন্যায়ের পথ চিনি না? আমি ন্যায়মূর্তি হব। লোক আমাকে অনবশকরবাঁ-দাদগর (ন্যায়কারী) বলে শ্রদ্ধা করবে।

—কতদিন? কৈসর ও শাহরা স্বয়ং পদবী গ্রহণ করে থাকে। কিছুদিন তার প্রচলনও থাকে। কিন্তু শেষে ঐ লক্ষ মুণ্ড সজাগ হয়ে যখন তোমার কাছে ন্যায়ের বিচার চাইবে, তখন?

—নীচ। সাপের বাচ্চা, আমাকে ভ্রমে ফেলবার চেষ্টা? আমি কবাত নই। খুসরো।

—হায়, আজ যদি তুমি কবাত হতে। অন্তত সেই বয়সের কবাত হতে তাহলে বুঝতে পারতে। যদি মারতেই ইচ্ছা ছিল, তাহলে আমাকে মারতে, আমার মত হাজার দু-হাজারকে মারতে। যদি তুমি মনে কর তোমার সিংহাসনের মধ্যে তারা বাধক হয়ে দাড়িয়েছে। তোমার উপর আমার রাগ নেই, খুসরো। তোমার স্থানে অন্য কেউ হলেও এইই করতো এবং করবে। রাজ্যলোভ ও ভোগের লিপ্সায় মানুষ কী না করে। এমনি করেই রাজপুত্রদের জনকভক্ষী করে তোলে। শাহপুত্র! আমার উপর রুষ্ট হয়ো না। হ্যাঁ, তুমি কিবলছিলে? তোমাকে লোক অনবশকরবাঁ-দাদগর বলবে? বেশ, যা করেছ ভালই করেছ। এখন থেকে তুমি অনবশ-করবাঁ হবার চেষ্টা করো।

খুসরো উপেক্ষা দেখিয়ে জল্লাদকে হুকুম দেয়। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে সেই মধুর স্বপ্নের দ্রষ্টাকে শূলে চড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে শত শত তীর বর্ষার মত তার দেহে এসে বিদ্ধ হয়। এক পলকেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি দেখতে পায় খুসরো। চোখে মুখে তার বিজয়ীর ক্রুর হাসি ফুটে ওঠে।

পরিশিষ্ট

মজ্দক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, কাল্পনিক নয়। তাঁর বিষয়ে এই পুস্তকে যা কিছু লেখা হয়েছে, তারও সবটুকু কাল্পনিক নয়। সেইজন্য এই পরিশিষ্টের অবতারণা। এই উপন্যাসের প্রারম্ভকাল খ্রীঃ ৪৯২। সে সময় কবাতের সিংহাসনের আরোহণ দশ বৎসর হয়েছে। পীরোজাপুত্র কবাত সাসানী বংশের (খ্রীঃ ২৮শে এপ্রিল ২২৮ থেকে খ্রীঃ ৬৪২ পর্যন্ত) উনবিংশতম শাহনশাহ। কবাত খ্রীঃ ৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারোহন করেন, তখন পর্যন্ত সাসানী বংশের ২৬০ বৎসর রাজ্যশাসন চলেছে। সাসানী বংশ মোট ৪১৪ বৎসর রাজ্যশাসন করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এত দীর্ঘদিন কোনও এক রাজবংশের শাসন খুব কমই আছে। এই শাসনকালের আগাগোড়া ইরান বিশ্বের এক শক্তিশালী রাজ্য বলে পরিচিত ছিল।

মজ্দকের বিষয়ে যে ঐতিহাসিক সামগ্রী পাওয়া যায়, তার মধ্যে বেশী কৃতিত্বের অধিকারী খ্রীষ্টান লেখকরা। এই সকল লেখকদের লেখা ইতিহাসের মধ্যে প্রসঙ্গত ইরানী শাহনশাহদের চর্চা করা হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় স্রোত পারসী লেখকদের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। অতঃপর তৃতীয় এবং শেষ সামগ্রীসকল পাওয়া যায় মুসলমান, আরবী ও ফারসী পুস্তক সমূহে।

(১)

॥ খ্রীষ্টীয় ঐতিহাসিক ॥

(১) যোশু স্তিলিত। এই খ্রীষ্টান ইতিহাস লেখক তাঁর লেখা পুস্তক The chronicle of Joshua Stylite (Can bridge 1882) খ্রীঃ ৫০৭ সনের কাছাকাছি লিখেছিলেন। তখন কবাত দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসেছেন। এই পুস্তকে খ্রীঃ ৪৯৪ থেকে থেকে খ্রীঃ ৫০৬ সাল পর্যন্ত সকল বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যোশু নিজ গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে লিখছেন,—হেফতাল (শ্বেত হুন) দের সঙ্গে যুদ্ধে পীরোজ দুই বার পরাজিত হয়েছেন (খ্রীঃ ৪৫৯—৮৪)। খ্রীঃ ৪৮৪ সালে দ্বিতীয় বার পরাজিত হয়ে পীরোজ বন্দী হন। নিজের মুক্তির জন্যে নিজ পুত্র কবাতকে শত্রুদের হাতে জামীন রেখেছিলেন।

তারপর পীরোজের ভ্রাতা বলাশ সিংহাসনে বসেন (খ্রীঃ ৪৮৪-৮৮)। সৈন্য সিপাহীদের বেতন দেবার মত অর্থ তখন বলাশ'-এর রাজকোষে ছিল না। তিনি ধর্মাচার্যদের পুরনো নিয়ম ভঙ্গ করে দেশে গরম জলে স্নান করবার জন্যে স্নানাগার তৈরী করেছিলেন, যার জন্যে ধর্মাচার্যগণ অসন্তুষ্ট হন। তারা বলাশকে জোর করে সিংহাসনচ্যুত করে অন্ধ করে দেন এবং কবাতকে সিংহাসনে বসান। কবাত হুনদের ঋণ শোধ করবার জন্যে রোমক সম্রাট "অনস্তাস" (খ্রীঃ ৪৯১-৫১৮)-এর কাছে আর্থিক সহায়তা চেয়ে পাঠান, সম্রাট জানতে পারলেন যে জর্থুস্ত্রীরা তাকে পতিত বলে ঘোষণা করেছে, কারণ তিনি সম্মিলিত-পত্নী প্রথার আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ইচ্ছানুযায়ী যে কোনও পুরুষ যে কোনও স্ত্রীর সঙ্গে সমাগম করতে পারবে। সম্রাট কবাতের কথায় কান না দিয়ে সংবাদ পাঠালেন, যতক্ষণ নসবী শহর তাকে ফিরিয়ে না দেওয়া

ততক্ষণ কোনও কথা মান্য করা হবে না। উক্ত গ্রন্থের ২৩শ অধ্যায়ে লেখক লিখেছেন,—ইরানের ধনী সম্প্রদায় চুপিচুপি কবাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করে এবং তাকে হত্যা করে দেশকে অনুচিত আইন ও প্রথা থেকে মুক্ত করবে। কবাত এই সংবাদ জানতে পেরে দেশ ছেড়ে হেফতাল রাজ্যে পালিয়ে যান। এই সময় কবাতের ভাই গামাস্প সিংহাসনে বসেন। কবাত হেফতাল রাজ্যে গিয়ে নিজ সহোদরার কন্যাকে বিবাহ করেন। পীরোজ যে যুদ্ধে বন্দী হন, সেই যুদ্ধে পীরোজের এই কন্যাও বন্দিনী হয়েছিল। শাহর কন্যা বলে হেফতাল রাজ তাকে নিজের রানীর পদে ভূষিতা করেছিলেন। জামাতা হবার পর কবাত শ্বশুরকে অনুরোধ করেন নিজ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করবার জন্যে। শ্বশুর কবাতকে সেনা সহায়তা করেন।

কবাতের ভাই এই সংবাদ পেয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। কবাত আবার ইরানের সিংহাসন অধিকার করেন এবং তার বিরোধীদের ধ্বংস করেন।

যোশু পরে ইরানের পূর্বের রোমক সাম্রাজ্যের যুদ্ধের কথা লিখেছেন,—যার জন্যে কবাতের প্রসঙ্গ বাধ্য হয়েই আসে। খ্রীঃ ৫০১ সালে কবাত রোমকদের ভূমি ধ্বংস করেন। থিউদোসিয়সপোলিস (অর্জরুম) নগর জয় করে তাকে লুঠ করে জ্বালিয়ে নষ্ট করে দেন। খ্রীঃ ৫০৯ সালে অমিদা নগরী বিজয় করে লুঠপাঠ করেন। এই যুদ্ধে আশি হাজারেরও বেশী লোক মারা যায়। তার চেয়েও অধিক সংখ্যায় মানুষকে শহরের বাইরে এনে তিক্রার জলে নিক্ষেপ করে ও অন্যান্য প্রকারে হত্যা করা হয়েছিল। অমিদ নগরীতে কবাত য়ুনানীদের গর্মাব দেখেন, (গরম জলে স্নান করবার স্নানাগার) এবং তাতে নিজে স্নান করেন। এই স্নানাগার তার খুব পছন্দ হয় এবং দেশে ফিরে তার রাজ্যের সকল নগরীতে গরম জলের স্নানাগার তৈরী করতে নির্দেশ দেন।

॥ ২ ॥

প্রোকোপিয়স—(খ্রীঃ ৫২৭) Procopios Justinien (Leipzig 1789) ইনি পূর্ব রোম (বিজন্তীয়) সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক। খ্রীঃ ৫৪৭ সালে রোমান সেনাপতি বেলীর্জের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা হয়ে তার সঙ্গে ছিলেন। কবাতের শাসনের শেষ সময় তিনি চাক্ষুষ দেখেছেন। ইরানে এসে কবাতের সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছেন তাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ইরানী বাদশাহ পীরোজ (খ্রীঃ ৪৫৯-৮৪) হেফতাল ("হফতলিক পারসী)" "হপতাল (অর্মনী)' "হৈতাল (পারসী)" "হেতাল (আরবী)"-দের যুদ্ধে মারা গেলেন। এই হেফতলদের শ্বেতহুন ও বলা হয়ে থাকে, কারণ হুনজাতিদের চেয়ে এরা দেখতে সুন্দর ও অধিক শ্বেতবর্ণের এবং এদের সামাজিকও সাংস্কৃতিক নিয়ম-কানুন উচ্চ বর্গের ছিল।

গ্রন্থের ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, "যখন কবাতের হাতে রাজ্যশাসন এসেছিল, তখন তিনি নতুন নতুন দুরাচার করতে শুরু করেন। নতুন নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেন, যার মধ্যে সম্মিলিত পত্নী প্রথা একটি। এই নিয়ম জনগণের কাছে অসহ্য লাগল। তারা বিদ্রোহ করে কবাতকে সিংহাসনচ্যুত করে কারাগারে বন্ধ করে দেয়, তার স্থানে পীরোজের ভাই বলাশ (জামাস্প)কে সিংহাসনে বসায়। বলাশ ইরানের সকল জ্ঞানী-গুণী বর্গকে ডেকে কবাতের বিষয়ে পরামর্শ চান, অধিকাংশই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী ছিল। কিন্তু হেফতাল সীমান্তের কনারঙ্গ ও সেনাপতি গজন্স্পদাত, যিনি সে সময় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, একটি নখকাটা ছুরি দেখিয়ে বললেন, এই ছোট্ট ছুরি সেই কাজ করতে পারে, যা এক হাজার সৈনিক পুরুষ করতে অসমর্থ। কিন্তু অমাত্যবর্গ তার কথা না শুনে কবাতকে "বিস্মৃতি

দুর্গে” আটক করে রাখার দণ্ড দেন। এই দুর্গের নাম “বিস্মৃতি দুর্গ” হবার কারণ, এখানে যে অভিযুক্ত আসতো সে কিছুদিনের মধ্যে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলত। এমন কি এখানকার নাম উচ্চারণ করাও মৃত্যুদণ্ডের ভাগী হবার মত মনে করত।

পঞ্চম অধ্যায়ে লেখা আছে,—কবাতের স্ত্রী খুব সুন্দরী ছিলেন, দুর্গপাল কবাতের স্ত্রীর প্রেমে পড়ে, স্ত্রী এই কথা কবাত কে বলতে, কবাত দুর্গের শাসনকর্তার কথা মেনে নিতে বলেন। দুর্গশাসক কবাতের স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ ছিল। এমনি করে কবাতের কাছে আশা যাওয়া করবার সুযোগ করে নেয় তার স্ত্রী। এমন সময় কবাতের এক ভক্ত, ইরানের ধনী-মানীদের একজন সিয়াবখ্‌শ নামক ব্যক্তি শাহকে কারাগার থেকে মুক্ত করে নিয়ে যায়। সিয়াবখ্‌শ কবাতের স্ত্রীর দ্বারা সংবাদ পাঠায় যে, দুর্গের বাইরে অশ্ব প্রস্তুত আছে। কবাত স্ত্রীকে নিজের পোষাক পরিয়ে, স্ত্রীর পোষাক নিজে পরে রাত্রে অন্ধকারে পালিয়ে যায়। স্ত্রী কবাতের পোষাক পরে কারাগারে কয়েক দিন বাস করে, ফলে রক্ষীরা মনে করে কবাত কারাগারেই আছে। ততদিন কবাত অনেক দূরে চলে যেতে সমর্থ হন। সিয়াবখ্‌শ-এর সাহায্যে কবাত পালিয়ে গিয়ে হেফতাল রাজ্যে পৌঁছন। সেখানকার রাজা কবাতের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে প্রচুর সেনা সহায়তা করেন। কবাত সীমান্ত নগরীতে পৌঁছলে,—যেখানে গজন্‌স্পদাত কনারঙ্গ ছিলেন। নিজ সেনাদের উদ্দেশ্যে বলেন। আজ যে কেউ আমার আজ্ঞা প্রথম পালন করবে, আমি তাকে এই এই প্রদেশের কনারঙ্গ-এর পদ দান করব। এই কথা বলেই কবাত অনুতাপ করেন। কারণ রাজ্যের নিয়মানুসারে এই পদ জন্মগত অধিকার বলেই লাভ করা সম্ভব। সংযোগ বশত প্রথম তরুণ যে কবাতের আজ্ঞা প্রথম পালন করে, আজুর-গন্দপত নামক তরুণ গজন্‌স্পদাতের বংশধর ছিল। এমনি করে নিয়ম ভঙ্গ না হয়ে কবাতের প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়। কবাত আবার নিজ রাজ্য অধিকার করেন। জামাস্প দুই বৎসর

পর নিজ অনুগামীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে বন্দী ও অন্ধ হন। কবাত গজন্‌স্পদাতকে সরিয়ে সেই পদ আজুর-গন্দপতকে দেন এবং সিয়াবখ্‌শকে ইরানের অর্তস্তারানসালার অথবা মহাসেনাপতির পদ দেন। সিয়াবখ্‌শ এই পদের প্রথম ও শেষ অধিকারী ছিল।

কিছুদিন পর কবাত হেফতালী সেনাদের বেতন দেবার জন্যে পূর্ব রোম অর্থাৎ বিজন্তীয় সম্রাট অনস্তাস-এর কাছে অর্থ দাবি করেন। সম্রাট অস্বীকার করায় কবাত হেফতাল সেনাসহ রোম রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি অর্মনী আক্রমণ করেন এবং অমিদা নগরী অনেকদিন যাবত ঘিরে রাখেন। এই সময়ে কিছু হুন ইরানের উত্তর ভাগে লুঠপাট করে। বাধ্য হয়ে কবাতকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ফিরে আসতে হয়। সেই যুদ্ধে খজারদের দরবন্দকে হাত করে নিয়ে আবার ফিরে গিয়ে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কবাতের দ্বিতীয় পুত্র জাম সিংহাসনের অধিকারী হতে পারেনি, কারণ তার একটা চোখ অন্ধ ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র কাবুসের উপরও তেমন মমতা ছিল না। কবাতের ইচ্ছা ছিল তার কনিষ্ঠ পুত্র খুসরো সিংহাসন লাভ করুক। এই খুসরো ছিল অস্পাহপত অথবা সেনাপতির ভগ্নীর গর্ভজাত সন্তান যাকে কবাত শেষবার বিবাহ করেন। সকল সন্তানের মধ্যে মধ্যম পুত্র জাম সবচেয়ে বীর ছিল এবং ইরানবাসীর প্রিয় পাত্র ছিল। সেজন্যে কবাতের ভয় ছিল, হয়ত মৃত্যুর পর খুসরোর রাজ্য পাওয়ায় বাধা উপস্থিত হতে পারে। সেই জন্যে কবাত বুদ্ধি করে রোম সম্রাট জুস্তিনের (৫১৮-২৭ খ্রীঃ) কাছে সন্ধির দূত পাঠান এবং নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে সম্রাট যেন তার পুত্র খুসরোকে নিজ পুত্র বলে স্বীকার করেন। সম্রাট জুস্তিন এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র জুস্তিনিয়ন (৫২৭-৬৫ খ্রীঃ) কবাতের প্রার্থনা স্বীকার করতে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু মন্ত্রী প্রোক্লোস এই কাজে কুমন্ত্রনা দেন "অসভ্য জাতির নিয়ম" বলে। অতঃপর কবাত নিজ প্রতিনিধি মাহপত ও সিয়াবখ্‌শকে পাঠালেন। তারা সীমান্তে গিয়ে রোমের প্রতিনিধিদের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু প্রতিনিধি খুসরোকে পুত্র বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করে। খুসরো কৈসর-পুত্র হয়ে রোম যাওয়ার আশা নিয়ে সীমান্তে এসেছিল। এখান থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে পিতার কাছে ফিরে যায়। মাহপত ফিরে এসে কবাতের কাছে সিয়াবখ্‌শ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তার অনেক অভিযোগের মধ্যে একটি হল, সিয়াবখ্‌শই মন্ত্রনা দিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে সন্ধি করতে দেয়নি এবং খুসরোকে রোম সম্রাটের পুত্র হবার পথ নষ্ট করেছে। অপরাধের বিচার করবার জন্যে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একত্র করা হল। উচ্চবর্গের মনে ঘৃণা ছিল, তারা সিয়াবখ্‌শকে আসামী বেশে দেখে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সিয়াবখ্‌শকে নিজ ন্যায়প্রিয়তার জন্যে অন্যান্য উচ্চবর্গের লোকরা ঈর্ষা করত। উচ্চাধিকারীরা সিয়াবখ্‌শ-এর বিরুদ্ধে আরও নতুন অভিযোগ উত্থাপন করে। "সিয়াবখ্‌শ ইরানের আইন, আচার-ব্যবহার স্বীকার করে না" "অন্য দেবতাদের পূজা করে" "কিছুদিন আগে নিজ মৃত পত্নীর শবদেহকে ধর্মবিরুদ্ধ মাটিতে পুঁতে রেখেছে প্রভৃতি। অতঃপর সিয়াবখ্‌শকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সিয়াবখ্‌শ-এর উপর কবাতের খুব স্নেহ ছিল, কিন্তু দেশের নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য হয়ে এই বিচারের বিরুদ্ধে তিনি কিছু করতে পারেন না কিন্তু সেইদিন থেকে মহাসেনাপতির পদ উঠিয়ে দেন।

কিছুদিন পর (খ্রীঃ ৫২৭) সম্রাট জুস্তীন দেহত্যাগ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র জুস্তীনিয়ন ইরান ও রোমের যুদ্ধ আবার আরম্ভ করেন। ইরানী সামন্ত পীরোজ-মেহরান যুদ্ধে পরাজিত হয়। যুদ্ধ চলতে থাকে, এমন সময় কবাত কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সকল উচ্চবর্গের লোক মাহপতকে অধিক বিশ্বাস করত। মাহপত এই সময়ে খুসরোকে সিংহাসন- দেবার ইচ্ছাপত্র লিখিয়ে নেয়। কবাতের মৃত্যুর পর কাবুস সিংহাসন দাবি করতে মাহপত কবাতের ইচ্ছাপত্র দেখিয়ে কাবুসের দাবিকে অস্বীকার করে খুসরোকে সিংহাসনে বসায়।

॥ ৩ ॥

আগাথিয়স (৫৮৩) Agathias, প্রসিদ্ধ য়ুনানী ইতিহাসকার নিজ পুস্তকে কবাতের বিষয়ে অনেক কিছুই লিখেছেন। তিনি নিজের লেখায় কবাতের আমলের তস্পোনের শাহী-বর্ষপত্র এবং অন্যান্য লিখিত পুস্তিকার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তাই এই লেখকের লেখাকে অধিক প্রামাণিক বলে ধরা হয়। বলাশের চার বৎসর (৪৮৪-৮৮ খ্রীঃ) শাসনকালের পরবর্তী সময়ের কথা লিখেছেন, এর পর পীরোজপুত্র কবাত ইরানের বাদশাহ হলেন। তিনি রোমক এবং অন্যান্য পড়শী বর্বরদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছেন এবং অনেক বিজয়লাভ করেছেন। তার সময়ে রাজ্যে একতা এবং শান্তি ছিল। কবাত নিজ প্রজাদের সামনে সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে ব্যবহার করতেন। তিনি পুরনো নিয়ম সকল তুলে দিয়ে জনগণের জীবন যাত্রা বদল করতে সনাতন সদাচারগুলিকে বদল করেন। তিনি নিয়ম করেছিলেন সকল পুরুষের সঙ্গে সকল স্ত্রীদের বিনা ভেদ-ভাব যুক্ত সম্বন্ধ হোক। এই নিয়মে পুরুষ নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোনও স্ত্রী, এমন কি পতি থাকা সত্বেও তার সঙ্গে সম্বন্ধ ও সম্ভোগ করতে পারে। এই আইনের ফলে পাপ বেড়ে যায় রাজ্য মধ্যে। ইরানী ক্ষত্রপ তার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকেন এবং শেষে এই নিয়মের ফলে ইরানে রাজদ্রোহ সৃষ্টি হয় ও এগার বৎসর রাজত্ব করবার পর কবাতকে সিংহাসনচ্যুত করে বিস্মৃতি কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, এবং পীরোজের দ্বিতীয় পুত্র জামাস্পকে সিংহাসনে অধিকার দেওয়া হয়। এরপর কবাত নিজ স্ত্রীর সাহায্যে কারাগার থেকে পালিয়ে হেফতাল রাজ্যে উপস্থিত হন। এই পলায়নে সাহায্য করতে কবাতের স্ত্রী নিজের প্রাণের মায়া করেননি। হেফতাল রাজ্যে গিয়ে কবাত সেনা সহায়তা প্রার্থনা করেন। রাজা কবাতকে স্নেহভরে আশ্রয় দেন এবং তার শোক ও দুশ্চিন্তাকে দূর করবার জন্যে সর্বদা মিষ্ট ব্যবহার করতেন।

তারা দুজনে একই খ্বান (ভোজন করবার বস্ত্র) এ ভোজন করতেন এবং মিত্রতার চিরস্থায়িত্বের নিদর্শন স্বরূপ এক সঙ্গে মদিরা পান করতেন। রাজা কবাতকে বহুমূল্য বস্ত্রাভূষণ দিয়েছিলেন এবং সকল প্রকার স্নেহ প্রদর্শন করতেন। কিছুদিন পর তিনি নিজ কন্যার সঙ্গে কবাতের বিবাহ দিলেন। অতঃপর প্রচুর সেনা দিয়ে শত্রুকে পরাজিত করে সিংহাসন ফিরে পেতে সহায়তা করলেন। কবাত অক্লেশে পুনরায় সিংহাসেন আরোহণ করেন। প্রথম এগার বৎসর এবং পরে ত্রিশ বৎসর কবাত রাজ্যশাসন করেন। এই বাদশাহ মোট ৪১ বৎসর রাজ্যশাসন করেন।

॥ ৪ ॥

জীন মলাল :—Jean Malala, (৫৬৫ খ্রীঃ) এই য়ুনানী ইতিহাসকারের জন্ম হয় অন্তিয়োক। ইনি লিখছেন,—এই সময় (সম্রাট জুস্তিনিয়নের সময়) ইরানে মানী ধর্মের (মজ্‌দকী) প্রচার হয়। এ কথা বাদশাহের গোচরে আসতে তিনি কুপিত হন। ইরানের পুরোহিতরাও ক্রুদ্ধ হলেন। মানী ধর্মের অনুগামীদের নেতা অন্দর্জগর নামক ব্যক্তি ছিলেন। কবাত এক সাধারণ সভায় আদেশ করলেন ধার্মিক নেতাসহ সকল মানী পন্থীদের গ্রেপ্তার করা হোক। উক্ত সভায় উপস্থিত হবার আগেই কবাতের সিপাহীদের উপর আদেশ ছিল ধর্মোপদেশকদের সভাকক্ষেই যেন মস্তকহীন করা হয়। শাহের চোখের সামনে তাদের হত্যা করা হয়। তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাদের সকল মন্দিরগুলি খ্রীষ্টানদের দান করা হয়। আদেশ করা হয়, দেশের যে কোনও স্থানে মানী পন্থীদের পাওয়া মাত্র যেন হত্যা এবং পুস্তক প্রভৃতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মলালার এই গ্রন্থ যদিও আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু সেই গ্রন্থের অনেক কিছুই উদ্ধরণ তিমোথিয়স তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

॥ ৫ ॥

থেবফানিস :—Theophanes, (খ্রীঃ ৭৫০-৮১) এই বিজন্তীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন,—"ইরানী বাদশাহ পীরোজ-পুত্র একদিনে হাজার হাজার মানীপন্থী ও তাদের তদানীন্তন ধার্মিক নেতা অন্দর্জগরকে হত্যা করান। এর নিজ সহোদরা ও পত্নীর গর্ভজাত সন্তান কাবুস মানীপন্থী ছিল। মানীধর্মের শিক্ষা পেয়ে যুবরাজ সেই ধর্মকে স্বীকার করেছিল। ওদের ধর্মের অনুগামীরা পত্র লেখে, —তোমার পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন, তিনি যদি হঠাৎ মারা যান, তাহলে পুরোহিত বর্গ তাঁর অন্য পুত্রদের অর্থাৎ তোমার অন্য ভাইদের কাউকে সিংহাসনে বসাবেন। আমাদের ইচ্ছা তোমার পিতাকে রাজী করিয়ে তোমাকে সিংহাসনে বসাই। তবেই আমরা মানীর ধর্মকে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে পারব। এই সংবাদ জানতে পেরে কবাত পুত্র শাহ কাবুসকে সিংহাসন দেবার জন্যে এক সাধারণ সভা ডাকলেন এবং মানীর ধর্মের সকল নেতা ও ভক্তদের ঐ সভায় আহ্বান করলেন। সেই সময় তিনি প্রধান পুরোহিত গুলনাজ, অন্যান্য ধর্মাচার্য, নিজের কৃপাপাত্র এবং প্রসিদ্ধ চিকিৎসক খ্রীষ্টান বিশপ বাজান্‌সকেও নিমন্ত্রণ করেন। তিনি সভা-মধ্যে মানীপন্থীদের বললেন,—তোমাদের ধর্ম আমার খুবই পছন্দ। আমি চাই আমার জীবদ্দশাতেই এই সিংহাসনের ভার কাবুসের হাতে দিয়ে যাই। তোমরা সকলে এক জায়গায় জমা হও এবং তখন আমি কাবুসকে বাদশাহ নির্বাচিত করব।" মানীর অনুগামীরা কবাতের কথায় বিশ্বাস করে সকলে একত্রিত হয়। সেই সময় কবাত নিজ সৈনিকদের দ্বারা একই সঙ্গে সকলের মুণ্ডচ্ছেদ করান। এই সময়ে সমস্ত দেশে আদেশ পাঠানো হয়, যে কেউ যে কোনও স্থানে মানীপন্থীদের সাক্ষাৎ পাবে, তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করবে। তাদের সকল সম্পত্তি রাজকীয় কোষের জন্যে বাজেয়াপ্ত করা হোক ও সকল ধর্মপুস্তক আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হোক।

২। পারসী ধার্মিক গ্রন্থ

আজ যে পারসী গ্রন্থ পাওয়া যায়, তা এক বিশাল সাহিত্যের অবশিষ্ট মাত্র। বন্দীদাদ-এর পারসী (মধ্যযুগীয় ভাষা) টীকা ও অন্যান্য গ্রন্থের কোথাও উদাহরণ অথবা সঙ্কেত মাত্র মজ্‌দকের নাম নেওয়া হয়েছে। "কোনও পাপী নাস্তিক লোকদের জোর করে ভোজনে বাধা দেয়, যেমন মজ্‌দক বামদাতপুত্র লোকদের ক্ষুধা ও মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয়।"

বহমন-যস্ত, ("দীনকর্ত"—পেষ্টন জী বোম্বাই) (খণ্ড-২, বাক্য-২২)-এর টীকায় লিখেছেন,—কবাত পুত্র খুসরো নিজ শাসনকালে ধর্মের শত্রু পাপী মজ্‌দককে অন্যান্য বিধর্মীদের সঙ্গে ধর্ম থেকে দূর করেন।" পারসী পুস্তকে মজ্‌দক সম্বন্ধে খুব কমই উল্লেখ দেখা যায়।

৩। ইসলামী গ্রন্থ

ইসলামের ইরান বিজয় (খ্রীঃ ৬৪২)-এর পর ইরানে পারসী গ্রন্থ সকলেরও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল, যেমন হয়েছিল মজ্‌দক ও মানী গ্রন্থের অবস্থা পারসীদের হাতে। পারসী পুস্তকের খুবই কম সংখ্যা ভারতে আসতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ইসলামের আরম্ভিক শতাব্দীতে ইরানী ও আরব বিদ্বান্‌গণ পুরনো পুস্তকগুলিকে আধারিত করে লেখা নিজ ঐতিহাসিক গ্রন্থে মজ্‌দকের কথা লিখেছেন। এখানে সেই সকল গ্রন্থের কিছু কিছু প্রকাশ করছি—

(১)

ইয়াকুবী, (অহমদ বিন্-অবা-য়াকুব বিন্ বাজেহ) (২৭৮ হিজরী, ৮৯১খ্রীঃ)

এই গ্রন্থের লেখা অনুসারে বালক কবাত সিংহাসনে বসতে তার নামে সোখা রাজ্য সঞ্চালন করেন। বয়স্ক হবার পর সোখার প্রভাব কবাতের পছন্দ হয় না এবং তাকে হত্যা করিয়ে তার স্থানে মেহরানকে

প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনায় লোকপ্রবাদ উঠেছিল "সোখার হাওয়া শেষ হয়েছে, মেহরানের হয়েছে শুরু"। সোখার (বাদে সোখা করো খিক্ত ব বাদে-শাপুর বর্খাস্ত) হত্যায় রুষ্ট হয়ে ইরানীরা কবাত-কে বন্দী করে বন্দীখানায় পাঠিয়ে দেয় এবং তার ভাই জামাস্পকে বাদশাহ নির্বাচিত করে। কবাতের ভগ্নী ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে জেলখানায় যেতে চায়, জেলখানার অধিকারী এই অনুমতির বদলে তার অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। স্ত্রী মাসিক ধর্মের ছল করে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। পরে সকল উপায় জেনে নিয়ে একদিন বন্দীখানায় উপস্থিত হয় এবং কবাতকে বিছানার মধ্যে জড়িয়ে একজন বলবান চাকরের পিঠে তুলে বাইরে নিয়ে আসে। কবাত [অলবলদান] এমনি করে বন্দীশালা হতে বাইরে এসে হেফতাল রাজ্যে পালিয়ে যান। এই যাওয়ার পথে অবহরশহর (নেশাপোর) নগরীতে এক বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বাড়ীর কর্তা নিজের তরুণী কন্যাকে কবাতের সেবার জন্যে নিযুক্ত করেন। তরুণীর সঙ্গে কবাতের প্রেম হয়। কবাত এক বৎসর হেফতাল্ ভূমিতে ছিলেন, সেখানকার রাজা কবাতকে নিজ রাজ্য উদ্ধারের জন্যে সেনা সহায়তা করেন। ফেরবার পথে কবাত যখন আবার অবহরশহরে আসেন, তখন তরুণী একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছে। কবাত এই পুত্রের নাম রাখেন নৌশেরবাঁ (ন্যায়কারী) রাখেন। অতঃপর তিনি ইরানে পৌঁছে হৃত সিংহাসন লাভ করেন।

এরপর ইয়াকুবী লিখেছেন,—কবাত রাজ্যের সমস্ত কাজ কর্ম নিজপুত্র নৌশেরবাঁকে অর্পণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাকে কয়েকটি সৎ উপদেশ দিয়ে যান। খুসরো নৌশেরবাঁ সিংহাসনে বসে মজ্‌দককে হত্যা করেন।

(২)

দীনবরী ঃ—(অবু—হানীফা, অহমদ বিন্—দায়ুদ, দীনবরী) [মৃত্যু খ্রীঃ ৮৯৫] দীনবরী নিজের পুস্তক "অখবারুত্তবীলন্"-এ

লিখেছেন, পীরোজ পুত্র বলাশের মৃত্যুর পর তার ভাই কবাত সিংহাসনে বসেন তার বয়স তখন ১৫ (পনের) বৎসর, এবং তিনি তখন রাজকার্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। সোখ্রা সমস্ত শক্তি নিজের হাতে রেখেছিলেন এবং লোকে তখন কবাতকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। পাঁচ বৎসর রাজত্ব করবার পর এই পরিস্থিতি কবাতের কাছে অসহ্য লাগে, তিনি তখন ষড়যন্ত্র করে সোখ্রাকে হত্যা করান।

এরপর দীনবরী বলেন,—"দশ বৎসর রাজত্ব করবার পর কবাতের কাছে ইস্তখ্র নিবাসী মজ্দক নামে এক ব্যক্তি আসেন। তিনি কবাতকে মজ্দকী ধর্ম শেখান।" নিহায়াতে বলা হয়েছে কবাতের সিংহাসন আরোহণের সময় ১২ (বার) বৎসর বয়স ছিল এবং মজ্দককে নিসা নিবাসী বলা হয়েছে। সেখানে এও বলা হয়েছে যে, মজ্দকের সঙ্গে একজন ইরানী সামন্ত খরকান্ পুত্র জরদহুস্ত নামক ব্যক্তি ছিল।

দীনবরীর লেখা অনুযায়ী জানা যায় যে, কবাত মজ্দক ধর্মকে স্বীকার করেছিলেন। সেজন্যে ইরানী জনগণ খুবই অসন্তুষ্ট হয়। তারা কবাতকে হত্যা করতেও চেয়েছিল। ("নিহায়া"র লেখা অনুসারে কবাত মজ্দকী ধর্মকে বাইরে থেকে স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু ইরানবাসী তাকে সত্যি মনে করেছিল) কবাত অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জনগণ তার কথায় বিশ্বাস না করে তাকে সিংহাসনচ্যুত করে তার ভাই জামাস্পকে সিংহাসনে বসায়।

লেখক পরে লিখেছেন,—কবাত নিজ ভগ্নীর সহায়তায় কারাগার থেকে পলায়ন করে এবং তার সঙ্গে পাঁচজন বিশ্বাসী মিত্র ছিল, যাদের মধ্যে একজন ছিল সোখাপুত্র জরমহর। কবাত অহরাজ (সুশ) এবং অস্পহান প্রদেশের সীমান্তে পৌঁছে জরমহর-এর সহায়তায় সেখানকার এক গ্রামপতির কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে এই কন্যা যখন তার পিতার কাছে প্রকাশ করে, তার প্রণয়ী

লাল রঙের জরবফতের পায়জামা পরত। তখন তার পিতার বিশ্বাস হয়, এ নিশ্চয় কোনও রাজকুমার। পরে কবাত হেফতাল ভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানকার রাজা কবাতকে সেনা সহায়তা করেন। তার বিনিময়ে কবাত রাজাকে চগানিয়ন (নিহায়া: তালকান) প্রদেশ দান করেন। ত্রিশ হাজার হেফতালী সৈনিক সহ কবাত আবার ইরানে প্রবেশ করেন। পথিমধ্যে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন, তখন তার এক পুত্র হয়েছিল। খুশী হয়ে পুত্রের নাম রাখেন "খুসরো"। নিজপুত্র ও স্ত্রীকে নিয়ে কবাত রাজধানীতে ফিরে আসেন। ইরানবাসী কবাতের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিল, তার জন্যে তারা লজ্জিত হয়। সকলেই তার ভাই জামাস্প-এর হয়ে কবাতের চরণে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কবাত তাকে ক্ষমা করে দেন। রাজপ্রাসাদে এসে তিনি হেফতাল সৈনিকদের পারিতোষিক সহ বিদায় করেন। কবাতের মৃত্যুর পর খুসরো সিংহাসনে বসে। সিংহাসনে বসে খুসরো মজ্‌দক ও তার অনুগামীদের হত্যা করায়।

(৩) তিব্রী:—(মহম্মদ বিন্—জরীর তিব্রী: "তারিখ তিব্রী") [খ্রীঃ ৮৩৮—৯২২] এই ঐতিহাসিক লেখেন,—খুসরো যখন রাজ্যভার হাতে নেয়, সে সময় নিসা (ফসা) নিবাসী খরকান পুত্র জরতুস্ত নামক এক নাস্তিক ব্যক্তি জরতুস্তের ধর্মের বিরোধ করে অনেক লোককে নিজের ধর্মে দীক্ষা দেয়। খুব সাফল্যের সঙ্গে এদের কজে এগিয়ে চলে। তখন তাদের অনুগামীদের মধ্যে নদরিয়া নিবাসী বামদাত পুত্র মজ্‌দক নামক ব্যক্তি ছিলেন। ইনি জনগণের মধ্যে প্রচার করেন, সম্পত্তি এবং স্ত্রীর মধ্যে সকলের সমানাধিকার ঈশ্বর খুব পছন্দ করেন, এবং এই পথেই সত্যিকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আসা সম্ভব। ধার্মিক আদেশ বা নিয়ম যদি না থাকেও, তবুও আমাদের এবং সকলের উচিত যা কিছু নিজেদের আছে, তাকে সকলে মিলেমিশে ভাগাভাগি করে ভোগ করা। এই রকম প্রচার করে তিনি দরিদ্র জনসাধারণকে ধনীর বিরুদ্ধে

একত্র করেন। সকল নীচ সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন করে বর্ণসঙ্করতা প্রবেশ করে। অত্যাচার ক্রমশ বেড়ে যায়। ব্যভিচারী, দুরাচারীরা সকল স্ত্রীদের ভ্রষ্ট করে। জনগণের অবস্থা এমন খারাপ হয়ে পড়ে যা তার পূর্বে কখনও শোনা যায়নি। খুসরো খরকান-পুত্র জরদুস্ত ও বামদাত-পুত্র মজ্‌দকের ধর্ম উঠিয়ে দেয় ও জনগণকে তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে। সেই ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে যারা খুসরোর আজ্ঞা পালন করেনি তাদের হত্যা করা হয়। খুসরো আবার পূর্বের মত জরদস্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে।

(৪) বিতরিক—[খ্রীঃ ১৭৬-৯৩৯] সইদ বিন—বিতারিক বাগদাদী খলিফাদের সময়কার একজন প্রসিদ্ধ লেখক! ইনিও কবাত ও মজ্‌দকের বিষয়ে লিখেছেন। একস্থানে তিনি উল্লেখ করেছেন,—সোখা হেফতালী বাদশাহের সঙ্গে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। পীরোজের পরাজয়ের সময়ে যে ধন এবং বন্দী হেফতালদের হাতে গিয়েছিল। সে সবই সোখা ফিরিয়ে আনেন।

বলাশ ও কবাতের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া হয়, এবং বলাশ সফলতা লাভ করে। কবাত সোখার পুত্র জরমহরের সঙ্গে তুর্ক (শ্বেতহুন) রাজার কাছে সাহায্যের জন্যে যান। পথিমধ্যে অবহরশহর (নেশাপোর)-এর এক ধনী কন্যার প্রতি মুগ্ধ হন। জরমহর কন্যার মাতা পিতাকে রাজী করিয়ে তার সঙ্গে কবাতের বিবাহ দেয়। কবাতের যাওয়ার পর মা জিজ্ঞাসা করতে কন্যা বলে, তার প্রণয়ী লাল রঙের জরবফত-এর পায়জামা পরতেন। তখন তারা জানতে পারে যে ঐ ব্যক্তি নিশ্চয় কোনও রাজকুমার। কবাত খাকান (হুনরাজা)-এর আশ্রয়ে চার বৎসর ছিলেন। অতঃপর রাজার কাছ থেকে সেনা সহায়তা নিয়ে ফিরে আসার পথে অবহরশহরের সেই স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তার তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র দেখতে পান। স্ত্রী-পুত্র সহ কবাত রাজ্যে ফিরে আসেন। এই সময় বলাশ দেহত্যাগ করেন এবং কবাত নির্বিঘ্নে রাজ্যারোহণ করেন। কবাত

সোখাও জরমহরের উপর রাজকার্য ছেড়ে দিয়ে নিজে নগর, খাল, পুল প্রভৃতি দেশ উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, দশ বৎসর রাজত্ব করবার পর একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় দেশে। পঙ্গপালের দল সমস্ত ফসল খেয়ে নষ্ট করে দেয়। দেশের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। এর পর রোমকদের বিরুদ্ধে কবাত যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও তাদের অমিদা নগরী ধ্বংস করেন।

বিতরিক দ্বিতীয় কথায় লিখেছেন,—ইরানবাসী কবাতের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। তারা চাইত কবাতের মৃত্যু হোক, কিন্তু তারা সোখা-কে ভয় করত, তাই তারা শাহকে ভয় দেখাতে লাগল। সোখার মৃত্যুর পর মজ্‌দক এবং মজ্‌দকের অনুগামীরা তাদের ধর্ম প্রচারের জন্যে কবাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাদের কথা—"ভগবান এই ভোগের পৃথিবীতে সকলকে জন্ম দিয়েছেন, ভোগকে সকলে সমানভাবে ভাগ করে উপভোগ করুক। একজন অন্যজনের চেয়ে যেন বেশী না নেয়। কিন্তু আজ মানুষ একজন অপর জনের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করছে, নিজেকে তার ভাইয়ের চেয়ে বড় ভাবছে। আমরা চাই ধনীদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে, সেই ধন সম্পত্তি গরীবদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক। যার কাছে ধন, স্ত্রী, দাস-দাসী অধিক আছে। তার কাছ থেকে নিয়ে যার নেই তাকে ভাগ করে দেওয়া হোক, যাতে কেউ ছোট বড় না থাকে।" এর পর মজ্‌দকীরা লোকের কাছ থেকে সম্পত্তি, স্ত্রী ও ধন ছিনিয়ে নেয়।

অতঃপর জনগণ কবাতকে বন্দী করে এমন এক কারাগারে রাখে যে, কেউ সেখানে যেন তাকে না দেখতে পারে। কবাতের স্থানে তার ভাই জামাস্প সিংহাসনে বসেন। জরমহর ইরানের উচ্চবর্গের লোকদের সাহায্যে মজ্‌দকীদের মেরে, জামাস্পকে সরিয়ে আবার কবাতকে সিংহাসনে বসায়। পরে মজ্‌দকী-পন্থী আবার কবাতের বিশ্বাস অর্জন করে। তারা কবাতকে উস্কানি দেয় জরমহরকে মারবার জন্যে। জরমহরের মৃত্যুর পর সারা দেশে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

সোখা ও তার পুত্রকে হত্যা করবার জন্যে পরে কবাতের অনুতাপ হয়েছিল।

কবাতের মৃত্যুর পর তার পুত্র খুসরো নৌশেরবাঁ সিংহাসনে বসে। খুসরো মজ্‌দক পন্থীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং সকল লুঠের সম্পত্তি আবার আসল মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেয়। "যে সকল ধন-সম্পত্তির নিশ্চিত মালিকের খোঁজ পাওয়া যায়নি, সে সকল বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়। স্ত্রীকে পতির কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং এক শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষদের বাধ্যতামূলক বিবাহ্‌ করবার আদেশ করা হয়। তাছাড়া যে সকল সামন্ত এবং ধনীরা অনাথ হয়েছে অথবা দুঃখী-জীবন যাপন করছে, তাদের রাজকোষ এবং বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি দ্বারা ক্ষতিপূরণ করবার আদেশ দেওয়া হয়। পিতৃহীন পুত্রদের তাদের পছন্দমত কাজ দেওয়া হয়। পিতৃহীনা কন্যাদের সেই শ্রেণীর ধনী পুত্রদের সঙ্গে বিবাহ করানো হয়।

(৫) অস্পাহানী (মৃত্যু—খ্রীঃ ৯৬৭)—অবুল-ফরজ-অস্পহানী নিজ পুস্তক "কিতাবুল-আগানী"-তে লিখেছেন,—কবাতের শাসনকালে মজ্‌দক নামক এক ব্যক্তি আবির্ভূত হন, যিনি জিন্দীকি (মানী ও মজ্‌দক ধর্ম) ধর্মের প্রচার করেন। সে সময় কোনও মানুষ অন্যকে ব্যভিচারের হাত থেকে বাঁচাতে পারতো না। কবাত স্বয়ং সেই ধর্মকে স্বীকার করে নেয়। কবাত হিরা (আরব)-র শাসক মঞ্জরকে মজ্‌দকী ধর্ম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। তারপর অমর-পুত্র হারিশকেও অনুরোধ করেন, তিনিও অস্বীকার করেন। কবাত অসন্তুষ্ট হয়ে ওদের শাসন থেকে বঞ্চিত করেন।

শেষ সময়ে নৌশেরবাঁ মজ্‌দককে শূলে দেবার আদেশ করেন এবং যেখানেই মজ্‌দকীদের পাওয়া যাবে তৎক্ষণাৎ যেন হত্যা করা হয়, আদেশ দেন। অর্ধদিবসেই জাজর, নহরবান এবং মদায়ন (রাজধানী তস্পোন)-এ একলক্ষ মজ্‌দকী লোককে শূলে দেওয়া

হয়। সেই দিন থেকে খুসরোর উপাধি হয় "অনৌশ-করবাঁ" অর্থাৎ অমর হয়।

(৬) নদীম (খ্রীঃ ৯৮৮) মজ্দকী সংহারের পৌনে পাঁচ শত বৎসর পরে নদীম লিখেছেন,—সাসানী শাসনকালে মজ্দকীদের "হরমিয়া" (খুর্মিয়া) বলা হত। এই খুরমিয়া ধর্ম খ্রীঃ ৮৩৫ সালে বাবকের নেতৃত্বে আজুর-বায়জানের ভূমির খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে (তারীখুল-মজমুআ) [এদের মূলে সেই মজ্দক পন্থীরা ছিল, যাদের খ্রীঃ ৫২৭ সালে ভীষণ হত্যাকাণ্ডে লুপ্ত করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু পৌনে তিন শতাব্দী পর আবার তারা আজুর-বায়জানে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। মজ্দক পন্থীদের অপর নাম ছিল "অল-মোহম্মরা" অর্থাৎ রক্ত বসন]। নদীম লিখেছেন,—এই সময় খুর্মিয়া দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। ওদের কিছু কিছু মোহম্মরা, আজুর বায়জান, অর্মনী, হেলম, দমদান দীনবর দেশে ছড়িয়ে ছিল এবং অহবাজ ও অস্পহান এলাকায়ও কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যেত। বস্তুত এরা প্রথমে জরথুস্তী ছিল। পরে দুই ধর্মকে এক করে মিলিয়ে নেয়। সাধারণত এরা "পিতৃহীন পুত্র" বলে জন-সাধারণের কাছে পরিচিত ছিল। এই ধর্মের সংস্থাপক সেই মজ্দক নামক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি নিজ অনুগামীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, সদা ভোগের সন্ধান করো এবং খাওয়া-পরায় বিধি-নিষেধ রাখবে না। নিজেদের আচরণে সমতা এবং মিত্রতা ভাব বজায় রাখো, একজনকে অন্যজন থেকে বড় হতে দিও না। স্ত্রী ও ধনের মধ্যেও সমান ভাব পোষণ করো, অন্য স্ত্রীকেও নিষিদ্ধ মনে করো না। অতিথি যে কোনও জাতির হোক না কেন তার কোনও প্রকারে যেন অসুবিধা না হয়। তার সকল ইচ্ছাকে পূরণ করো।

(৭) অবু কাসিম ফিরদৌসী (মৃত্যু: খ্রীঃ ১০২০) ফিরদৌসী ফারসীদের মহান কবি এবং "শাহনামা"র মত মহান ফারসী কাব্যের রচয়িতা। মজ্দকের মৃত্যুর পাঁচ শত বৎসর পর তিনি লিখেছেন—

(হেফতালদের সঙ্গে) যুদ্ধের সময় কবাত পীরোজের সেনার সঙ্গে ছিলেন এবং পরাজিত হবার পর শত্রুর হাতে বন্দী হন। সোখা তাকে মুক্ত করেন এবং বাদশাহ বলাশ তাকে কৃপা করেন। কিছুদিন পর সোখা বলাশকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে কবাতের মাথায় মুকুট পরান। কবাত যখন ২১ বৎসর বয়স্ক হলেন, তখন সোখা নিজ এলাকা "রৈ"-তে ফিরে গিয়ে কাজ করবার আজ্ঞা প্রার্থনা করেন। বিরোধীরা কবাতের কানে কু-মন্ত্রণা দিতে কবাত তার প্রতিদ্বন্দ্বী শাপুরকে পাঠালেন সোখাকে গ্রেপ্তার করে আনতে। অতঃপর সোখাকে সীরাজ থেকে এনে সিংহাসনের সামনে হত্যা করা হয়। ইরানবাসী কবাতের উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়। তারা কু-মন্ত্রণাকারীকে হত্যা করে কবাতকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং জামাস্পকে বাদশাহ বলে স্বীকার করে। তারা সোখার পুত্রের হাতে তার পিতার ঘাতক কবাতকে অর্পণ করে কিন্তু পুত্র কবাতকে ক্ষমা করে ও দুজনে হেফতাল ভূমিতে চলে যায়। পথের মধ্যে কবাত এক গ্রামপতির কন্যাকে বিবাহ করে এক সপ্তাহ বাস করেন। যাওয়ার সময় স্ত্রীকে একটি আংটি দিয়ে যান প্রতিশ্রুতি স্বরূপ। ফিরবার সময় আবার যখন সেই স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তখন স্ত্রী তার সন্তানের জননী। কবাত আনন্দিত হয়ে পুত্রের নাম রাখেন খুসরো। অতঃপর স্ত্রী-পুত্র সহিত কবাত তস্পোনে ফিরে আসেন।

তস্পোনে ফিরে আসতে জামাস্প ও অন্যান্য আমীর ওমরাহবৃন্দ কবাতকে স্বাগত জানিয়ে পুনর্বার সিংহাসনে বসান। কবাত তাদের সকল অপরাধ মার্জনা করেন। অতঃপর পূর্ব রোমকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এই সময় চতুর, মিষ্টভাষী, মনস্বী মজ্‌দক নামক এক ব্যক্তি কবাতকে তার নিজস্ব মত গ্রহণ করান। মজ্‌দকের প্রভাব ক্রমশ বাদশাহের উপর বাড়তে থাকে। এর পর এক সময় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয় ইরানবাসী। মজ্‌দক কবাতকে সাপের বিষের ওঝা ও সর্প-দংশিত ব্যক্তির প্রশ্ন করেন এবং বন্দীখানায় আটক রেখে বন্দীদের

হত্যার অপরাধের তুলনা কবাতের সামনে উপস্থিত করেন। কবাত সত্য বুঝতে পেরে মজুদ অন্নের গোলা খুলে দেবার আদেশ করেন। মজ্‌দক নিজ ধর্মকে সমতার আধারে স্থাপন করেছিলেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলের সমান অধিকার থাকবে। এই দুর্ভিক্ষের সময়ও মজুদ অন্ন বা ধনসম্পদ একজনের কাছ থেকে নিয়ে অন্য সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। এই ধর্ম কবাত মনে-প্রাণে স্বীকার করেছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন, এতেই জনগণের কল্যাণ হবে।

পরে কবাতের বিচারধারার পরিবর্তন হয়। তিনি শাস্ত্রার্থ করবার জন্যে সভা ডাকেন। নির্দিষ্ট দিনে সকল পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে খুসরো সভাগৃহে উপস্থিত হয়। কবাতের পক্ষ প্রশ্ন করে,—স্ত্রীর উপর যদি একাধিক পুরুষের অধিকার সমান হয়, তাহলে পিতা-পুত্রের পরিচয় কি করে হবে? যদি সকলের রোজগার সমান হয়, তাহলে সেব্য ও সেবক কি করে থাকবে? এবং কেমন করে পৃথিবীর ও সমাজের কাজ করবে। তাছাড়া সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারী কি করে কেউ হতে পারবে? এই সকল প্রশ্ন করে তারা প্রমাণ করান যে, মজ্‌দকের ধর্ম শয়তানের ধর্ম। এই ধর্মপথে চললে পৃথিবীর ও সমাজের অনিষ্টই হবে শুধু। কবাত, খুসরো এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন এই মত সমর্থন করেন। অতঃপর কবাত খুসরোর হাতে বিধর্মী মজ্‌দকীদের দণ্ড দেবার ভার অর্পণ করে প্রস্থান করেন। খুসরোর আদেশে প্রাসাদের সংলগ্ন ময়দানে গর্ত খুঁড়ে মজ্‌দকীদের মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত পুঁতে ফেলবার আদেশ দেয়। শুধু পা দুটো উপরে থাকে তাদের। অতঃপর স্বয়ং মজ্‌দককে সেই মনুষ্য-দেহের তৈরী উদ্যানে নিয়ে আসা হল। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে মজ্‌দক জ্ঞান হারান এবং খুসরোর আদেশে মজ্‌দককে শূলে দেওয়া হয়।

(৮) ইবনুল অসীর (খ্রীঃ ১০৩৪) ইনি লিখেছেন,—এই পয়গম্বর জরথুশ্‌ত ধর্মে কিছু পরিবর্তন করেন। কিন্তু কিছু কিছু

লোক বলে, মজ্দক ভগবতমিত্র ইব্রাহিমের পয়গম্বর জরথুশত্-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রচার করেছিলেন। তিনি লিখেছেন,—"মজ্দক প্রাণী-হিংসা বর্জন করেছিলেন এবং ভূমিতে উৎপন্ন পদার্থ ও ডিম, দুধ, ঘি, পনীর প্রভৃতি প্রাণীর কাছ থেকে পাওয়া সামগ্রীতেই মানবের জীবনধারণ সুষ্ঠুভাবে হতে পারে।"

(৯) সআলবী :—(মৃত্যু খ্রীঃ ১০৩৮) লিখেছেন,—বলাশের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে কবাত্ত তুরানের (মধ্য এশিয়া) দিকে পালিয়ে যান। সেখানে খাকান (শ্বেত হুন রাজা) তাকে স্বাগত জানান। চার বৎসর থাকবার পর ত্রিশ হাজার সেনা নিয়ে কবাত আবার ইরানে ফিরে আসেন। নেশাপোরে আসতে বলাশের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি সৈন্যদল ফিরিয়ে দেন। পরে রোমের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। নিশা নিবাসী বামদাত পুত্র মজ্দকের আবির্ভাব হওয়ার আগে পর্যন্ত এই বাদশাহ পুরনো ধর্মের অনুসারে প্রজাশাসন করতেন। কিন্তু মজ্দক মানুষরূপী শয়তান ছিল। রূপে খুব সুন্দর অথচ অন্তরে খুব অসৎ প্রকৃতির মানুষ ছিল মজ্দক। তার বাণী হৃদয়গ্রাহী ছিল, কিন্তু তার কর্ম ছিল অনুচিত। তার মিষ্টভাষণে কবাত মুগ্ধ হয়ে তার দিকে আকৃষ্ট হন। কিছুদিন পর এক ভীষণ ভূমিকম্পে বহুলোক হতাহত হয়, অনেকে ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করে। সেই সময় মজ্দক কবাতকে প্রশ্ন করেন,—কারও কাছে নির্বিষ ঔষধি থাকতে তার সামনে যদি সর্প-দংশিত ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে তার শাস্তি কি হবে?—কবাত বললেন,—মৃত্যু! তারপর দিন মজদ্দক শত শত ভিখারী ও ক্ষুধিতকে রাজমহলে প্রবেশ করিয়ে আবার কবাতকে প্রশ্ন করেন,—তাদের কী শাস্তি হতে পারে, যারা নিরপরাধ মানুষকে বন্দী করে ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করে? কবাত বললেন,—মৃত্যু!

তখন মজ্দক সকল দরিদ্র জনসাধারণকে হুকুম করলেন,—যাও, তোমরা সকল অন্নের ভাণ্ডার লুঠ করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি

করে নাও। তারা তাই করলো। মজ্‌দক উপদেশ দিতেন,—ভগবান আহার্যের জন্ম দিয়েছেন এই জন্যে যে, সকলে সমানভাবে তা থেকে লাভবান হোক। অন্যায় এবং জুলুমের জন্যেই আজ এই ভেদ-ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। কারও স্ত্রী অথবা সম্পত্তির উপর অন্যের চেয়ে অধিক অধিকার নেই। মজ্‌দক মানুষকে ধর্মচ্যুত করেন। স্ত্রীদের নষ্ট করতে এবং অন্যান্য দুরাচার গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। অল্পদিনেই সেখানে কারও নিজস্ব স্ত্রী বা সম্পত্তি বলে কিছু রইলো না। এমন কি কেউ নিজের পুত্রকেও চিনতে পারতো না।

এরপর সআলবী শাস্ত্রার্থ এবং মজ্‌দকীদের হত্যার কথা স্বীকার করে লিখেছেন, "খুসরো একদিনে আশি হাজার মজ্‌দকীকে হত্যা করিয়েছিল এবং সেই দিন থেকে তার উপাধি হয় নৌশেরবাঁ (ন্যায়কারী)।

(১০) বৈরুনী :—(খ্রীঃ৯৭২-১০৪৯) অবুরেহাঁ মুহম্মদ বিন আহমদ বৈরুনী, ৩ জিল্‌হজা, ৩৬২ হিজরী (৫ সেপ্টেম্বর ৯৭৩)-তে জন্মগ্রহণ করেন, (মুহম্মদ বিন-ইসহাক ইবনুল নদীম্) এবং ২ রজব ৪৪০ (খ্রীঃ ১১ ডিসেম্বর—১০৪৮)-এ সাতাত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি জ্যোতিষ ও গণিতের মহাপণ্ডিত এবং মহান পর্যটক ছিলেন। প্রথমে তিনি নিজ জন্মভূমি খারেজম্-এ ছিলেন এবং পরে যখন সুলতান মাহমুদ গজনবী খারেজম্ অধিকার করেন, তখন মহমুদ ৪০৮ হিজরী (খ্রীঃ ১০১৭)-তে বৈরুনীকে নিজের সঙ্গে গজনী নিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকেছেন বৈরুনী। তিনি ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদের সম্বন্ধে তার প্রসিদ্ধ পুস্তক "অল-হিন্দ"-এ অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ করেছেন। বৈরুনী লিখেছেন,"[১] কবাতের শাসনকালে নিশা নিবাসী বামদাত পুত্র মজ্‌দক প্রধান

১—"আসারুল-বাকিয়া"। বেরুনীর অন্যান্য পুস্তক, "অল্-হিন্দ," "তফহীন "কানুন-মসউদী"।

ধর্মাচার্য ছিলেন। তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন। তার ধর্ম জরথুশ্ত্র ধর্ম থেকে কিছু ভিন্ন ছিল। তিনি স্ত্রী ও সম্পত্তিতে সমতা স্থাপনের নিয়ম প্রচলন করেন। তার অনুগামী ছিল অগণিত।

উপসংহার

জার্মান বিদ্বান নোল্‌দকে এবং ডেনমার্ক-এর ক্রিষ্টিয়ান্সন মজ্‌দকের বিষয় বহু অনুসন্ধান করেছেন। এই সকলই জার্মানী এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় ছাপা হয়েছে। তাঁরা স্বীকার করেছেন, পুরনো পক্ষপাতী-লেখকবৃন্দ মজ্‌দকের সঙ্গে যথেষ্ট অন্যায় করেছেন। ডাঃ ক্রিষ্টিয়ান্সন লিখেছেন (Christenson : A kawabh. Le. regne duroi kawadhet Le-Comm. Mazdakite-Mcdeloster-1925) "অতি সহজেই বোঝা যায়, শত্রুরা মজ্‌দকের ধর্মকে কেবল ব্যভিচার এবং ভোগপরায়ণতার প্রচারক বলে চিত্রিত করেছে। কিন্তু মজ্‌দক সংযম শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি একজন আচার শাস্ত্রী এবং মানবতা প্রেমী পুরুষ ছিলেন। তিনি সামাজিক উন্নতির জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মজ্‌দক কেবল হত্যা এবং রক্তপাতই নিষিদ্ধ করেননি, সকল প্রকার দয়া প্রদর্শনকে কর্তব্য বলে শিক্ষা দিতেন। অতিথি সেবার জন্যে কোন প্রকার অদেয় রাখেননি এবং অতিথিদের দেশ বা জাতি ধর্ম ভেদ রাখা নিষিদ্ধ করেছেন। এমন কি শত্রুদের সঙ্গেও দয়া ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে বলেছেন। পহলবী-[প্রাচীন ও আধুনিককালের মধ্যবর্তী সময়ের ফারসী ভাষা] ভাষায় "মজ্‌দক-নামক" এক পুস্তক লেখা আছে। ইবনুল মুকফ্‌ফা (খ্রীঃ ৭৫৮) সেই পুস্তকটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং আবান লাহকী তাকে পদ্য-বদ্ধ করেন।

সমাপ্ত